বর্ষা ১৩৮৯

এক্ষণ

নির্মাল্য আচার্য
সম্পাদিত

সাহিত্য ও
সংস্কৃতি বিষয়ক
পত্রিকা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : হস্তীমূর্খ

স্ক্যান করে দিয়েছেন : সৌমন্দ্র পর্বত

এডিট করেছেন : সৌমন্দ্র পর্বত ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরিক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

'সাহিত্য অকাদেমি' ও 'সুধা বসু পুরস্কার'-প্রাপ্ত ও
সাম্প্রতিক কালে সর্বাধিক অভিনন্দন ধন্য
রাধারমণ মিত্র-প্রণীত

কলিকাতা-দর্পণ

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩৫ টাকা

প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজা ও প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা
প্রসন্নময়ী দেবী-প্রণীত

পূর্ব্ব কথা

এক বিস্মৃত ও মহামূল্য আত্মজীবন কথার আধারে সেকালের সমাজ ও পরিবারের অনন্য আলেখ্য। ১২ টাকা

সিপাহি যুদ্ধের অজ্ঞাত নানা তথ্যের ভিত্তিতে রচিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ
প্রমোদ সেনগুপ্ত-প্রণীত

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ

আমূল পরিমার্জিত ও সংযোজিত নতুন সংস্করণ। ১ম খণ্ড। ৪০ টাকা

সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের বিশিষ্টতম প্রতিভা
কমলকুমার মজুমদার-প্রণীত

অন্তর্জলী যাত্রা

যে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ লেখক ও পাঠকের সামনে এক বিস্ময়কর জগৎ মেলে ধরেছে। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ১২ টাকা

গল্প-সংগ্রহ

কমলকুমারের 'তাহাদের কথা', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'কয়েদখানা', 'মতিলাল পাদরী' ইত্যাদি সাড়া-জাগানো গল্পের সংকলন। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ২০ টাকা

আধুনিক যুগের দিক্‌পাল কথাসাহিত্যিক
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

জলসাঘর

লেখকের ১২টি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। নতুন সংস্করণ। ১৬ টাকা

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

এক্ষণ সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকা
পঞ্চদশ বর্ষ ॥ ৩-৪ সংখ্যা : বর্ষা ১৩৮৯ ॥ সূচিপত্র

প্রবন্ধ

নিম্নবর্গের ইতিহাস ॥ রণজিৎ গুহ ১
রাজনৈতিক বাস্তবতা ও 'ত্রিদিবা' ॥ অশ্রুকুমার সিকদার ৩৩

কবিতা

দীপতোষ মজুমদার ৫২ প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
জয়দেব বসু ৫৪ দেবাশীষ চক্রবর্তী ৫৬
সৌমিত্র ঘোষ ৫৮ গার্গী দত্ত ৬০ সোমক রায়চৌধুরী ৩১
সৌগত চট্টোপাধ্যায় ৬২ বিতান ভৌমিক ৭০

পুনর্মুদ্রণ

জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী ॥ মনোদা দেবী ৭৫
'ডায়েরী' ও লেখিকার পরিচয় ১২৭

ক্রোড়পত্র / চিত্রনাট্য
An EKSHAN Supplement
Sadgati (Deliverance) : A Screenplay / Satyajit Ray 1

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক : নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ॥ কলকাতা ৯

এক্ষণ পত্রিকার কথা

শারদীয় (১৩৮৮) সংখ্যার পর বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। পরবর্তী সংখ্যা আবার শারদীয় (১৩৮৯) সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। গত শারদীয় সংখ্যায় শিল্পী শ্রীসোমনাথ হোরের 'তেভাগার ডায়েরি' এবং ঐ ডায়েরির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে ৫৪টি ছবি মুদ্রিত হয়। কিন্তু ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সংস্কৃতি' পত্রিকায় উক্ত ডায়েরিটি (ছবিগুলি বর্জন ক'রে, এমন কি তার উল্লেখ পর্যন্ত না ক'রে) এক্ষণ বা শিল্পীর সম্পূর্ণ অগোচরে ও বিনা অনুমতিতে পুনর্মুদ্রণ করে। এ ধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটছে এবং ব্যাপারটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যাঁরা শারদীয় সংখ্যা এক্ষণ (১৩৮৮) সংগ্রহ করতে পারেন নি তাঁদের অবগতির জন্য জানাই— ঐ সংখ্যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'দেবী' ও তৎসহ সত্যজিৎ রায়-কৃত চিত্রনাট্যটি ছাপা হয়েছিল। কিশোরী-চাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী'র সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ, শ্রীরাধারমণ মিত্রের 'কলকাতার টুকিটাকি : বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান', 'অরণি' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাদ্বয়ের ইতিহাস নিয়ে যথাক্রমে শ্রীকার্তিক লাহিড়ী ও শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি দীর্ঘ প্রবন্ধ, শিল্পী পরিতোষ সেনের 'কিষাণগড়ের রাধা' কাহিনীটি, একগুচ্ছ কবিতা এবং পরিভাষা-পরিচয় বিভাগে 'স্বরাজ', সাংস্কৃতিক বিপ্লব', 'ইয়েলো জার্নালিজম', 'মিউজিওলজি', 'বিহেভিয়রাল সায়েন্স' ও 'উপনিবেশ'—মোট ৬টি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় 'পরিভাষা-পরিচয়' বিভাগে কোনো রচনা প্রকাশ করা সম্ভব হল না। এ সংখ্যাটি (বর্ষা : ১৩৮৯) প্রকাশে অনেক বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতা পেয়েছি—বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই Sadgati চিত্রনাট্যটি অতি যত্নসহকারে ছেপে দেবার জন্য Eastend Printers, শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ ও শ্রীঅশোক ঘোষকে। প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছেন শ্রীমতী মন্দিরা সেন।

॥ সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ॥

এক্ষণ আইনত দ্বিমাসিক, কার্যত অনিয়মিত প্রকাশের পত্রিকা। পত্রিকার গ্রাহক-চাঁদা পাঠাবেন না—পত্রিকা পেতে হলে স্থানীয় পত্রিকা এজেন্টের সাহায্য নিন, অথবা সরাসরি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করুন। আগে থেকে প্রতিটি পৃথক সংখ্যার জন্য 'ভি. পি. গ্রাহক' হতে পারেন, ডাক-খরচ প্রাপককে বহন করতে হবে। লাইব্রেরি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্যও একই নিয়ম। পত্রিকার এজেন্টরা ভি.পি.-তে পত্রিকা পাবেন, তাঁদের কমিশন ২৫%, ডাক-খরচ পত্রিকার। আগামী শারদীয় সংখ্যার জন্য পৃথক বিজ্ঞপ্তি দেখুন।

নিম্নবর্গের ইতিহাস

রণজিৎ গুহ

মুখবন্ধ ॥ ১৫—১৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৮২) তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিভাগে দু'টি বক্তৃতা উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল।

শোনার জন্যে লেখা পড়ার জন্যে নয় বলেই উচ্চারণেও অনুকূল স্বর ও শ্বাস নিয়ন্ত্রক পদবিন্যাস যতিচিহ্ন ইত্যাদি মূল রচনায় যেমন ছিল তেমনই রইল।

বক্তব্যের বিষয় ও যুক্তির প্রয়োজনে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হল যা বহুল প্রচলিত নয়, কিংবা প্রচলিত হলেও এখানে যার প্রয়োগ চলিত অর্থের থেকে একটু অন্য রকমের। তবে, ইংরেজি প্রতিশব্দে এইসব কথা অনেকেরই চেনা। পরিভাষা মিলিয়ে পড়লেই তা বোঝা যাবে।

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত পারিভাষিক প্রতিশব্দ

অতিরেক redundancy
অদ্বৈতবাদী monistic
অধীনতা subordination
অনন্যতা specificity
অনেকত্ববাদী pluralistic
অন্তর্নিবিষ্ট subsumed
অর্থব্যবসায়ী financier
অলীকরাষ্ট্র ; — বাদ utopia ; — nism
আড়াআড়ি জমায়েত ; — সমাবেশ horizontal mobilization
আত্তীকৃত assimilated
আত্মসাৎ করা to appropriate
আদর্শগত ideological
আদিকল্প paradigm
আভিধানিক শব্দ lexeme
ইতিহাসবিদ্যা historiography
উচ্চবর্গ elite
উদ্দেশ্যবাদী teleological
ঐতরিক alienated
ঐতরিকতা alienation
কর্তা subject
ক্ষেত্র domain
খাড়াখাড়ি জমায়েত ; — সমাবেশ vertical mobilization
গ্রামভদ্র rural gentry
ঘনত্ব density
জমায়েত mobilization
জাত caste
তালিমী কেতাব manual
দ্ব্যণুক binary
ধ্রুব constant
ধ্রুবগুণ parameter
নিম্নবর্গ subaltern
প্রকল্প hypothesis
প্রতিকল্প model
প্রতিচ্ছেদ intersection
প্রতিরোধ resistance
প্রভু dominant
প্রভুগোষ্ঠী dominant group
প্রভুত্ব dominance
প্রভুশক্তি dominance
প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়া stimulus and response
বাণিজ্য-ধনবাদ mercantilism
বৈপরীত্য opposition
ভূকেন্দ্রিক geocentric
মেহনতী সময় labour time
রাশি term
শুদ্ধ abstract
সংস্কৃতায়ন sanskritization
সংস্থা institution
সমাবেশ mobilization
সর্বেশ্বরতা hegemony
সহকারিতা collaboration
সাংকর্য heterogeneity
সূর্যকেন্দ্রিক heliocentric
স্বতন্ত্র ক্ষেত্র autonomous domain

প্রথম বক্তৃতা

ইতিহাসবিদ্যার সংকট ও উচ্চবর্গের ইতিহাস

আমরা ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আছি। আমার নিজের পড়া-শুনার মূল বিষয় ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ। তাই ইতিহাসবিদ্যা বলতে আমি বোঝাবো সেই স্মৃতি বা প্রতীতির কথা যার বিশদ প্রকাশ ঐ যুগ প্রসঙ্গে আমাদের মৌখিক বা লিখিত বক্তব্যে। এই ইতিহাসবিদ্যার যে কর্তা তার চৈতন্যের বিশিষ্ট রূপটির নাম হিসেবে আমি ইতিহাসচেতনা শব্দটাও কখনো কখনো ব্যবহার করব। আর সংকট বলতে আমি বোঝাতে চাই সেই বিশেষ অবস্থা যখন যে কোনো জ্ঞানমার্গে অগ্রগতির তাগিদ—যার উৎস সমাজের প্রয়োজনে বা ব্যক্তির প্রতিভায় বা উভয়ের সমন্বয়ে—যখন সেই তাগিদ ঐ জ্ঞানমার্গের তত্ত্ব বা অভ্যাসের পুঁজি দিয়ে আর মেটানো যাচ্ছে না। এই অর্থেই ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আমরা আছি।

এই সংকটের একটি প্রধান লক্ষণ আজ আমার আলোচনার বিষয়। কিন্তু সেই বিচারের ভূমিকা হিসেবে আমি এই ইতিহাসবিদ্যার ইতিহাস সম্পর্কে দুয়েকটি কথা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। আমরা যে ইতিহাস লিখি পড়ি ও পড়াই তার উৎপত্তি ইংরেজের ক্ষমতালিপ্সায়। পলাশীর যুদ্ধের আগেও আমাদের ইতিহাস লেখা হতো। কিন্তু সে ইতিহাসের ধাঁচ ছিল পৌরাণিক অর্থাৎ যেখানে ঐহিক ঘটনা ও সম্পর্কগুলিকে দেখা হতো পারত্রিক ঘটনা ও সম্পর্কের ক্ষণিক ও একান্তই গৌণ প্রতিভাস হিসেবে ;—যেমন ধরুন, কালকেতু ব্যাধের জীবন একান্ত বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তার স্বাতন্ত্র্য নেই : তার জীবন নীলাম্বরের স্বর্গচ্যুতির ইতিহাসের এবং তাও আবার পার্বতীর অলৌকিক জীবনী এবং তাঁর পূজার ইতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র—যেন বন্ধনীর মধ্যে বন্ধনী, বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত। অবশ্য, ঐহিক ইতিহাসের একটি ধারাও ব্রিটিশ রাজত্বের আগে চালু ছিল। আরবী-ফারসী ইতিহাসবিদ্যার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এবং মুঘল বাদশাহের বা তাঁদের সমকালীন ছোটবড়োমাঝারি নানা সামন্ত ভূস্বামীদের আশ্রিত এই ধারাটির উপজীব্য ছিল এক কথায় যাকে বলা যায় রাজকাহিনী। কাহিনীর নায়করা কখনো দিল্লীশ্বর, কখনো বা কোনো আঞ্চলিক ক্ষুদে ঈশ্বর—কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে তারা সকলেই জগদীশ্বর। তাদের বংশাবলী, দিগ্বিজয়

ইত্যাদি ছাড়াও শাসনব্যবস্থা, রাজস্বের হার, ভৌগোলিক তথ্য এবং ঐ ধরনের আরো কিছু সাম্প্রতিকতার ছাপ এই জাতীয় ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু প্রভুর জীবনই যেহেতু প্রজা ও রাষ্ট্রের জীবনের একমাত্র প্রতিভূ, তাঁর প্রতিভা ও কীর্তির ছটায় উজ্জ্বল অথচ সংকীর্ণ ক্ষেত্রটির বাইরে সবটাই অন্ধকার ছিল। তাছাড়া আরো একটা কথা ভাবতে হবে। রাজরাজরার নামাংকিত এই রচনা-গুলিকে কি সত্যিই ইতিহাস বলা যায়? এগুলি সমসাময়িক ও আঞ্চলিক তথ্যের আকর সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীতকাল সম্পর্কে পরিপ্রেক্ষিতের যে গভীরতা ইতিহাসবিদ্যার প্রধান লক্ষণ তার অভাব এ রচনায় তো খুবই স্পষ্ট। আসলে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এইসব রচনা যখনই নেহাৎ সাম্প্রতিকতা বা বর্তমানেরই একান্ত গা-ঘেঁষা অদূরবর্তী অতীতের আওতা ছাড়িয়ে যায় তখনই তার মধ্যে হয় পৌরাণিক ধরনের অলৌকিকতা এসে পড়ে কিংবা সেই অতীতের গভীরতা কেবলমাত্র সনতারিখের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে ইতিহাসকে পরিণত করে বর্ষপঞ্জীতে।

কিন্তু যে ইতিহাসচেতনায় অতীতকাল শুধু চক্রাকারে ঘোরে কিংবা যার বহতা শুধু সামন্ত শাসকদের অগভীর জীবনযাত্রার খাতেই সীমাবদ্ধ তা দিয়ে বাণিজ্য-ধনবাদ থেকে শিল্পাশ্রয়ী ধনতন্ত্রে উত্তরণের যুগে কিংবা আরো পরিণত ধনতন্ত্রের যুগে ঔপনিবেশিক রাজ্য শাসনের কাজ চালানো যায় না। কারণ সেই শাসনের বাস্তব ভিত্তি ভারত ভূখণ্ডের যে পণ্য বা কাঁচামাল রপ্তানী করা ও যন্ত্রস্থ করা তার শর্তই হল আরেক ধরনের সময়—যে-সময় সরল রেখায় চলে, যা দিয়ে সদাগরী হাওয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ছন্দ মেলানো হয় ঔপনিবেশিক যুগের আদিপর্বে, যে-সময়ের কাঁটায় কাঁটায় ল্যাংকাশায়ারের সুতাকলের বাঁশি বাজে মেশিন চলে এবং দুনিয়ার প্রথম যন্ত্রসভ্যতায় যে-সময়ের সঙ্গে শিল্প, পুঁজি ও শ্রমের সংগম থেকেই সৃষ্টি হয় এক নতুন ধরনের সময়-কল্পনা যার নাম মেহনতী-সময়।

সময়ের এই নতুন ধারণা যে-ইতিহাসবিদ্যার প্রাণশক্তি, ইংরেজ এদেশে আসার ফলে তা আমাদের চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হল। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ভারতে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার শুরু ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন থেকে নয়, ইংরেজ শাসনব্যবস্থা থেকে—এবং সেই শাসনব্যবস্থা, বলাই বাহুল্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চেয়েও পুরনো। কথাটা একটু জোর দিয়ে বলতে চাই, কারণ একটা কুসংস্কার এক সময় চালু ছিল এবং এখনো হয়ত আছে এই মর্মে যে ইংরেজরা পাশ্চাত্য সভ্যতার উদার আদর্শে আমাদের দীক্ষিত করার জন্যে যে-সব বিদ্যায় উৎসাহ দিয়েছিল ইতিহাসবিদ্যাটাও তার অন্যতম। কথাটা যে একেবারেই ভুল তা কোম্পানির আদিপর্বের নথিপত্র ঘাঁটলেই বোঝা যায়। কারণ পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরেই যখন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত

হবার সম্ভাবনা দেখা দিল – সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা হয়ত ১৭৬৫ সাল যখন কোম্পানি দেওয়ানী হাতে পেল কিংবা তারও কিছু আগে যখন নবাব তিনটে জেলা ('Ceded Districts') তাদের দিয়ে দিলেন – তখন থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরেজ শাসনের হাতিয়ার হল। কারণ লুঠপাটই যেখানে দেশজয়ের উদ্দেশ্য সেখানে ইতিহাস অবান্তর। গোয়া বা দিল্লীর অতীত (বা ভবিষ্যৎ) নিয়ে আলবুকার্ক বা নাদিরশার মাথা ঘামানোর দরকার ছিল না। লুঠেরার কাছে বর্তমানটাই একমাত্র সত্য। কিন্তু জয় যখন বিজিত দেশে ক্ষমতা কায়েম করার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, বিজেতাকে তখনই ইতিহাসচেতনা ব্যবহার করতে হয় প্রভুসংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান হিসেবে। সব বিজেতার পক্ষেই একথা খাটে, তবে অবস্থা ভেদে ঐ চেতনার বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্যে।

অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও উপনিবেশের পত্তন হয়েছিল পাশ্চাত্য শক্তির অস্ত্রবলের সাহায্যে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই এদেশের সেই শিশু-রাষ্ট্র তার স্বকীয় ভঙ্গীতে বেড়ে ওঠে। এই স্বকীয়তার নানা দিক ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই সেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস যার অনেক-খানিই এখনো গবেষণার বিষয় বলে গণ্য হতে বাকি। বর্তমান প্রসঙ্গে তার শুধু একটি দিকই লক্ষ্য করতে বলি। তা হল এই যে কোম্পানির আমলের প্রথম পর্বে তার সেনাবলের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে ভূমিরাজস্ব এবং দেওয়ানী বিচার সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রই এদেশে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মুখ্য অবয়ব হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এই অবয়বটি যেমন ইংরেজ রাজশক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তেমনি আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সূচনা এরই মাধ্যমে। কারণ আগেই বলেছি যে এদেশে পাশ্চাত্য ইতিহাসচেতনাকে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল লিবারল আদর্শের উৎসাহে নয়, রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ও তাগিদে। দেওয়ানী হাতে নিয়েই ইংরেজ টের পায় যে এদেশের কৃষিব্যবস্থা অতি প্রাচীন, জমির সঙ্গে রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এখানে নানা সনাতন প্রথায় নিয়ন্ত্রিত, এবং জমির মালিকানা, ফসলবোনার কায়দা ইত্যাদি সবকিছুই এক সাবেক সংস্কারের অঙ্গ। অতীতকে উপেক্ষা ক'রে এখানে রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই সে যুগের সরকারী কাগজপত্রে ঐতিহাসিক বিবৃতির অভাব নেই। যাঁরা লালদিঘি বা গোলদিঘি পাড়ায় নথিখানার ধুলো ঘেঁটেছেন তাঁরা সকলেই জানেন এইসব বিবৃতি কত অমূল্য তথ্যে ভরা কত বিচিত্র বিষয়ে সমৃদ্ধ। প্রাক্-ব্রিটিশ, বিশেষ ক'রে মুঘল আমলের রাজ্যশাসন, ভূসম্পত্তির অধিকার, কৃষিব্যবস্থা, বাণিজ্য-ব্যাপার ইত্যাদি, সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বহু প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এইসব সরকারী কাগজপত্রে হামেশাই পাওয়া যায়। কেউ যদি বলেন যে এগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের আকরমাত্র কিন্তু সত্যি-

কারের ইতিহাস নয়, তাহলে অবিচার হবে। কারণ যদিও সদ্য প্রকাশিত সবচেয়ে আনকোরা বইটি বা প্রবন্ধটির তুলনায় এগুলি হয়ত একটু কম পরিপাটি মনে হতে পারে, তবু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা এইসব রচনায় তথ্য ও যুক্তির সমন্বয় এবং কার্য-কারণ সূত্রে সাজানো বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার প্রধান গুণগুলি সবই বর্তমান। তবে যে বিশেষ অবস্থায় এই ইতিহাসবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছিল তার ফলে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ — বলা যায় জন্মলক্ষণ — প্রথম থেকেই চোখে পড়ে। তার মধ্যে গুটিতুয়েক বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম লক্ষণটি এই যে এই ইতিহাসবিদ্যার জন্ম এদেশে ইংরেজ রাজশক্তির ঔরসে এবং ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তা ঔপনিবেশিক শাসনদণ্ডকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে ওঠে। যাঁরা এই ধারায় প্রথম ইতিহাস লেখেন তাঁরা সকলেই হয় সরকারী কর্মচারী কিংবা সরকারের প্রসাদপুষ্ট ও ইংরেজ শাসনের সমর্থক বেসরকারী সাহেব মেমসাহেব। তাঁরা যে ইতিহাস লেখেন তার উদ্দেশ্য হয় একেবারে সরাসরি শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন সিদ্ধ করা কিংবা বেসরকারী রচনা হলেও কার্যত তার সাহায্যে ব্রিটিশ প্রভুশক্তি ও প্রভুসংস্কৃতিকে আরো জোরদার করা। এমনকি এইসব লেখকরা যখন অতীত বিষয়ক বক্তব্যগুলি রিপোর্ট, মিনিট বা ঐ জাতীয় সরকারী নথি হিসেবে না লিখে নিছক ইতিহাস হিসেবেই লেখেন তখনো বিজেতা ও শাসকের দৃষ্টির কাছে ঐতিহাসিকের পরিপ্রেক্ষিত সংকুচিত হয়। উইলিয়ম হাণ্টারের মতো প্রতিভাবান এবং উদারচেতা ব্যক্তিও এই রকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নন।

ইতিহাসচেতনায় ঔপনিবেশিক মানসিকতার এই প্রভাব ইতিহাসবিদ্যার চরিত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। ইওরোপে বুর্জোয়াদের অভ্যুদয়ের সময় এই বিদ্যা তদানীন্তন সমাজে সামন্তশ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের নির্মম সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিল। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে আলোকপ্রাপ্তির যুগ থেকে সেই সমালোচনা সামন্তশক্তির তিন প্রধান অর্থাৎ রাজা, জমিদার ও পুরোহিতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে ১৭৮৯ সালের ঐতিহাসিক জয়ের পথ প্রশস্ত করে। অথচ দেখুন ঐ ইতিহাসবিদ্যাই যখন একটি পাশ্চাত্য বুর্জোয়া শক্তির মাধ্যমে এদেশে উপনিবেশ গড়ার কাজে ব্যবহৃত হল তখনই তার ভূমিকা পাল্টে গেল, এমনকি বলা যায় উল্টে গেল। কারণ যদিও তা ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং তারই পরিণতি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতিভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছিল পশ্চিম ইওরোপে, ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে

তাই হয়ে দাঁড়ালো জাতীয় স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় ইংরেজ শাসনের অনুকূল। অর্থাৎ সে আর তখন প্রভুশক্তির সমালোচক নয়, নতুন ভূমিকায় সে প্রভুশক্তির স্তাবক।

এই ইতিহাসবিদ্যার আরেকটি জন্মলক্ষণ হচ্ছে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্ব শাসকদেরই মনোভাবের প্রতিফলন। কারণ ইংরেজদের রাজত্ব যখন শুরু হয় তখন আমাদের সমাজ রীতিনীতি ভাষা ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে সাড়ে পনেরো আনাই তাদের অজানা ছিল। এরকম একটা অপরিচিত দেশে তার কৃষিব্যবস্থা ও মালিকানার সনাতন ও জটিল রহস্য ভেদ ক'রে সেখান থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করাও সেই বিদেশী রাজশক্তির পক্ষে তখন শক্ত কাজ। তবে আঠারো শতকের ব্রিটিশ সমাজের আদর্শ অনুযায়ী কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ধারণা হয় যে এদেশেও সমাজের প্রধান স্তম্ভ সেইসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা বেশ বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তির মালিক, এবং তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলেই রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনের সমস্যা মিটে যাবে। এইসব তথাকথিত natural leaders বা স্বভাবনেতাদের খুঁজে বার করা, তাদের স্বত্ব অধিকার ইত্যাদির সংজ্ঞা ও সীমা নির্ণয়, এবং তাদের পাওনাগণ্ডার হিসেব নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা সরকারী কাগজপত্রে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। এরই ফলে এতদ্দেশীয় উচ্চবর্গের স্বার্থ ও সুবিধা একই সঙ্গে স্বীকৃতি পায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতিতে এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ্যায়। ইতিহাসের মুখ্য বিষয় হিসেবে এই উচ্চবর্গের স্থান তখন ইংরেজের ঠিক পরেই। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সামন্তবংশের উত্তরাধিকারী, অনেকে আবার জমিদারী বা অন্য নামে হলেও কার্যত জমিদারী বন্দোবস্তের কল্যাণে কায়েম নয়া-সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ। এরাই স্বভাবনেতার মর্যাদা পেল ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন আইন-কানুনের ফলে। আর ঠিক এইভাবেই পাশ্চাত্যে যে ইতিহাসবিদ্যা সামন্তবাদের বিরোধিতায় সক্রিয় ছিল, ঔপনিবেশিক অবস্থায় সে তার মূল চরিত্র পাল্টে পরিণত হল পরশ্রমলব্ধ ফসলের উদ্বৃত্তে পুষ্ট এক নয়া-সামন্তশ্রেণীর অনুকূল জ্ঞানকাণ্ডে। ইতিহাসকে এই শ্রেণীর সপক্ষে ওকালতির ভূমিকায় নামাবার জন্যে কতদূর যাওয়া সম্ভব তা যাঁরা ফ্রান্সিস, শোর ও কর্নোআলিসের মিনিটগুলির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন।

যে দু'টি জন্মলক্ষণ বর্ণনা করা হল তা একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে আঠারো শতকের যে ইতিহাসবিদ্যা ইংরেজের ক্ষমতালিপ্সার ফলে একটা ঔপনিবেশিক বিদ্যায় পরিণত হয়েছিল ভারতের বিশেষ অবস্থায়, ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তার ঝোঁক ছিল উচ্চবর্গের সপক্ষে। আমরা যে ইতিহাস লিখি

পড়ি পড়াই বা অন্যথা চর্চা ক'রে থাকি তার প্রেরণা সবটাই সেই ইতিহাসবিদ্যার আদিকল্প থেকে পাওয়া। টমাস কুন্ দেখিয়েছেন যে এক একটি ঐতিহাসিক অবস্থায় জীববিদ্যা রসায়নবিদ্যা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে এক একটি আদিকল্পকে আশ্রয় ক'রে। তারই ভিত্তিতে এক একটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী বা ঘরানা গড়ে ওঠে, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চিন্তা ও পরীক্ষা চলে তার আদর্শে রচিত নানা মডেল বা প্রতিকল্পকে কেন্দ্র ক'রে, সেইসব চিন্তা ও পরীক্ষার ফল আবার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যথা—ইন্‌স্টিট্যুট, লেবরেটরি, ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেণ্ট ইত্যাদির) উদ্যোগে এবং পত্রপত্রিকা, পাঠ্যবই, নানা ধরনের তালিমী-কেতাবের মারফত ঐ আদিকল্পটিকেই প্রচার করে বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিশেষজ্ঞ ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে। তারপর কিন্তু একটা সময় আসে যখন তত্ত্বে ও প্রয়োগে এইসব আন্দোলনের ফলেই সেই একই বিদ্যার ক্ষেত্রে এমন সব নতুন প্রশ্ন ওঠে বা সমস্যা আবিষ্কৃত হয় যার উত্তর বা সমাধান আর প্রতিষ্ঠিত, সর্বসম্মত আদিকল্পটি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তখনই সেই পুরনো আদিকল্পে সংকট ঘটে ; প্রগতির দাবী মেটাতে পারে না বলেই তার প্রভাব ক্রমে-ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন প্রশ্নগুলির উত্তর বা উত্তর-খোঁজার পক্ষে অনুকূল আরেক শক্তিশালী নতুন আদিকল্প তার অগ্রজকে হঠিয়ে দিয়ে নেতৃত্বের ভূমিকায় নামে বিজ্ঞানের সেই বিশেষ শাখায়।

বিজ্ঞানে শুধু নয়, যে কোনো জ্ঞানকাণ্ডেই অগ্রগতির পথ এইভাবে তার আদিকল্পগুলির আয়ুষ্কাল দিয়ে মাপা যায়। ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যে-ইতিহাসবিদ্যার সাহায্যে আমরা ঔপনিবেশিক যুগের অতীতকে বুঝতে বা বোঝাতে অভ্যস্ত তারও প্রেরণা আঠারো শতকের ইওরোপ থেকে নেওয়া এবং পরাধীন ভারতের বিশেষ অবস্থায় ঢেলে-সাজানো একটা প্রৌঢ় আদিকল্প। ইতিহাসবিদ্যার সংকট বলতে আমি সেই আদিকল্পের সংকটের কথাই বোঝাচ্ছি।

আগেই বলেছি যে এই আদিকল্পটি প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে ইতিহাসবিদ্যার চালিকা শক্তি আরেক আদিকল্পকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করেছিল, আর তখন থেকেই ইতিহাসচেতনা পৌরাণিক কল্পনার স্বর্গ ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে এবং অলৌকিক সময়ের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে ঐহিক সময়ের সহজ রাস্তায় পা চালাবার সুযোগ পায়। ফলেই অতীত ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও বাস্তব জীবনের নানা অজানা দিক তখন উদ্ভাসিত হয়েছিল ইতিহাসের আলোকে। এটা যে একটা মস্ত বড়ো লাভ তা অস্বীকার করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে উচ্চবর্গের ইতিহাস সম্পর্কে যে পক্ষপাতিত্ব প্রাক্তন আদিকল্পটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, নতুনটিতে

তার কোনো ব্যতিক্রম হল না। শুধু আগে যেখানে ঠাকুরদেবতা ও রাজরাজরার লীলাকেই ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু বলে মনে করা হতো, এখন তারই বদলে ইতিহাসের পাতা জুড়ে বসলো ইংরেজের মাহাত্ম্য ও ইংরেজশাসিত সমাজে যাদের টাকা জমি জাত পেশা বা চাকরীর জোর বেশি তাদেরই মাহাত্ম্য। এই মুষ্টিমেয়ের ইতিহাসকেই চালানো হল এবং এখনো চালানো হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে।

উচ্চবর্গের পক্ষপাতী এই আদিকল্পের প্রভাব ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে চিন্তায় ও লেখায় এতই পরিষ্কার যে সে বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য নয় শুধু এই জন্যেই যে ঝোঁকটা প্রায় সর্বব্যাপী সুতরাং অতিরেকের বশে সচরাচর চোখে পড়ে না বলেই ধরে নেওয়া হয় ওটা যেন অবিসংবাদী সত্য, যেন তা অতীতের সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাটির ধ্রুবগুণগুলির অন্যতম। অথচ ঝোঁকটা ঠিক এই রকম হবার ফলেই ঐ অভিজ্ঞতা তার জোর জটিলতা ও ঘনত্ব অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ইংরেজ আমলের রাজনৈতিক জীবন, বিশেষ ক'রে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের সমস্যা নিয়ে যে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে, উদাহরণস্বরূপ তার কথা আলোচনা করলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

এই সাহিত্যের প্রায় সবটাই দু'টি প্রতিকল্পকে আশ্রয় ক'রে লেখা। দু'টিই উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীর বাহন। উভয়েরই প্রতিপাদ্য এই যে সেযুগের রাজনীতি বলতে প্রধানত, এমনকি কেবলমাত্র উচ্চবর্গের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও কর্মকাণ্ডকেই বোঝায়; এবং জাতীয়তাবাদ সেই রাজনীতিরই অন্যতম, এমনকি মুখ্য প্রকাশ। তবে মৌলিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে অভিন্ন নয়। কারণ উচ্চবর্গের যে অগ্রণী শক্তিগুলির তারা প্রবক্তা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও উপায়ে পার্থক্য, এমনকি অবস্থাবিশেষে দ্বন্দ্বও কখনো কখনো দেখা দিত। এই মৌলিক সাদৃশ্য এবং গৌণার্থে কিছু কিছু বিরোধিতার সমন্বয়ের জন্যেই উচ্চবর্গের পক্ষপাতী চিন্তাধারা দু'টি ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রে একত্রিত হয়েও তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে।

প্রথম ধারাটির বৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি এবং তারই সহায় ও ফলগত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচার করা। এই ধরনের ইতিহাসের চর্চা ও প্রচার হতো এবং এখনো হয়ে থাকে ব্রিটিশ লেখক ও বিদ্যাস্থানগুলিরই মাধ্যমে; তবে অন্যান্য দেশে, এমন কি এদেশেও তার অনুকারীর সংখ্যা কম নয়।

এই ধারাটির মূল কথা হচ্ছে এই যে ভারতবাসীর একজাতীয়তা বলতে যা বোঝায় তার বাস্তব সংগঠন ও চৈতন্যরূপ ইংরেজ শাসন, তৎসংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো শাসকের ও

সমষ্টিগতভাবে শাসকগোষ্ঠীরই প্রতিভার ফল। এক ধরনের সংকীর্ণ ব্যবহারবাদী চিন্তায় যেমন সব কিছুই ব্যাখ্যা করা হয় প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়ার খেলা হিসেবে, ইতিহাসবিদ্যার এই ধারাটিতেও জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে তা শুধু রাজশক্তির প্রয়োজনে সৃষ্ট সুযোগসুবিধা শিক্ষাদীক্ষা আইনকানুন ইস্কুল-আদালত ইত্যাদির প্রেরণায় উৎসাহিত ভারতীয় উচ্চবর্গের আচরণ ও মনোভাবের সমষ্টিমাত্র। এই ব্যাখ্যাটির এক সাবেক সংস্করণে ইংরেজের আমদানী লিবারল সংস্কৃতিকেই জাতীয়তাবাদের প্রধান কারণ বলে গণ্য করা হতো। তবে এখন সেই দা-কাটা বক্তব্যকে আরো একটু পালিশ ক'রে দেখানো হচ্ছে যে ক'জনকে বি-এ ডিগ্রি দেওয়া হল শুধু তারই ওপর জাতীয়তার প্রসার নির্ভর করে না, ওটা আরেক রকম শিক্ষাপ্রণালী বা learning process-এর ফল। এই প্রণালীটি সম্পর্কে ব্যবহারবাদীরা পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে খাবারের লোভ দেখালে ইঁদুরের মতো জন্তুকেও শিক্ষিত ক'রে তোলা যায়। একটা খাঁচার মধ্যে জটিল ধাঁধার মতো চলাচলের পথ বানিয়ে তার কোনো দুর্গম অংশে একখণ্ড পনীর রেখে দিন। তারপর একটা শাদা ইঁদুর ছেড়ে দিন খাঁচার মধ্যে। কৃষ্ণের জীবটি অবশ্য দুয়েকবার রাস্তা হারিয়ে ফেলবে, ভুল করবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন গোলকধাঁধার প্যাঁচগুলি বহু চেষ্টায় রপ্ত ক'রে সে ঠিক বুঝে নিয়েছে কেমনভাবে ঐ খাদ্যবস্তুর কাছে পৌঁছনো যায়। ইঁদুরের পক্ষে যা সম্ভব তা ভারতবাসীর অসাধ্য হবে কেন? কারণ এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দেখতে গেলে ইংরেজ আসার আগে ক্ষমতা বা রাজশক্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণাচিন্তা যা ছিল তার মধ্যে পলিটিক্সের লেশমাত্র নাই, এগুলি নেহাৎ সনাতন সংস্কার মাত্র। তারা এসে তাদের শাসনকে রূপায়িত করল নানা ঔপনিবেশিক সংস্থায়, তা পরিচালনার জন্যে নিয়ম বেঁধে দিল, নিয়ম ভাঙলে কি সাজা হবে তাও ঠিক ক'রে দিল আইনকানুন দিয়ে এবং ঐসব কিছু যাতে উচ্চবর্গের বোধগম্য হয় তার জন্যে একটা সংস্কৃতিকেও চালু ক'রে দিল রাষ্ট্রক্ষমতা কায়েম ও বিস্তার করার উদ্দেশ্যে। এইসব সংস্থা ও তৎসংক্রান্ত সংস্কৃতি যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মের উপলক্ষ ও বিষয় তারই নাম পলিটিক্স এবং আলোচ্য ধারাটি অনুযায়ী সেই পলিটিক্সে উচ্চবর্গের দীক্ষিত হওয়ার প্রণালীটির—learning processটিরই—নাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের এই ব্যাখ্যায় আদর্শনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ জনসেবার স্থান নেই, আছে শুধু ঔপনিবেশিকতার বরে পাওয়া অর্থ যশ ও ক্ষমতার লোভ; আর সেই লোভের লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছনোর জন্যে ইংরেজ ও ভারতীয় উচ্চবর্গের মধ্যে এবং শেষোক্তদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের কাহিনীই, এই মতে, জাতীয় আন্দোলনের মূল কথা।

অপরপক্ষে দ্বিতীয় প্রতিকল্পটির ছাঁচে সাজানো ইতিহাসবিদ্যায় জাতীয়

আন্দোলনকে উচ্চবর্গের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ও চালিত নির্ভেজাল আদর্শবাদী সংগ্রামের চেহারা দেওয়া হয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রধানত ভারতীয় ঐতিহাসিকদেরই কাজ, তবে বিদেশে লিবারল চিন্তাধারায়ও এর প্রকাশ বিরল নয়। এই ব্যাখ্যায়ও তারতম্য ঘটে : জাতীয় সংগ্রামের নায়ক রূপে উচ্চবর্গের অবদান এতে সর্বস্বীকৃত হলেও সব ব্যক্তি, সংস্থা, নীতি ও তার বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ সম্পর্কে মূল্যায়ন সকলের এক রকম নয়। তবে মোদ্দা কথাটা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। সে কথাটা হচ্ছে এই যে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম উচ্চবর্গের মাহাত্ম্য ও আদর্শনিষ্ঠার কাহিনী মাত্র, এবং এই প্রতিপাদ্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার চেয়ে বিরোধিতার দিকটাই বাড়িয়ে দেখা হয়, শোষক ও উৎপীড়ক হিসেবে তাদের সামাজিক ভূমিকা প্রায় অস্বীকার করেই জনসেবায় তাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলা হয়, জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতি ব্যবহার ক'রে তারা যে রাজদত্ত ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধার গৌণ ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারিতে লিপ্ত ছিল সেকথা চেপে গিয়ে শোনানো হয় স্বার্থলেশহীন আত্মত্যাগের অলীক রূপকথা। এইভাবেই বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে জনগণের বিশাল আন্দোলনগুলি পরিণত হয়েছে উচ্চবর্গের সংকীর্ণ জীবনবৃত্তান্তে।

এই পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে অবশ্য অনেক কিছুই শেখার আছে। দেশী ও বিদেশী উচ্চবর্গের নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাজকর্ম ও চিন্তাধারা, তাদের ঐক্য অনৈক্য, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি তার চালক ও সহায়কদের মনোভাব, গণজীবন ও গণমত সম্পর্কে তাদের ধারণা ইত্যাদি অনেক তথ্যের আকর এই ভাষ্য। তবে এই ইতিহাস থেকে যা সবচেয়ে শেখার কথা তা হচ্ছে এই যে ইতিহাসচেতনা কখনো শ্রেণীচৈতন্যের সীমা অতিক্রম করতে পারে না।

কিন্তু এই ধরনের ঐতিহাসিক চিন্তা ও রচনার মধ্যে যা শিক্ষাপ্রদ তা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে তার সাহায্যে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ সেই অভিজ্ঞতার অন্যতম এবং মুখ্য উপাদান জনসমাবেশ, যা বলতে আমি বোঝাতে চাই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও তাদের সমবেত কার্যকলাপের সমন্বয়। এই অর্থে জনসমাবেশ যে কদাচিৎ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছিল তা যেমন সত্যি তেমনি একথাও সত্যি যে সেই সমাবেশ অনেকবার এবং বহু ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছিল জনসাধারণের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র উদ্যোগে, এমন কি সচেতনভাবেই ঐসব ব্যক্তি ও সংগঠনের তোয়াক্কা না রেখে, বরং তাদের বিরোধিতা করেই। সেই উদ্যোগের ফলস্বরূপ যে অজস্র জমায়েতের কথা জানা যায় ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর

আবির্ভাবের আগেই তার দৃষ্টান্তগুলি না হয় বাদ দিচ্ছি, কারণ অনেকে হয়ত বলবেন যে তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকট ছিল না, যদিও ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহ বা ১৮৯৯-১৯০০ সালের বিরশাপন্থী বিদ্রোহের মধ্যে জাতীয়তার অংকুর বা পূর্বাভাস যাঁদের চোখে পড়ে না অথচ সরকারী চাকরীর অধিকার নিয়ে উনিশ শতকে উচ্চশিক্ষিতের বিক্ষোভ বা কংগ্রেসের প্রথম দশ বছরের কার্য-কলাপে যাঁরা জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখতে পান, তাঁদের মনশ্চক্ষুতে চালশে ধরেছে বলতে হবে। তবু এসব কথা আপাতত বাদ দিয়ে যদি ঔপনিবেশিক আমলের সেই পর্বটির কথাই শুধু ধরা যায় যখন জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব একেবারেই সন্দেহের অতীত, তখনো বহু বিরাট আন্দোলন ঘটেছে যার সবটাই বা অনেকখানিই জনসাধারণের স্বতন্ত্র উদ্যোগের দৃষ্টান্ত, যেমন অসহযোগ যুগের কোনো কোনো সমাবেশ, ১৯৪২-এর অগাস্ট সংগ্রাম, কিংবা দেশভাগের পূর্বাহ্নে নৌবিদ্রোহকে উপলক্ষ ক'রে শ্রমজীবী জনতার অভ্যুত্থান।

উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীর বাহন ইতিহাসবিদ্যার সাধ্য নেই যে জাতীয়তাবাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটা স্বীকার করে কিংবা ব্যাখ্যা করে। কারণ তা হলেই মেনে নিতে হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু উচ্চবর্গের কৃতিত্ব নয়, এবং সেই অস্বস্তিকর সত্যটা তাদের স্বার্থ ও আদর্শের—ইডিওলজির—বল্গায় বাঁধা ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায় না। অথচ ঐ ধরনের সমাবেশের ব্যাপক ও সংগ্রামী ভূমিকা এতই স্বতঃপ্রকাশ যে তা উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং ঐ ইতিহাসে সাক্ষ্যপ্রমাণ সব উড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের যা স্বতন্ত্র সৃজনী প্রতিভার ফল উচ্চবর্গ তাকে আত্মসাৎ ক'রে চালিয়ে দিচ্ছে নিজেরই চিন্তা ও কাজ বলে। এক কথায়, এই বিদ্যা ভারতবাসীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিস্তার, গভীরতা ও জটিলতাকে উচ্চবর্গের পক্ষপাতী একটা অপ্রশস্ত, অগভীর, অতিসরল কীর্তি-গাথায় পরিণত করেছে।

অথচ যে আদিকল্প থেকে এই ধরনের ব্যাখ্যার উদ্ভব হয়েছে, একদা ইতিহাস-বিদ্যার প্রগতি ঘটেছিল তারই জোরে। একথা আমি আগেই বলেছি। তারই জোরে তখন ইতিহাসচেতনায় দেবলীলার পরিবর্তে মানুষের ঐহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং—জের টেনে—শেষ পর্যন্ত একথাও স্বীকৃতি পেয়েছিল যে ভারতের ইতিহাসে কেবল ইংরেজেরই নয়, ভারতবাসীর (যদিও উচ্চবর্গের অন্তর্ভুক্ত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর) অবদানও আছে। সেই ধাক্কার জোরেই তখন অতীতের কত নতুন দরজা খুলে গিয়েছিল, নতুন তথ্যের খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল, রাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত নতুন সম্পর্ক উদ্ভাসিত করেছিল আগলভাঙা হঠাৎ আলো। কিন্তু সেই আদিকল্পটি আজ বৃদ্ধ, সে তার সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা মোটেই নতুন ব্যাপার নয়। এক সময় জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হতো ভূকেন্দ্রিক আদিকল্পকে আশ্রয় ক'রে। কোপার্নিকাস

তারই ভিত্তিতে এমন সব প্রশ্ন ক'রে বসলেন যে ঐ টলেমীয় বিদ্যার সাহায্যে তার উত্তর মেলে না ; এইসব নতুন প্রশ্নের চাপেই শেষ পর্যন্ত সেই পুরনো আদিকল্প ভেঙে পড়ল, তার জায়গা জুড়ে বসল সূর্যকেন্দ্রিক আদিকল্প, এবং জ্যোতির্বিদ্যায় মধ্যযুগীয় চিন্তার রাজত্ব শেষ হল। আলেকৃজন্দর কোয়ারে, টমাস কুন্ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে এইভাবেই বিজ্ঞানের একেকটি শাখায় সংকট ঘটেছে যখন প্রতিষ্ঠিত আদিকল্পগুলির নিজ প্রতিভাবলেই এমন সব সমস্যা তৈরি হয়েছে যার সমাধান তাদের তত্ত্ব ও অভ্যাসের অধীন নয়, আর তখনই নতুন কোনো আদিকল্প এসে সেই সংকট সমাধান করেছে।

আমরাও ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আছি। কারণ তারই অভ্যাস থেকে এমন সব প্রশ্ন উঠেছে যার উত্তর পুরনো আদিকল্পটি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রশ্নগুলির একটা সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি ক'রে শোনাতে গেলে আপনাদের সময় নষ্ট হবে, কারণ তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য : গবেষকদের জিজ্ঞাস্যের পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নতুন নতুন প্রশ্ন বা পুরনো প্রশ্নই নতুনভাবে উঠছে ও উঠবে। তবে তাদের প্রবণতায় মোটামুটি মিল আছে। সেই মিলের কথা মনে রেখে তাদের বিষয়বস্তুটির একটি সাধারণ বর্ণনা তৈরি করা যায়। প্রশ্নগুলি প্রায় সবই গড়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাকে ঘিরে। জিজ্ঞাসাটা এই : আমাদের জাতীয়তার আন্দোলনে রাজনৈতিক সমাবেশের চরিত্রটা কি ছিল ? বিষয়টা নতুন নয়, কারণ প্রচলিত ইতিহাসবিদ্যার পক্ষেও তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি ; যা একেবারেই নতুন তা হচ্ছে প্রচলিত উত্তরগুলি সম্পর্কে সাম্প্রতিক ইতিহাসচেতনার অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষেরই পরিণতি হিসেবে একদা-অপাংক্তেয় তথ্যকে সম্মানিত করা ঐতিহাসিক বক্তব্যের মধ্যে, ঐ কারণেই এতদিন যা বিশ্লেষণের নিঃসংশয়িত পদ্ধতি বলে গণ্য হতো তাকে আবার যাচাই ক'রে নেবার চেষ্টা, আর সবচেয়ে বড়ো কথা—ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসকে বিচার করা নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে।

দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা হয়ত আরো পরিষ্কার ক'রে বলা যায়। যেমন, একথা যদি সত্যি হয় যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উৎপত্তি হয়েছিল ইংরেজের তৈরি শাসনসংস্থা থেকেই এবং তার বিকাশ ঘটে ঐগুলিকে আশ্রয় করেই, তাহলে দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন হয়েছিল কোন প্রেরণায় ? সেখানে তো আভ্যন্তরীণ, বিশেষ ক'রে গ্রামীণ, শাসনসংস্থায় ইংরেজরা হাত দেয় নি। কিংবা যদি উচ্চবর্গের প্রতিভাই জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তাহলে তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন বা ব্যক্তির সর্দারী ছাড়াও, বরং তাদের নেতৃত্ব ও পরামর্শ উপেক্ষা করেই যেসব ঐতিহাসিক গণসমাবেশ ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা কেমন ক'রে হয় ? উচ্চবর্গের উদ্যোগসিদ্ধ খাড়াখাড়ি সমাবেশই যদি গণআন্দোলনের একমাত্র বাহন হয়ে থাকে, তাহলে

নিম্নবর্গের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদায় সমকক্ষ শ্রেণী গোষ্ঠী জাতি বা সমূহ যে নিজেদেরই উদ্যোগে বারবার সামিল হয়েছে আড়াআড়ি সমাবেশে তার তাৎপর্য বোঝার উপায় কি? এই যে লাখলাখ লোক জেল পুলিশ কালাপানি ফাঁসী, নিদেনপক্ষে বেকারী ও অন্নাভাবের অনিবার্য সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাড়া দিয়েছিল দেশের ডাকে, আসলে কি তারা সকলেই বা অধিকাংশই নেমিআর-বর্ণিত পিপড়ের মতো রাজদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধুভাণ্ডের দ্বারাই শুধু আকৃষ্ট হয়েছিল? নিঃস্বার্থ আদর্শের কণামাত্রও কি নেই তাদের চৈতন্যে? তাদের সেই চৈতন্য কি নিষ্প্রাণ ও স্থূল জড়পিণ্ড মাত্র যার আলো সবটাই ধার করা উচ্চবর্গের জীবন্ত ও প্রখর চৈতন্য থেকে, পৃথিবীর আলো যেমন ধার করা সূর্যগ্রহ থেকে? যদি তা সত্য না হয়, যদি নিম্নবর্গের চৈতন্যকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে তার বৈশিষ্ট্য কি এবং উচ্চবর্গের চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও মানসিকতার সঙ্গে তার সংঘাত ও সমঝোতা—এক কথায়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক—বুঝব কোন তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে?

এইসব প্রশ্ন উঠছে প্রচলিত আদিকল্পটির অভ্যাস থেকেই, অথচ তার সাধ্য নেই এগুলির উত্তর দেয়। এইটাই সেই আদিকল্পের সংকট। এই সংকটের নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ইতিহাসবিদ্যায়। লক্ষণ শুধু এই নয় যে নতুন সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েও তা সমাধান করতে পারছেন না বলেই উচ্চবর্গের মুখপাত্ররা আগের চেয়েও বেশি তারস্বরে বলার চেষ্টা করেছেন যে ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতি ও জমায়েতের অভিজ্ঞতা সবটাই দেশী বা বিলিতি বুর্জোয়াদের কৃতিত্ব। লক্ষণ আরো এই যে এমনকি যাঁরা জাতীয়তাবাদে ও জাতীয় আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা সত্যিই বুঝতে ও বর্ণনা করতে চান, সেই সব লেখক ও গবেষকও অনন্যোপায় হয়ে উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীতেই শরণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সমাজের নিচের তলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সমাবেশগুলিকেও দলাদলি বা খাড়াখাড়ি জমায়েতের গতানুগতিক ছকে সাজাবার চেষ্টা করছেন। প্রচলিত আদিকল্পটি দেউলে হয়ে গেছে বলেই নিম্নবর্গের চৈতন্যের সুস্থ প্রকাশ বিদ্রোহী সমাবেশগুলি যেমন ঐতিহাসিক বক্তব্যের মধ্যে তাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, তেমনি জাতপাতের ঝগড়া ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার অসুস্থ প্রকাশকেও গণসমাবেশেরই আরেকটি চেহারা বলে স্বীকার না ক'রে চালানো হচ্ছে কেবলমাত্র ইংরেজেরই ভেদনীতির কুফল বলে। অর্থাৎ আবার সেই একই কথা—নিম্নবর্গের মানুষের চেতনায় স্বকীয়তা বলে কিছু নেই: তার মধ্যে যেটুকু ভালো বা মন্দ তার সবটাই যথাক্রমে দেশী ও বিদেশী উচ্চবর্গের কাছ থেকে পাওয়া।

উচ্চবর্গের পক্ষপাতী এই ইতিহাসবিদ্যার সংকট থেকে বেরোতে হলে সমালোচনা দিয়েই শুরু করতে হবে। সমালোচনাই নতুন পথ খোঁজার উপায়। আমি খোঁজার কথাই বলছি, পৌঁছনোর কথা নয়। কারণ পৌঁছে যাবো শুধু তখনই যখন একেবারে নতুন কোনো আদিকল্পকে বসানো যাবে পুরনোটির জায়গায়। এই ধরনের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ শুধু নয়, অনেক এগনো-পেছনো, হারিয়ে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া তার স্বভাবসিদ্ধ, এবং সেজন্যেই জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে আকস্মিকতার অভাব নেই। সুতরাং এই পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ একেবারে নির্ভুলভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা অবান্তর হবে। তবে যে-সংকটের কথা এতক্ষণ আলোচনা হল তার লক্ষণগুলি মনে রেখে বলা যায় যে ইতিহাস-বিদ্যাকে ঢেলে সাজাতে হলে নিম্নবর্গের দিকে চোখ ফেরাতে হবে, ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি এবং সবকিছুরই ওপরে রাজনীতিতে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা কি ছিল তা নির্ণয় করতে হবে, সেই উদ্দেশ্যেই নতুন তথ্য খুঁজতে ও পুরনো তথ্যকে নতুনভাবে পড়তে হবে, দরকার হলে বিশ্লেষণের পুরনো কায়দা ছেড়ে নতুন কায়দা তৈরি ক'রে নিতে হবে, আর এই সবকিছুকে সম্ভব করার জন্যেই তথ্যাশ্রিত অভ্যাসের সঙ্গে মেলাতে হবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী।

এই প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা বলে কাল আমার বক্তব্য শেষ করব।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

নিম্নবর্গের রাজনীতি ও ইতিহাসবিদ্যার দায়িত্ব

উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ বলতে কি বোঝায় আমি কাল তার কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি নি। তবু এই শব্দ দু'টি যে ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যে একটা মৌলিক ভেদের স্থূল সংকেত হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে শ্রোতাদের ভুল হবার কথা নয়। আজ আমার বাকি বক্তব্যের প্রস্তাবনা করছি ঐ দু'টি শব্দের সংজ্ঞা দিয়ে।

উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা ক্ষমতার অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দু'ভাগে ভাগ করা যায়—বিদেশী ও দেশী। বিদেশী প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু'ধরনের—সরকারী ও বেসরকারী। সরকারী বলতে গণ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয়

কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই ; আর বেসরকারী বলতে গণ্য বিদেশীদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি চা-বাগান কফিক্ষেত বা ঐ জাতীয় যেসব সম্পত্তি প্লান্টেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারী, যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি।

দেশী প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেও একটা মোটা ভাগ ছিল সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের পার্থক্য অনুযায়ী। সর্বভারতীয়দের মধ্যে গণ্য বৃহত্তম সামন্ত প্রভুরা, শিল্পে ও বাণিজ্যে লিপ্ত সবচেয়ে শক্তিমান বুর্জোয়ারা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রের অন্যত্র যারা ছিল সবচেয়ে উচ্চপদের অধিকারী।

দেশী প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিনিধিরাও আবার দু'রকমের। এক রকম হচ্ছে তারাই যারা আসলে সর্বভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ক্ষমতাবিন্যাসের আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপাদান হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে ; আরেক রকম হচ্ছে তারা যাদের প্রভুত্ব ষোলো আনাই আঞ্চলিক বা স্থানীয়, কিংবা যারা অন্য সব অর্থে প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য না হলেও আঞ্চলিক বা স্থানীয় অবস্থায় প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজ করে, নিজেদের সামাজিক সত্তার ধর্ম অনুযায়ী কাজ করে না।

এই শেষোক্তদের, অর্থাৎ দেশীয় প্রভুগোষ্ঠীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সম্পর্কে একটা কথা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। কথাটা এই যে সামগ্রিক ও শুদ্ধ অর্থে উচ্চবর্গের এই অংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অসমতা, এবং সেই অসমতার কারণ দ্বিবিধ : এক—সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্য ; আর দুই—এই অংশটির সামাজিক গড়নের সাংকর্য, অর্থাৎ তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য। এই দ্বিবিধ অসমতার ফলেই যে-শ্রেণী বা সমূহ এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় বলে গণ্য তারাই আবার অন্যত্র আরেক প্রভুগোষ্ঠীর অধীন। একাধারে প্রভুত্ব ও অধীনতার প্রতীক বলেই তাদের মানসিকতা, রাজনৈতিক আদর্শ ও আচরণ, সখ্য ও শত্রুতার ঝোঁক বা তাৎপর্য সবক্ষেত্রেই এক নয়, বরং অর্থ ও উদ্দেশ্যের নানারকম স্ববিরোধিতায় তা প্রায়শই অস্পষ্ট ও জটিল হয়ে দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক যুগে ভূস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রামভদ্রদের মধ্যে যারা আর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো, মাঝারী কৃষকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষকশ্রেণী—এরা সকলেই আমার সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্গের অন্তর্গত হলেও বহুক্ষেত্রেই অবস্থার চাপে ও চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে উচ্চবর্গের সপক্ষে কাজ করে। আদর্শের বিশুদ্ধতা থেকে বাস্তবের এই বিচ্যুতি ও তারই পরিণামে যে ঐতিহাসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সন্ধান, বিশ্লেষণ ও বর্ণনাই গবেষণার দায়িত্ব।

ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে

শহরের শ্রমিক ও গরীব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও প্রায়-গরীব মাঝারী চাষী নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তাছাড়াও এই সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নির্বিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারী কৃষক এবং ধনী কৃষকরাও—যদিও, একটু আগেই যেমন বলেছি, এদের ভূমিকা স্পষ্ট নয় বরং দোটানায় জটিল এবং বাস্তবে এরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের সামাজিক সত্তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ না ক'রে উচ্চবর্গের স্বার্থ অনুযায়ী চলে।

আমার বক্তব্য থেকে একথা হয়ত এতক্ষণে পরিষ্কার হল যে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের বৈপরীত্য ব্যবহার ক'রে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে ক্ষমতাবিন্যাসের মূল সূত্রটি সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণায় আমি পৌঁছতে চাই। এই বৈপরীত্যের ওপর জোর দিয়ে ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা প্রয়োজন মনে করি এই জন্যে যে প্রচলিত বিশ্লেষণ-পদ্ধতিগুলির সাহায্যে তখনকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এবং সম্ভব নয় বলেই নিম্নবর্গের ভূমিকা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিগুলি দু'ধরনের : তাদের মধ্যে একটিকে বলা যায় মোটা কায়দা, অন্যটিকে মিহি কায়দা।

মোটা কায়দার বিশ্লেষণে শুধু ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্পর্কটাই রাজনীতির বিষয় বলে স্বীকৃত হয়। ফলে ঐতিহাসিক যদি বিদেশী উচ্চবর্গের পক্ষপাতী হন তাহলে ঐ যুগের অভিজ্ঞতা শাসকদের অভিজ্ঞতায় আত্তীকৃত হবে, আর তিনি যদি দেশী উচ্চবর্গের পক্ষপাতী হন তাহলে তা আত্তীকৃত হবে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের চিন্তায় ও কাজে। উভয়তই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক চেতনা ও কর্মের কোনো স্বীকৃতি নেই।

মিহি কায়দার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য জাতি ও শ্রেণীগত সম্পর্ক বিচার করা। সমাজের নিচের তলার বাস্তব অবস্থা বোঝার পক্ষে মোটা কায়দার চেয়ে এটি অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতি সম্পর্কে কোনো সামগ্রিক ধারণা তৈরি করা সম্ভব নয় কেবলমাত্র জাতভেদ ও শ্রেণীভেদের ভিত্তিতে। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ফলে জাতে-জাতে ও শ্রেণীতে-শ্রেণীতে পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারাটা সর্বত্রই এক রকমের নয়। এই অবস্থায় বিশ্লেষণের কাজ যদি ক্ষমতাবিন্যাসের একটি সাধারণ ছক আশ্রয় না ক'রে এগোয় তাহলে জাতনির্ণয় ও শ্রেণীনির্ণয় যতই সূক্ষ্ম ও তুলচেরা হবে, ঐতিহাসিক বিবৃতি ততই বিব্রত হবে অনাবশ্যক তথ্যের বহুলতায় এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি হবেই একরকম অনেকত্ববাদী বর্ণনায় যা আসলে অতীতকে সমাক বোঝার দায়িত্ব এড়াবার নামান্তর মাত্র।

সুতরাং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপায় হিসেবে এমন একটা মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ধারণা তৈরি ক'রে এগোতে হবে যা দিয়ে ক্ষমতাসূচক সব সম্পর্কই বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা শ্রেণীসম্পর্ক-জাত সম্পর্ক শাসকশাসিতের সম্পর্ক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির অথচ ঐ সম্পর্কগুলি সবই যার অন্তর্নিবিষ্ট। উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের বৈপরীত্য এই রকমই একটা কেন্দ্রীয় ধারণা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজে ক্ষমতার এমন কোনো অভিব্যক্তি নেই যা এই দ্ব্যণুক সম্বন্ধ দিয়ে বোঝা বা বোঝানো যায় না। জাত শ্রেণী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সমূহের নানা অংশের মধ্যে, রাজাপ্রজা স্ত্রীপুরুষ জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ প্রভৃতির মধ্যে, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্র ক্ষমতাবৈষম্যে সেই বৈপরীত্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। এবং তা যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রকট, আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও তেমনি। এক কথায়, যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রয়োগে নমনীয় বলেই, অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ও সামান্যতা উভয়কেই বোধগম্য করতে পারে বলেই এই ধারণাটি এত শক্তিশালী।

এই বৈপরীত্যের কথা মনে রাখলে ঔপনিবেশিক আমলের রাজনীতি সম্পর্কে একটা প্রচলিত এবং প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। বিশ্বাসটা এই যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সবটাই একটিমাত্র উপাদানে তৈরি, সেই উপাদান ইংরেজ-প্রবর্তিত উদারনৈতিক শিক্ষাসংস্কৃতি থেকে নেওয়া বা তারই প্রত্যক্ষ ফল, এবং ঐ রাজনীতির ক্ষেত্রটি অখণ্ড। ইতিহাসের সব ব্যাখ্যাতেই—তা ঔপনিবেশিকতার পক্ষপাতী হোক কিংবা জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী হোক—সব ব্যাখ্যাতেই এই কথাটা অবিসংবাদী বলে অনুমিত হয় এবং এটাকে সত্য বলে ধরে নিয়েই বক্তব্য সাজানো হয়ে থাকে।

কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে বিশ্বাসটা অমূলক। কারণ ইংরেজ আমলের ইতিহাসে উচ্চবর্গের রাজনীতির পাশাপাশি আরেকটি রাজনীতির অস্তিত্ব এতই স্পষ্ট যে সেবিষয়ে ভুল হবার উপায় নেই। সেই রাজনীতির ক্ষেত্রে নিম্নবর্গই নায়ক, উচ্চবর্গ নয়; নিম্নবর্গের প্রতিভাই সেই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত সব চিন্তা ও কাজের চালিকা শক্তি; এক কথায়, তা রাজনীতির একটি স্বতন্ত্র-ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটির বৈশিষ্ট্য তার ঐতিহাসিক উৎপত্তি, সমাবেশের চরিত্র, আদর্শরূপ ও বাস্তব ভিত্তি অনুযায়ী সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এই রাজনীতির মূল উপাদানগুলি ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেই অর্থে সনাতন হলেও প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের উচ্চবর্গীয় রাজনীতির মতো তা ঔপনিবেশিক অবস্থার চাপে নষ্ট বা

নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় নি। বরং নতুন অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে এবং তারই মধ্যে চেতনা ও ব্যবহারের নানা দ্বন্দ্বের ফলে আকারে ও গুণে কিছু নতুনত্ব নিয়ে তা ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ ক'রে গেছে—এবং এখনো বোধ হয় কাজ ক'রে যাচ্ছে (যদিও স্বাধীন ভারতের কথা আমি বর্তমান আলোচনার বাইরে রাখতে চাই)। মোটামুটি বলা চলে যে ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে নিম্নবর্গের রাজনীতির ক্ষেত্রটি পুরনো হয়েও আধুনিক এবং উচ্চবর্গের রাজনীতির তুলনায় তার পরিপ্রেক্ষিতের গভীরতা ও তার সত্তার ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি।

এই রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নবর্গের সমাবেশের কায়দায় ও চরিত্রে। উচ্চবর্গের উদ্যোগজাত সমাবেশকে যদি খাড়াখাড়ি বলে বর্ণনা করা যায় তাহলে নিম্নবর্গের উদ্যোগজাত সমাবেশকে আড়াআড়ি বলে বর্ণনা করা চলে। ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার জন্য ইংরেজরা যেসব সংস্থা এদেশে চালু করেছিল এবং প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে সামন্তশাসনের সহায়ক যেসব সংস্থা তখনো একান্ত অকেজো হয়ে যায় নি সেগুলিই ছিল খাড়াখাড়ি সমাবেশের উপায়। কিন্তু আড়াআড়ি সমাবেশের প্রধান উপায় নিম্নবর্গের সমাজে কুটুম্বিতা ও আঞ্চলিকতার প্রত্ন বিধিব্যবস্থা কিংবা শ্রেণীসংস্থা বা এই দুইয়ের নানারকম সমন্বয়। উচ্চবর্গের জমায়েতের ঝোঁক প্রধানত ছিল আইনের মধ্যে থেকে বরং আইনকে আশ্রয় করেই কাজ চালানো, আইনভঙ্গের মধ্যে যথাসাধ্য লিপ্ত না হওয়া; নিম্নবর্গের জমায়েত যথাসম্ভব আইনসংগত রাস্তা ধরে এগতো ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজন হলে তা বেআইনি এমনকি হিংসাত্মক হয়ে উঠত অপেক্ষাকৃত সহজে এবং আরো তাড়াতাড়ি—তাই এই জমায়েত উচ্চবর্গের কাছে অনেক সময়েই খুব অপ্রত্যাশিত ও স্বতঃস্ফূর্ত মনে হতো। ঔপনিবেশিক যুগে নিম্নবর্গের এই জমায়েতের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী রূপ দেখা যায় তৎকালীন কৃষকবিদ্রোহগুলিতেই; শহরে মধ্যবিত্ত, শ্রমিক বা অন্যান্য গরীব জনতার সমাবেশেও তখন ঐ প্রকার বিদ্রোহী কৃষক জমায়েতের আদিকল্পটির বহু লক্ষণ স্পষ্টই চোখে পড়ে। উচ্চবর্গের পক্ষপাতী ইতিহাসবিদ্যার পক্ষে নিম্নবর্গের জমায়েতের এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ করলেই যে-আদিকল্পটি সেই ইতিহাসবিদ্যার ভিত্তি তাকে অস্বীকার করতে হয়।

এই রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আদর্শগত। নিম্নবর্গের সামাজিক সত্তা যেসব উপাদানে তৈরি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চৈতন্যের স্তর ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়। তাই তাদের আদর্শগুলির মধ্যে অমিল এমনকি পরস্পর-বিরোধিতাও ছিল, এবং তারই ফলে সেই রাজনীতির সামগ্রিক আদর্শের চেহারাটা অবস্থাভেদে এক-একরকমের হয়ে দেখা দিত। মোটামুটি বলা চলে যে, কোনো পরিস্থিতি বা ঘটনার মধ্যে এই রাজনীতির এক বা একাধিক উপাদান

যখন অন্য উপাদানগুলির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই প্রভাবে অন্তত সাময়িকভাবে সেই রাজনীতির আদর্শগত গুণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হতো। ফলেই অবস্থাভেদে এই আদর্শের নানান্ ধারার মধ্যে কিছু কিছু প্রকারভেদ ও ও অসমতা লক্ষ্য করা যায়। তবে অসমতা সত্ত্বেও যা সর্বত্র প্রকট তা হচ্ছে উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার সমন্বয়। এই দু'টির আপেক্ষিক গুরুত্বেও আবার তারতম্য ছিল, কিন্তু বিরোধিতা যখন আনুগত্যকে ছাড়িয়ে যেত তখনই নিম্নবর্গের রাজনীতির মৌলিকতা এবং উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে তার পার্থক্য সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠত।

এই রাজনীতির চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটির মূলাধার প্রকৃতির দেওয়া ও মানুষের তৈরি সেই বাস্তব অবস্থা যা দিয়ে নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা, তাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমের সংগঠন, এবং সর্বোপরি জীবিকা ও শ্রমের শর্তস্বরূপ শোষক-শোষিতের ক্ষমতাগত সম্পর্কগুলি নির্ধারিত হয়। উচ্চবর্গের ইতিহাসবিদ্যায় এই সবকিছুই একটা সংকীর্ণ অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে। তার পক্ষে কিছুতেই স্বীকার করা সম্ভব নয় যে সেই অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা আসলে প্রভুত্ব ও অধীনতার সূত্রে নিয়ন্ত্রিত এবং এই দু'টির টানাপোড়েনেই নিম্নবর্গের রাজনীতির অনেক নক্‌শা বোনা হয়ে থাকে।

নিম্নবর্গের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে এতক্ষণ যা বলেছি সে বিষয়ে দু'টি কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার, নইলে অনেক বাজে তর্কে সময় নষ্ট হবে। প্রথম কথাটি হচ্ছে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমি যেভাবে বর্ণনা করলুম তা তাদের শুদ্ধ রূপ। বলাই বাহুল্য যে ঔপনিবেশিক যুগের বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবিকল এই রূপেই দেখার চেষ্টা নিরর্থক : স্থান কাল ও পাত্র ভেদে এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সাধারণ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেই এক এক অবস্থায় এক এক ভঙ্গিতে কাজ করবে। আমি তাদের শুদ্ধ রূপটিকেই তুলে ধরেছি শুধু এই জন্যেই যে আমার উদ্দেশ্য একটি তাত্ত্বিক প্রস্তাবের মূলসূত্রগুলি এখানে উল্লেখ করা। কিন্তু আমিই যখন আবার কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে বসব তখন আমার কাজ হবে সেই তত্ত্বের আলোকে ঐ অভিজ্ঞতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মিশ্ররূপকে পূর্বোক্ত শুদ্ধ রূপের সঙ্গে তুলনা করা এবং তুলনার ফলে যে পার্থক্য ধরা পড়বে তা দিয়েই সেই ঐতিহাসিক বিষয়টির অনন্যতা বর্ণনা করা।

এ প্রসঙ্গে আমার দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলির একটা পাকা ফর্দ বানিয়ে আপনাদের কাছে পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং তা করাও সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাস নিয়ে এখন পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তারই

ভিত্তিতে একটা সাধারণ ধারণাকে মোটা কথায় সাজিয়ে বলা গেল। গবেষণা যতই এগোবে এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে চিন্তায় ও লেখায় আমাদের চেষ্টা যতই ব্যাপক ও নিপুণ হবে, বৈশিষ্ট্যগুলির চেহারা ততই বিশদ হয়ে উঠবে। তবে একান্ত সঙ্গত কারণেই অসমাপ্ত এই বর্ণনা থেকে একথাটা হয়ত পরিষ্কার হয়ে থাকবে যে প্রচলিত আদিকল্পটিকে আশ্রয় ক'রে ঔপনিবেশিক আমলের রাজনীতি সম্পর্কে যে অদ্বৈতবাদী ধারণা ইতিহাসবিদ্যায় স্বতঃসিদ্ধ বলে মান্য তা দিয়ে ঐ যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং সেই অদ্বৈতবাদী ধারণাটিই আসলে ঐ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় উচ্চ-বর্গের প্রাধান্য কায়েম রাখার ও নিম্নবর্গের ভূমিকা অস্বীকার করার মূল শর্ত।

এই বৈশিষ্ট্যবিচারের ভিত্তিতে তাহলে নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতির ক্ষেত্রটি দ্বিধাবিভক্ত। কিংবা অন্য উপমায় বলা যায় যে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের চৈতন্য ও কর্মের বাহন দু'টি স্বতন্ত্র ধারা বয়ে চলেছে ঐ রাজনীতির মধ্যে। তবে সেই সঙ্গে একথাও বেশ জোর দিয়েই বলা দরকার যে স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ঐ ধারা দু'টি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। নিরপেক্ষ নয় তাদের বৈপরীত্যের জন্যেই। বিপরীত বলেই যে কোনো দ্ব্যণুক সম্বন্ধের রাশি দু'টির মতো তাদের একটি অপরটির অস্তিত্ব সূচনা করে, ঘোষণা করে।

কিন্তু এই সাধারণ অর্থ ছাড়াও একটি বিশেষ অর্থে তারা সম্পৃক্ত। সম্পৃক্ত এই কারণে যে উচ্চবর্গের কোনো কোনো অংশ কখনো কখনো এই দু'টি ধারাকে তাদের নিজেদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে মেলাতে চেষ্টা করেছে উভয়বর্গের একত্রিত সমাবেশে। বিশেষ ক'রে বুর্জোয়াদের চেষ্টায় এই ধরনের সমাবেশ কয়েকটি বিরাট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের উপলক্ষ ও হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, যদিও তা সব ক্ষেত্রেই নেতাদের অভিপ্রেত ছিল এমন নয়, বরং তাদের মধ্যে আপসের মনোবৃত্তি, জঙ্গী গণআন্দোলনের তেজ সম্পর্কে তাদের ভয় এবং নিম্নবর্গের চৈতন্যের নানা দুর্বলতার ফলে এইসব লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, তাদের প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয় নি। আন্দোলনে ভাঁটা এসেছে যখন, তখনই আবার বেণী-বদ্ধ শিথিল হয়ে পড়েছে এবং রাজনীতির স্বতন্ত্র ধারা দু'টি তাদের নিজ নিজ খাতে ফিরে গেছে। উচ্চবর্গের নেতৃত্বেই এই দু'টি ধারা কখনো আবার মিলিত হয়েছে এমন সব জমায়েতে যা সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করা দূরে থাকুক কার্যত তাকেই সাহায্য করেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সামন্তশ্রেণীর অন্তর্ঘাতী হিংস্রতার অস্ত্র হিসেবে নিম্নবর্গকে ব্যবহার ক'রে। তবে সমাবেশের উদ্দেশ্য প্রগতির অনুকূলেই হোক বা প্রতিক্রিয়ার অনুকূলে, একথা লক্ষ্য করার মতো যে এই দু'টি রাজনৈতিক ধারা বা ক্ষেত্রের প্রতিচ্ছেদে প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে বারে-বারেই, কারণ ঠিক তখনই উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে তারই উদ্যোগজাত আন্দোলনের মধ্যে নিম্নবর্গের রাজনীতি তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে মুদ্রিত করেছে।

এই প্রতিচ্ছেদের বহু দৃষ্টান্ত আছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে। কিন্তু উচ্চবর্গের অগ্রণী শ্রেণী বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব সেইসব আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নিতে পারে নি, তাকে পরিণত করতে পারে নি জাতির মুক্তি-যুদ্ধে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সর্বেশ্বরতা প্রতিষ্ঠা ক'রে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার দায়িত্বও পূর্ণ করতে পারে নি।

অপরদিকে নিম্নবর্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা স্বতন্ত্র উদ্যোগ গড়ে উঠেছে ঠিকই, তবু তাও জাতীয় আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ হয়ত ইংরেজশাসিত ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর অপরিণত অবস্থা তার বাস্তব জীবনে ও চৈতন্যে। ফলে শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে ওঠে নি, তাদের সর্বেশ্বরতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এবং নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে নি নিম্নবর্গের মধ্যে অগ্রণী যারা তারাও।

এই দ্বিবিধ ব্যর্থতাই ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মর্মবস্তু।

আমাদের চিন্তায় ও বক্তব্যে এই বিষয়টিকে যদি সম্যক্ গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে ইতিহাসবিদ্যায় উচ্চবর্গের পক্ষপাতী আদিকল্পটির বিরুদ্ধে সচেতনভাবেই বিদ্রোহ করতে হবে, আমাদের সাধনাকে নতুন তাত্ত্বিকতা, নতুন তথ্য ও নতুন পদ্ধতি দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনীতির বৈপরীত্য ও তাদের সম্পৃক্তি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করতে হবে, এবং সেজন্যই নিম্নবর্গের ভূমিকাটিকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে।

এই প্রস্তাবসম্মত কাজ অর্থাৎ গবেষণা ও লেখা ঠিক কিভাবে এগোবে তার খুঁটিনাটি আগে থেকেই বর্ণনা করার চেষ্টা নিরর্থক। যে কোনো সৃষ্টিশীল প্রয়াসের মতো ইতিহাস রচনার মধ্যেও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের চমক হামেশাই দেখা যায়। এই আকস্মিকতা একদিকে যেমন নতুন তথ্য আবিষ্কার ও পুরনো তথ্যকে নতুনভাবে দেখার অবশ্যম্ভাবী ফল, অপরদিকে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার লীলাই তার কারণ। সুতরাং নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ্যার প্রগতি কোনো ফতোয়া বা ভবিষ্য-বাণী দিয়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে তার মূল লক্ষ্যের দিকে চোখ রেখে দুয়েকটি কথা বলতে চাই যা হয়ত এই অভ্যাসের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে কাজে লাগতে পারে।

এই কাজে যাঁরা নামতে চান তাঁদের প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে নিম্নবর্গের ইতিহাস নিছক তথ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গলিত হবে না। তথ্য ছাড়া ইতিহাস হয় না ঠিকই, কিন্তু তা নিছক তথ্য নয়। নিছক তথ্য আভিধানিক শব্দের মতো। ঐ শব্দগুলিকে অভিধান থেকে বাছাই ক'রে তুলে যদি বাক্যবন্ধে সাজানো যায় তবেই পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে তারা তাদের বিশিষ্ট অর্থে

ব্যক্ত হবে। শব্দ বাছাই করা ও সাজানো যেমন বক্তার চৈতন্যের অভিব্যক্তি ভাষায়, তথ্য বাছাই করা ও সাজানো তেমনি ঐতিহাসিকের চৈতন্যের অভিব্যক্তি ইতিহাসবিদ্যায়। তথ্য বাছাই ও সাজানোর জন্যে তাই একান্ত সচেতনভাবে দু'টি মূল সূত্র ধরে এগোলে দিগ্‌ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম। সূত্র দু'টি সম্পর্কে আগেই বিস্তারিত বলা হয়েছে, তাই এখানে শুধু উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে।

এক নম্বর সূত্র :

ঔপনিবেশিক ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রটি অখণ্ড নয়, দ্বিধাবিভক্ত। তার মধ্যে দু'টি স্বতন্ত্র ধারা—উচ্চবর্গের রাজনীতির ধারা ও নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারা। স্বতন্ত্র হলেও এই ধারা দু'টি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। তারা বৈপরীত্যে বাঁধা এবং বেণীবন্ধের মতো কখনো কখনো তারা ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছেদে যুক্ত হয়, কখনো আবার নিজ নিজ খাতে বয়ে চলে।

দুই নম্বর সূত্র :

নিম্নবর্গের ইতিহাস শুধু ঘটনার পারম্পর্য আশ্রয় ক'রে বোঝা বা লেখা যাবে না। ঘটনা বা সাধারণভাবে বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্কটা পরিষ্কার ক'রে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই সম্পর্কটা আসলে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক, বৈপরীত্যের দ্ব্যণুক সম্পর্ক।

এই দু'টি সূত্র ধরে গবেষণা, আলোচনা ও রচনার বিষয়বস্তু এবং বিশ্লেষণ-প্রণালী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব আমি আপনাদের কাছে রাখতে চাই। শুধু তার আগে আবার বলছি যে এই প্রস্তাবটি কোনো পাকা প্রোগ্রাম নয়। এর সবটাই আমার ব্যক্তিগত চিন্তা অভ্যাস অভিজ্ঞতা ও রুচির অপরিণত এবং ইদানীন্তন নিদর্শন মাত্র। আমার নিজের কাজ যত এগোবে ততই এই প্রস্তাবটি আরো পরিশীলিত হবে, এবং আশা করি আপনারাও নিজ নিজ চিন্তা ও অভ্যাসের সাহায্যে এটিকে বদলে ও শুধরে নেবেন।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রথম মন্তব্য এই যে নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণী গোষ্ঠী ব্যক্তি ও সমূহকে ঐতিহাসিক গবেষণা ও বক্তব্যের বিষয় বলে স্বীকার করতে হবে সচেতনভাবে। এদের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরীব জনতা ইত্যাদি গণ্য তো বটেই। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটা যাদের জীবনে খুবই প্রকট অথচ যারা আমাদের ইতিহাসচিন্তায় এখনো প্রায় অনুপস্থিত সেই আদিবাসী, নিম্নবর্ণ ও স্ত্রীলোকের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ ক'রে [illegible] ও লিখতে হবে। এইদিকে এগোতে গেলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে [illegible] দৃষ্টিভঙ্গী ও তার বাহন প্রচলিত আদিকল্পটি আমাদের পথ জুড়ে আছে। [illegible] ১৯১৮ সালের আমেদাবাদ সূতাকল ধর্মঘটের ইতিহাস যখন লিখতে বসব

তখন যেন মনে রাখি যে সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মহাত্মা গান্ধী, শংকরলাল ব্যাংকার ও অনসূয়া সারাভাইয়ের জীবনীর অধ্যায় মাত্র নয়, তার মধ্যে ধর্মঘটীদের চৈতন্যের—শ্রেণীচেতনা যার অন্যতম উপাদান তার—একটি মূল্যবান ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস মহাদেব দেশাই বা তেন্দুলকারের পক্ষে লেখা সম্ভব হয় নি, তা আমাদেরই লিখতে হবে একেবারে আরেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আরেকটি আদিকল্পের প্রেরণায়। একাজে হাত দিলে দেখা যাবে যে উনিশ শতকের কৃষকবিদ্রোহগুলিকে নেহাৎ উদ্দেশ্যবাদী কায়দায় বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তা ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত না ক'রে তাদের স্বমহিমায় দেখতে গেলে বিদ্রোহী চৈতন্যের একটি প্রধান লক্ষণ যে ধর্মচেতনা তাকে উড়িয়ে দেওয়া তো যায়ই না যেমন একজন বামপন্থী লেখক তাঁর বহুল প্রচারিত রচনায় করেছেন, বরং ধর্মবিশ্বাসকে সেই চৈতন্যের একটি ধ্রুবগুণ বলে স্বীকার করতে হয়। একাজে হাত দিলেই দেখা যাবে যে রাজনৈতিক জীবনীসাহিত্য পুরনো ইতিহাসবিদ্যার প্রভাবে শুধু উচ্চবর্গের গুণকীর্তনে মুখর ; আমরা চাই যে তার মধ্যে তিতুমীর, সিদো, কানহু, মাদারি পাসীর কীর্তি উচ্চারিত হোক। আমরা এমন ইতিহাস চাই যার মধ্যে মেয়েরা অতীত সমাজের তথ্যকণিকা মাত্র নয়, যার মধ্যে তারা ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত ; যার মধ্যে আদিবাসীরা কৃষকদের জীবন ও আন্দোলনের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হবে না, কৃষকসমাজের সবচেয়ে নিঃস্ব ও সংগ্রামী অংশ বলেই বিবেচিত হবে ; যার মধ্যে বর্ণানুক্রমে নিম্নতম বলে গণ্য যারা তাদের আন্দোলনগুলিকে উচ্চবর্গের অনুকারী তথাকথিত সংস্কৃতায়নের সিঁড়ি বলেই শুধু বর্ণনা করা হবে না, বরং অনুকরণের পাশাপাশি এমনকি তার চেয়েও বেশি যে আক্রোশ ও তজ্জনিত প্রতিবাদ ঐ সব আন্দোলনের স্বভাবসিদ্ধ তাও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বিষয় বলে মানা হবে।

আমার দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে নিম্নবর্গের ইতিহাসে গণসমাবেশের প্রসঙ্গটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ প্রচলিত আদিকল্পটির চাপে ইতিহাসবিদ্যার ঠিক এইখানটাতেই অনেক বিকৃতি ও অসত্যকে একেবারে স্বতঃসিদ্ধের আসনে বসানো হয়েছে। গণসমাবেশের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাকে তাই নতুন ক'রে বিচার করার, নতুনভাবে তার মূল্যায়নের সময় এসেছে। যাঁরা নিম্নবর্গের ইতিহাসের এই দিকটা নিয়ে কাজ করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে দুয়েকটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই।

(এক) মনে রাখবেন যে পুরনো আদিকল্পটির প্রভাবে ইতিহাসবিদ্যায় সাধারণত সব গণসমাবেশকেই, বিশেষ ক'রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংক্রান্ত

সমাবেশগুলিকে শুধু খাড়াখাড়ি জমায়েত বলেই ধরে নেওয়া হয়; কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উচ্চবর্গের প্রেরণা ছাড়া জনগণ কিছুতেই রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে গেলে এই একদেশদর্শিতা প্রথমেই বর্জন করা দরকার। জমায়েতের মধ্যে খাড়াখাড়ি ও আড়াআড়ি এই দু'টো কায়দাই কাজ করছে এই অনুমান আশ্রয় করেই গবেষণার প্রকল্প তৈরি করতে হবে। তা যদি না করেন তাহলে আড়াআড়ি জমায়েতের সাক্ষ্য চোখেই পড়বে না, বা পড়লেও তাকে খাড়াখাড়ি জমায়েতের সাক্ষ্য বলে ভুল হবে নির্ঘাৎ।

(দুই) উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে জনসমাবেশের অন্তর্নিহিত পার্থক্যগুলি সহজে ধরা পড়ে না, পড়লেও তার তাৎপর্য বোঝা বা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়; কারণ ধরে নেওয়া হয় যে সেই সমাবেশ উচ্চবর্গের চৈতন্যের আধার মাত্র, সুতরাং তার নিজস্বতা নেই, আর সেই নিজস্বতার প্রকাশ যে দ্বন্দ্বে ও বৈষম্যে তাও আলোচনার মধ্যে আসে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস কিন্তু সেই জমায়েতে রাজনীতির পাল্টা ও স্বতন্ত্র ধারাটির খোঁজ করবে, আর খোঁজ পেলে—অর্থাৎ তা যদি তথ্যসম্মত হয়—তার মধ্যে নিম্নবর্গের চৈতন্যের অসমতা, স্তরভেদ, উপাদান-ও-অবস্থাভেদে তার বিভিন্ন প্রকাশ ইত্যাদির বিশ্লেষণ ক'রে সেই বিশেষ জমায়েতটির অনন্যতাকে বর্ণনা করবে। এখানে মনে রাখা উচিত যে জমায়েতের পাত্রস্থানীয় শ্রেণী, গোষ্ঠী বা সমূহের বাস্তব জীবন ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যই এই অনন্যতার একমাত্র কারণ নয়। একই স্থানে একই পাত্রের চৈতন্যে একই সমাবেশের মধ্যে কালভেদে গুণগত পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ আমাদের ইতিহাসে, বস্তুত সব দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর জর্মান কৃষকবিদ্রোহে, ফরাসী বিপ্লবের সমকালীন মহাত্রাসের (লা গ্রাঁদ্ প্যর্) মধ্যে, জর্মান ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পূর্ব আফ্রিকার মাজি-মাজি অভ্যুত্থানে, আমাদের নিজস্ব নীলবিদ্রোহে, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ১৮৫৭-৫৮ সালের কৃষকবিদ্রোহগুলিতে, উত্তরবঙ্গে দেবীসিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে—অর্থাৎ যেখানেই জমায়েতের মেজাজ জঙ্গী ও আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, সেখানেই চৈতন্যের এই গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। অন্যত্র আমি এই পরিবর্তনকে ইংরেজিতে second wave বলে বর্ণনা করেছি। উপমাটা একটু বদ্‌লে বাংলায় এর নাম দেব 'দ্বিতীয় ধাক্কা', কারণ সত্যিই এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাবেশের মধ্যে আপসের চেয়ে আঘাতের প্রবণতা হঠাৎ অনেক বেশি তীব্র হয়ে ওঠে, তিক্ততা ও হিংস্রতা ভীষণ বেড়ে যায়, শ্রেণী-সংগ্রামে দীর্ণ হয়ে সমাজ গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এই ধাক্কা সামলাতে উচ্চবর্গকে হিমশিম খেতে হয়।

(তিন) একথা যদিও সত্য যে স্থানকালপাত্র ভেদে এক একটি সমাবেশে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবুও তাদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে

অপেক্ষাকৃত জঙ্গী জমায়েতগুলির মধ্যে আকৃতিগত মিল আছে অনেক। গ্রামাঞ্চলে প্রজাবিদ্রোহ, শহরের গরীব জনতার অভ্যুত্থান (যেমন ধরুন, রাওলাৎ সত্যাগ্রহের সময় দিল্লীতে), গ্রামে ও শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির মধ্যে আঞ্চলিকতায়, উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক পরিচয়ের নানা পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যাবে যে প্রায় একই রকমের কিছু কিছু উপায় ও সংকেতের সাহায্যে নিম্নবর্গের প্রতিনিধিরা তাদের মিত্রপক্ষকে একত্র করতে ও শত্রুপক্ষকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছে সব ক্ষেত্রেই। এই সাদৃশ্যের মূল কারণ উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার অতি প্রাচীন সম্পর্ক এবং প্রভুর বিরুদ্ধে অধীনের বহুকাল-ব্যাপী, যদিও ব্যর্থ, প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত, সর্বাঙ্গীণ, সনাতন ও সার্বত্রিক রূপ কৃষকবিদ্রোহ। তারই ঐতিহ্য নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ধ্রুব উপাদান, এবং ঠিক সেই জন্যেই ঔপনিবেশিক যুগে নিম্নবর্গের সব রকম জঙ্গী জমায়েতেই কৃষকবিদ্রোহের কিছু কিছু লক্ষণ আদর্শে না হোক আকারে দেখা যাবেই। তাই আমার মনে হয় নিম্নবর্গের সমাবেশের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা কাজ করতে চান, এমনকি যাঁরা গ্রামসমাজের বাইরে অকৃষক জনতার সমাবেশ নিয়ে কাজ করতে চান তাঁদের পক্ষেও কৃষকবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

এবার আমার প্রস্তাবটি সম্পর্কে তৃতীয় মন্তব্যে আসি। একথা বলাই বাহুল্য যে নিম্নবর্গের ইতিহাসে তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি নিয়ে কাজ ইংরেজ রাজত্বের মধ্যেই আরম্ভ হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সে কাজ পরিমাণে যেমন বেড়েছে গুণেও তেমনি উন্নত হয়েছে। এই দিকে গবেষণার মোড় ফেরানো, তরুণ ঐতিহাসিকদের এই কাজে শিক্ষিত করা এবং মহাফেজখানাকে তথ্যের আকর হিসেবে ব্যবহার করা—সবই এই শহরে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের প্রেরণায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ সেই উত্তরাধিকারে কত উর্বর কত সমৃদ্ধ তা আপনারা সকলেই জানেন। নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে হলে এই কাজ থেকে অনেক কিছুই শিখতে হবে। তবে বিষয় নির্বাচন ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে দু'টি কথা মনে রাখা দরকার।

প্রথম কথাটি এই যে ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটি যে বিশিষ্টরূপে প্রকট হয় তা শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। তাই অর্থনীতির যে-কাঠামোটা আশ্রয় করেই সেই সম্পর্ক প্রধানত গড়ে ওঠে—অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা; অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখার জন্য

আবশ্যক লেনদেনগুলির মধ্যে যা কিছুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে—যথা, মজুরী, খাজনা, ঋণ ইত্যাদি ; এই সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে দারিদ্র্য, বেকারী, দুর্ভিক্ষ, জমি হারানো, ফসলের ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, আবার অপরপক্ষে শোষকদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শোষিতের সামান্য একটি অংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে অধিকাংশকেই দরিদ্রতর ক'রে তোলা—এই ধরনের সমস্যাকেই আমার মনে হয় নিম্নবর্গের ইতিহাসে অগ্রধিকার দেওয়া উচিত, কারণ এইসব বিষয়ে কাজ করতে গেলেই যে তথ্য আবিষ্কৃত হবে, যে প্রশ্ন উঠবে, সমাধানের জন্য যে নতুন কৌশল ও তত্ত্ব আশ্রয় ক'রে এগোতে হবে তা থেকে বারবারই একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে শোষক-শোষিতের সম্পর্কটি অর্থনৈতিক জীবনে প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কের বিশিষ্ট প্রয়োগ মাত্র।

এই প্রসঙ্গেই আমার দ্বিতীয় কথা—দৃষ্টিভঙ্গীর কথাটা এসে পড়ে। ঔপনিবেশিক সমাজে নিম্নবর্গের ইতিহাসে নিছক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলে কিছু নেই। ধনতন্ত্রের পূর্ববর্তী অন্য যে কোনো সমাজের মতো সেখানেও অর্থনীতির অন্তর্গত সব সম্পর্কই আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক বা আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে, রাজনীতির সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। মজুরীর হার, খাজনার হার, সুদের হার, সেখানে অবাধ কেনাবেচা চাহিদা-যোগানের নিয়ম মেনে চলে না, চলে শেষপর্যন্ত স্থানীয় সমাজে মালিক জমিদার মহাজনের প্রতিপত্তি ও শাসনের নিয়ম অনুযায়ী এবং উচ্চবর্গের এইসব আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের উপরওয়ালা, তাদের সকলেরই পোষক রাজশক্তির শাসন অনুযায়ী। তাই নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক জীবনের সব বর্ণনার মধ্যেই ক্ষমতার এই সম্পর্কটিকে, অর্থাৎ প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই জন্যেই ঔপনিবেশিক যুগের যন্ত্রশিল্পের ইতিহাস শুধু যদি কল-কারখানার বর্ণনা, মজুরী ও মুনাফার হার ও পরিমাণ, এমনকি লভ্যাংশের বখরা নিয়ে মালিক-মজুরের মধ্যে কড়াগণ্ডার লড়াই বলেই দেখা ও লেখা হয়, তাহলে ক্ষমতার সম্পর্কটি তার মধ্যে হয় ধরা পড়বেই না, বা পড়লেও গৌণভাবে। তাই কারখানার মালিকানার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রভুত্বের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও যান্ত্রিক নিয়মের বহির্ভূত শাসনের চাপে উৎপাদন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার জন্য কাজের সময় শ্রমিক ও যন্ত্রের মধ্যে মালিক বা তার প্রতি-নিধিদের কর্তৃত্বসূচক হস্তক্ষেপ, কলকারখানার বিষয়ে সরকারী আইনকানুনের ভূমিকা, কারখানার বাইরে বস্তি, লাইন, চল্ বা মহল্লায় মালিক মহাজন প্রভৃতির সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক, ইউনিয়ন বা ঐ জাতীয় সংস্থায় আশ্রমিক নেতা বা কর্মী ও শ্রমিকের মধ্যে ক্ষমতাবৈষম্যের খেলা, কারখানার জন্য শ্রমশক্তি যোগান দেওয়ার ব্যাপারে সর্দারী প্রথা ও সেই সূত্রে গ্রামসমাজের সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রভাব শহরের শ্রমিক জীবনে—এইসব কিছুই যন্ত্রশিল্পের অর্থনৈতিক দিকগুলির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতে হবে। তেমনি আবার বলা যায় যে কৃষকের কত জমি

আছে, কত খাজনা বা কর তাকে দিতে হয়, সুদে আসলে তার কাছে মহাজনের কত পাওনা, ফসলের দর ও লাভ-লোকসানের হিসেব—এইসব দিয়েই শুধু অর্থনৈতিক ইতিহাস যদি লেখা হয়, তাহলে তা তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কৃষক-জীবনের একপেশে সুতরাং বিকৃত বর্ণনায় পর্যবসিত হবে। কারণ কৃষকজীবনের সত্য ঐ তথ্যগুলির মধ্যে বিদ্যমান নয়, প্রভুত্ব ও অধীনতার যে বিশিষ্ট সম্পর্ক ঐ সব তথ্যের ধারক তারই মধ্যে কৃষকজীবনের সত্যকে সন্ধান করতে হবে, সেই সত্যের আলোকেই ঐ সব তথ্য অর্থময় হয়ে উঠবে। ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামজীবনে সেই সম্পর্কের মূল কথা জমিদার মহাজন ও সরকার—এই ত্রিশক্তির সঙ্গে কৃষকের ক্ষমতাগত সম্পর্ক। সেই সম্পর্কই অর্থাৎ রাজনীতিই ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতির প্রধান ধ্রুবগুণ; নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে তাই ব্যাপক অর্থে যা রাজনৈতিক ইতিহাস নামে পরিচিত তারই শাখা বলে ভাবা যায়, যদিও নিঃসন্দেহেই তা সেই জ্ঞানকাণ্ডের একটি প্রৌঢ় ও বহুপল্লবিত শাখা।

নিম্নবর্গের ইতিহাস বিষয়ক প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমার চতুর্থ মন্তব্যে চৈতন্যের দু'টি লক্ষণের কথা বলতে চাই। এ যাবৎ আমার সব বক্তব্যের মধ্যে আমি প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কটিকে রাজনীতির মর্মস্থলে রেখেছি, বলেছি যে এই সম্পর্কটিই একাধারে রাজনীতির মুখ্য উপাদান ও তার নিয়ন্ত্রক। প্রভুত্ব ও অধীনতা যথাক্রমে সেই সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত বর্গদু'টির—অর্থাৎ উচ্চের ও নীচের—চৈতন্যের সাধারণ গুণ। নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাই অধীনতার চরিত্রটি পরিষ্কার ক'রে বোঝা দরকার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে প্রভুত্ব ও অধীনতা যেমন দ্ব্যণুক বৈপরীত্যের সূত্রে বাঁধা, অধীনতাও তেমনি একটি দ্ব্যণুক সত্তা যা নিজেই আবার দু'টি রাশির বৈপরীত্য দিয়ে গড়া। সেই রাশি দু'টি হচ্ছে সহকারিতা ও প্রতিরোধ। নিম্নবর্গের ইতিহাসে দু'টি রাশিই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত, যদিও অবস্থাভেদে একটি অপরটির চেয়ে জোরদার হয়ে ওঠে এবং অধীনদের চৈতন্যে হয় একটি বা অন্যটি তার প্রাধান্য কায়েম করে সাময়িকভাবে। তাই একথা মনে করা ভুল হবে যে প্রতিরোধই নিম্নবর্গের চৈতন্যের একমাত্র উপাদান। বরং অসাম্য সত্ত্বেও যেহেতু সমাজ সাধারণত স্থিতিশীল তাই অত্যুক্তি না করেই বলা চলে যে সহকারিতাই প্রতিরোধের চেয়ে সাধারণত বেশি শক্তিমান। তবে একথাও সত্যি যে প্রতিরোধ বিদ্রোহের পর্যায়ে না পৌছলেও সহকারিতার পাশাপাশি তার একটি ধারা যতই ক্ষীণ হোক তা সব ঐতিহাসিক অবস্থায়, এমন কি দৈনন্দিন জীবনেও, সব সময়েই বয়ে চলেছে, যেমন অপরপক্ষে বলা যায় যে প্রতিরোধের চূড়ান্ত রূপ

বিদ্রোহের এমন কোনো নজির ইতিহাসে নেই যার মধ্যে সহকারিতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

নিম্নবর্গের চৈতন্যের অপর যে লক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ধর্মভাব। ধর্মভাব বলতে আমি শুধু ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি চেতনার সেই ঐতরিক অবস্থার কথা যার প্রভাবে জড়জগৎ বা জীবজগতের কোনো সত্তাকে, বাস্তবের বা ভাবনার অন্তর্গত কোনো বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারে না, এবং এক বিষয়ের উপর আরেক বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়, যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়। ঐতরিকতার আতিশয্যেই কর্তা কখনো কখনো নিজের সৃষ্টিকেই সঠিকভাবে চিনতে পারে না: যা তার নিজেরই প্রতিভাজাত তাকে সে অন্যের কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করে। তাই মঙ্গলকাব্যের কোনো মহৎ কবির পক্ষে বলা সম্ভব যে তাঁর রচনা তাঁর নিজের নয়, আরাধ্যা দেবী তাঁকে দিয়ে লেখাচ্ছেন: কবি যন্ত্র, দেবী যন্ত্রী। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিদো ও কানুর পক্ষে বলা সম্ভব হয় যে ইংরেজ শাসকরা যদি তাঁদের পরোয়ানা শিরোধার্য ক'রে গঙ্গার ওপারে চলে না যায় তাহলে লড়াই বাধবে, কিন্তু তা ইংরেজের সঙ্গে সাঁওতালের লড়াই নয়, ইংরেজের সঙ্গে ঠাকুরের লড়াই: 'Sido and Kanoo will not fight the Thakoor will fight.' অর্থাৎ বিদ্রোহের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও বিদ্রোহী নেতারা তাঁদের যত্নসাধ্য বিশাল কর্মকাণ্ডটিকে নিজেদের সৃষ্টি বলে চিনতে পারছেন না, ঐশ্বরিক বলে কল্পনা করছেন।

এই ধরনের ধর্মভাব নিম্নবর্গের রাজনীতির একটি প্রধান উপাদান। উচ্চবর্গের ইতিহাসবিদ্যায়—ইংরেজ শাসকদের লেখায় বা আমাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে অনেক লিবারল্ ঐতিহাসিকের লেখায়ও—এই চেতনাকে শুধু ধর্মোন্মাদ বলেই দায় সারা হয়, যেন 'আসল' রাজনীতি বলতে তাঁরা যা বোঝেন তা একেবারেই আলাদা জিনিস। অপরপক্ষে, নিম্নবর্গের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি আছে তাঁরাও অনেক সময় এই ধর্মচেতনার সাক্ষ্য নিয়ে একটু বিব্রত বোধ করেন এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মধ্যে সেই সাক্ষ্য হয় একেবারেই চেপে যান কিংবা উড়িয়ে দেন এই বলে যে ওটা আসল কথা নয়, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাটাই আসল কথা এবং সিদো কানু বিরশা প্রমুখ বিদ্রোহী নেতারা নিজেরা ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, শুধু কুসংস্কারগ্রস্ত কৃষকজনতাকে জমায়েত করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা ধর্মের জিগির তুলেছিলেন। এক কথায়, উভয়পক্ষই 'আসল' রাজনীতি বলতে ধর্মভাবরহিত চৈতন্যের একটি বিশেষ রূপকে বোঝেন।

এটা একটা মারাত্মক ভুল এবং এ বিষয়ে সতর্ক না হলে নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখা দুষ্কর। ঐতিহাসিককে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক দেশেই ধনতন্ত্রের

পূর্ণ বিকাশের আগে, জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার আগে, এমন কি তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চোখে, বিশেষ ক'রে রাজধানী ও শহর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে গ্রাম ও মফঃস্বলে যারা থাকে তাদের চোখে রাষ্ট্রের সামগ্রিক চেহারাটা সহজে ধরা পড়ে না। তারা রাষ্ট্রশক্তিকে দেখে তার স্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতার গোপদে। আর তাদের ধারণায় রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও স্থানীয় রূপের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে তা তারা ভরে দেয় ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে নানারকম অলৌকিক বিশ্বাস দিয়ে। এইজন্যেই ক্ষমতার পিরামিডের তলায় যারা একেবারেই মাটির কাছাকাছি সেই নিম্নবর্গের কাছে পিরামিডের শীর্ষস্থ রাজশক্তিকে দেবশক্তি বলে মনে হয়। তাই জারের অধীন রাশিয়ায় জারেরই কসাক্ বাহিনীর হামলায় পর্যুদস্ত জনতা জারের কাছেই সুবিচার প্রার্থনা করে, এমনকি বিদ্রোহ করে জারের নাম নিয়েই। কারণ যে রাষ্ট্রকে তারা জানে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মারফৎ, কসাক্ বাহিনীই তার প্রতিভূ তাদের কাছে ; কিন্তু স্বয়ং জার আরেকটি, আরো শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রতিভূ। এই দ্বিতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বাস্তবে নয়, কল্পনায় ; তাকে যা চালায় তা মানুষের ইচ্ছা-শক্তি নয়, দৈবশক্তি ; ক্ষমতার যে নিয়মের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বের সংজ্ঞায় সাজানো কোনো সংবিধান নয়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মচিন্তার দ্বারা। এক কথায় বলা যায় যে সেই রাষ্ট্র একটি অলীকরাষ্ট্র।

এই অলীকরাষ্ট্র নিম্নবর্গের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিকে যে বারবার প্রভাবিত করেছে একথা সকলেই জানেন। উদাহরণগুলি সুপরিচিত : যেমন, আঠারো শতকে দেবী সি'য়ের বিরুদ্ধে উদ্যত সশস্ত্র কৃষকজনতা কোম্পানির দোহাই দিয়েই কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ; উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালী ও মারাঠী কৃষক মহারানীর নাম করেই মহারানীর সাম্রাজ্যের স্থানীয় প্রতিনিধি ও তাদের পোষ্য উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ইত্যাদি। জানা কথা : অলমতি-বিস্তরেণ। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এই ধরনের দৃষ্টান্তে কোম্পানি ও মহারানী বা একই বিশ্বাসের প্রকারান্তরে লাটসাহেব, মেজিস্টর সাহেব, জজ সাহেব প্রমুখ ধর্মাবতারের স্থান নিম্নবর্গের চেতনায় দেবদেবীর সঙ্গেই।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে করি। অলীকরাষ্ট্রবাদের ঐতিহাসিক রূপ সম্পর্কে মার্কস বলেছেন যে এই প্রকার চিন্তা সেইসব শ্রেণীরই চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য যারা উঠতির মুখে, যাদের মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবিক করার জন্য আবশ্যক উপাদান ও অবস্থা সমাজে তখনো তৈরি হয় নি। সেই বাস্তব ভিত্তির অভাবেই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ও সুসংগত কোনো ধারণাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠতে পারে না, আর সেজন্যেই তা মগ্ন হয়ে থাকে অলীকরাষ্ট্রবাদের দিবাস্বপ্নে।

আমি মার্কসের এই কথাটিকে তাঁর অসামান্য চিন্তার মধ্যেও একটি অসামান্য রত্ন বলে মনে করি। কারণ অলীকরাষ্ট্রের ধারণাটি যদিও প্রাচীন এবং তার কাল্পনিক আকৃতি পুরাকাল থেকেই বারবার চিত্রিত হয়েছে সাহিত্যে ও লোক-গাথায়, তবু কেবল প্লেটো ও রুসোর কথা বাদ দিলে মার্কসের পূর্বসূরীদের মধ্যে যাঁদের চিন্তা দিয়ে রাষ্ট্রদর্শনের তাত্ত্বিক বনিয়াদ রচিত হয়েছে তাঁরা প্রায় সকলেই শুধু রাষ্ট্রের সুপরিণত ও সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ আদর্শ রূপটি সামনে রেখে তাঁদের বক্তব্য তৈরি করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র তো সমুদ্রফেন থেকে সদ্যোত্থিতা আফ্রোদিতির মতো হঠাৎ নিখুঁত ইতিহাসনিরপেক্ষ মূর্তিতে আবির্ভূত হয় না। তার জন্মের ইতিহাস এক একটি শ্রেণীর বা সমূহের সামাজিক সত্তা ও চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই পরিণত রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচয় ছাড়া যেমন কোনো সমাজের রাজনৈতিক চেতনাকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তেমনি অপরিণত রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ সেই সমাজে প্রচলিত অলীকরাষ্ট্রবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচিত না হলে তার রাজনৈতিক ইতিহাসকে সমগ্রভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই জন্যেই টমাস্ মোর, সাঁ সিমঁ, ফুরিএ, কাবে, ওএন প্রভৃতির চিন্তাকে পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও বয়ঃপ্রাপ্তির ইতিহাসে উপক্রমণিকার মর্যাদা দেওয়া হয়।

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের ইতিহাসেও নানা শ্রেণী ও সমূহের অপরিণত রাষ্ট্রচিন্তার—অলীকরাষ্ট্রবাদী চিন্তার—নিদর্শন অনেক আছে। অন্যত্র যেমন আমাদের দেশেও তেমনি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বা সমূহের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা এই চিন্তার মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে ও বাস্তব জীবনে সেই আকাঙ্ক্ষাকে সফল করার জন্য আবশ্যক বনিয়াদ তখনো তৈরি হয় নি। ফলে অলীকরাষ্ট্র-বাদের মধ্যে ঐ সব শ্রেণীর বা সমূহের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যেমন সূচিত হয়েছে, তেমনি সূচিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় ইংরেজ রাজশক্তিকে হঠিয়ে দিয়ে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষমতায় পরিণত করার অক্ষমতা। ঐ যুগের উচ্চনীচ উভয় বর্গের অলীকরাষ্ট্রবাদেই আকাঙ্ক্ষা ও অক্ষমতার এই দোটানা বেশ স্পষ্ট। এই জন্যেই উচ্চবর্গের রাজনীতি সম্যক্ বোঝা সম্ভব নয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', মহাত্মা গান্ধীর 'হিন্দ্ স্বরাজে'র সাহায্য ছাড়া। কারণ ভারতীয় উচ্চবর্গের অগ্রণী যে বুর্জোয়াশ্রেণী সার্বভৌমত্ব কামনা করেও তা আয়ত্তে আনতে পারে নি, ঐ সাহিত্য আসলে তাদের সেই ব্যর্থতারই সাক্ষী। এবিষয়ে আজ বিস্তারিত বলার সময় নেই। শুধু একটা কথা বলে রাখি যে ভারতবর্ষে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চৈতন্যের মধ্যে একটা অলীকরাষ্ট্রবাদী উপাদানের অস্তিত্ব আমার কাছে খুবই পরিষ্কার। এই উপাদানটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা না করলে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা

অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আশা করি কোনো কোনো তরুণ ঐতিহাসিক এই জটিল, দ্ব্যর্থময় ও একান্তই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার ক্ষেত্রটি তাঁদের প্রতিভায় উজ্জ্বল ক'রে তুলবেন অদূর ভবিষ্যতে।

নিম্নবর্গের চিন্তায়ও অলীকরাষ্ট্রবাদ ঐরকম দোটানায় এবং পরস্পরবিরোধী অর্থের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ। একদিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বাস্তবে ও চৈতন্যে সেই আকাঙ্ক্ষা সফল ক'রে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ও তজ্জনিত দুর্বলতা। একদিকে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, সিদো কানুর হাতে-গড়া সাঁওতাল ফৌজ, ভারতের নানা স্থানে সারা ঔপনিবেশিক যুগ ধরে হঠাৎ এক একটি জঙ্গী সমাবেশকে উপলক্ষ ক'রে কয়েকদিনের জন্য বিদ্রোহীদের স্বাধীন-রাজ্য প্রতিষ্ঠা—একদিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার এই নির্ভীক আত্মঘোষণা ও অপরদিকে ব্যর্থতা, পরাজয়, পলায়ন, হতাশা। আকাঙ্ক্ষা ও অসাধ্যতার ভাব-মূর্তি হিসেবে তাই বিদ্রোহীদের অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রদর্শন কখনো কখনো তাঁদের পরোয়ানা, জবানবন্দী, গোয়েন্দা পুলিশ বা মিলিটারি রিপোর্টে তাঁদের কথার টুকরো টুকরো উদ্ধৃতি মারফত আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব। তাঁরা নিরক্ষর, কোনো বঙ্কিম ভূদেব গান্ধী তাঁদের হয়ে কলম ধরেন নি, সুতরাং তাঁদের বক্তব্য কখনো তাঁদের নিজের ভাষায় শোনা যায় না। কিন্তু তাঁদের শত্রুপক্ষীয় সরকার-সাহুকার-জমিদারদের লেখা নানা বিবরণে ঐ রাষ্ট্রচিন্তার রূপটিকে বারে-বারেই বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ নিম্নবর্গ যখন ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তখন যারা ক্ষমতাবান তাদের শুনতে হয় নিম্নবর্গ কি বলতে চাইছে, তা লিখে রাখতে হয় সরকারী বেসরকারী কাগজপত্রে।

এইসব সাক্ষ্য থেকে একথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষা ও অসাধ্যতার এই দ্বন্দ্বই তাঁদের চিন্তায় ধর্মভাবকে কায়েম ক'রে রেখেছে। তাই সাঁওতাল হুলের একটি বিখ্যাত যুদ্ধের মধ্যেই সিদো কানু পূজায় বসেন এবং বন্দুকের টোটা ঠাকুরের দয়ায় গলে জল হয়ে যাবে এই বিশ্বাসের ফলে তাঁদের পরাজয় ঘটে। এইভাবেই অলীকরাষ্ট্রবাদের যে দিকটা আকাঙ্ক্ষার তা নিম্নবর্গকে উৎসাহিত করেছে তার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা নিয়ে জমায়েত হতে, আর যে দিকটা অসাধ্যতার তা তাকে বাধ্য করেছে দৈব ও পারলৌকিকতার আশ্রয় নিতে। নিম্নবর্গের চৈতন্যকে যখন আমরা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগী হব তখন যেন তার এই ধর্মাশ্রয়ী দোটানা চরিত্রের গুরুত্ব ও জটিলতা স্বীকৃতি পায় আমাদের গবেষণায়, আমাদের রচনায়॥

রাজনৈতিক বাস্তবতা ও 'ত্রিদিবা'

অশ্রুকুমার সিকদার

গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা' উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা হবে। কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাস বলে কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ দরকার আছে কি? সব উপন্যাসেই সমাজের প্রেক্ষাপটে মানুষকে উপস্থিত করা হয়—যে মানুষকে আরিস্টটল বলেছিলেন zoon politikon, political animal। আর সেই কারণেই উপন্যাসে বাস্তবতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে সুইস লেখক গট্‌ফ্রিড কেলারের উক্তি 'Everything is politics'—গেয়র্গ লুকাচের এতটা অনুমোদনযোগ্য মনে হয়েছিল।[১] এ নয় যে সব কিছুই প্রত্যক্ষভাবে রাজ-

নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের আবেগ-অনুভূতি-চিন্তা সমাজগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ এবং সংগ্রামের সঙ্গে অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। চেতনভাবে বা অজ্ঞাতসারে, এমন কি যখন সে সচেতনভাবে রাজনীতির সংস্রব এড়িয়ে যেতে চায় তখনো, ব্যক্তিমানুষের সব কাজ, মনন, আবেগ ব্যাপকার্থে রাজনীতির উৎস থেকে জন্মায়, আবার রাজনীতির প্রবাহের মধ্যে মিশে যায়। আরিস্টটলের কথামতো মানুষ সত্যিই যদি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রাণী হয়, তাহলে সামাজিক মানুষের কথা উপন্যাসে বিধৃত হয় বলে, প্রত্যেক উপন্যাস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক উপন্যাস। বড় প্রমাণ, বালজাক বা টলস্টয়ের উপন্যাস। এমন কি রাজনীতির কথা যে উপন্যাসে আদৌ নেই, সেখানেও প্রচ্ছন্ন থেকে যায় লেখকের রাজনৈতিক প্রবণতা। সামাজিক মানুষের ভবিতব্য রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত করে—রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ঘটনাবর্ত; আর বিশেষ ক'রে আমাদের কালে, টোমাস মান্-এর মনে হয়েছিল, 'the destiny of man presents its meaning in political terms'.[২] কথাটা অবশ্য ইয়েটসের তেমন পছন্দ হয় নি, তিনি হালকা ভঙ্গিতে মান্-এর প্রতিবাদ ক'রে লিখেছিলেন :

> How can I, that girl standing there,
> My attention fix
> On Roman or on Russian
> Or on Spanish politics ?[৩]

রাজনীতি সম্বন্ধে যিনি এমন নির্লিপ্ততার ভান করেছেন তিনি আইরিশ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর কবিতায় সমালোচকেরা প্রচ্ছন্ন দেখেছেন ফ্যাসিজমের মতাদর্শ।

তাই সমাজবাস্তবতা যে উপন্যাসে চিত্রিত হয় সেই উপন্যাসমাত্রেই রাজনৈতিক উপন্যাস, এই রকম একটা সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছে যাই। আর সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে আমরা দেখি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' যতটা রাজনৈতিক উপন্যাস 'পল্লীসমাজ' তার চেয়ে কম নয়, বরং বেশি—কারণ অবাস্তব উপাদানের আতিশয্যে 'পথের দাবী'-তে অথেনটিসিটি বা যথার্থ্য অনেক কম। গ্রাম যে নীরন্ধ্র অন্ধকারে; দারিদ্র্য, উৎপীড়ন, বিরোধ, পরশ্রীকাতরতা, হতাশার মূল যে অর্থনৈতিক শোষণে তা শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ'-এ অকপটভাবে দেখিয়েছেন। 'প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই এক ফোঁটা জমিজায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে জন খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দুদিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ না করিতে পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে।···ইহাদের অনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার

এত অধিক যে, একবার কোনো কৃষক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়।···মহাজনেরা প্রায় হিন্দু।'—রমেশের মুখ দিয়ে শুধু এইটুকু বলানো হয় নি যে, জমিদারেরাও প্রায় সকলে হিন্দু এবং মহাজনেরা প্রায় সকলে জমিদার। বেণী ঘোষালের কথায় জমিদারী-মহাজনী প্রথার অত্যাচারের স্বরূপ আরো বেশি নির্মমভাবে নগ্ন হয়ে যায়। দু'শো টাকার মাছের জন্য বেণী ঘোষাল বাঁধের জল কাটায় বাধা দেয়, তাতে যদি চাষীর সর্বস্ব ধান নষ্ট হয় হোক। রমাও পুরোপুরি সমর্থন করে বেণীকে। জমিদার হয়ে আর এক জমিদারকে পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে বেণী রমেশকে বোঝায়, জলে ধান নষ্ট হলে চাষী 'ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে।··· কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধ টুকরো উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়েচেড়ে গুছিয়েগাছিয়ে খেয়েদেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে।' এইভাবে বাস্তব সামাজিক অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে 'পল্লীসমাজ' রাজনৈতিক উপন্যাস, আবার সেই অন্যায়ের মূল কারণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় বলেও 'পল্লীসমাজ' রাজনৈতিক উপন্যাস।

সমস্যার মূল শরৎচন্দ্রের কাছে জমিদারী-মহাজনী ব্যবস্থা নয়, সমস্যার মূল তাঁর কাছে ভালো-জমিদার খারাপ-জমিদারের সমস্যা। বেণীর মতো জমিদারদের অপসারণ হোক, রমার মতো জমিদারদের হৃদয়ের পরিবর্তন হোক, গ্রামাঞ্চলে রমেশের মতো জমিদারের প্রাচুর্য দেখা দিক—তাহলেই দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষার সমস্যা মিটে যাবে। 'পল্লীসমাজ'-এর অভিপ্রেত সমাধান থেকেই বোঝা যায় শরৎচন্দ্র কেন কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। এই কংগ্রেসই তো ১৯২২-এর বারদৌলি অধিবেশনের প্রস্তাবের ৬ নং ধারায় বলেছিল: 'The Working Committee advises Congress workers and organisations to inform the ryots (peasants) that withholding of rent payment to the zamindars (landlords) is contray to the Congress resolution and injurious to the best interest of the country.' এবং ৭ নং ধারায় বলেছিল: 'The Working Committee assures the zamindars that the Congress movement is in no way intended to attack their legal rights···'[৪]। আর শরৎচন্দ্রের সমর্থিত স্বরাজ্য পার্টির সদস্যরা ১৯২৮ সালে Bengal Tenancy Act-এর সংশোধনের দ্বারা বর্গাদারদের অধিকার বাড়ার ও জমিদারের অধিকার খর্ব করার সমস্ত প্রচেষ্টাকে একযোগে ভোট দিয়ে বানচাল করেছিলেন। স্বরাজ্য পার্টির সদস্যদের মধ্যে যিনি একমাত্র ব্যতিক্রম

সেই জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন : 'I shall not condemn the Swarajists by words. Their deeds will condemn them.'[৫]

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে শুধু 'আনন্দমঠ' বা 'চার অধ্যায়' বা 'পথের দাবী'-কে রাজনৈতিক উপন্যাস বলার অর্থ থাকে না। আসলে সমাজবাস্তবকে নিয়ে লেখা যে কোনো উপন্যাসই শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক উপন্যাস।

গোপাল হালদারের তিন পর্বে লেখা 'ত্রিদিবা' উপন্যাসকে বাস্তবতার অন্বেষণের উপন্যাস বলে ব্যাখ্যা করা চলে। উপন্যাস-চর্চার অগ্রগতির অর্থই যদি হয়, ক্রমে বাস্তবের আরো বেশি কাছে পৌঁছে যাওয়া, তাহলে আমার দ্বিতীয় বিবেচনার বিষয়, তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাস বা সমাজবাস্তবকে নিয়ে লেখা উপন্যাসের বাস্তবতা বা বাস্তবতার মাত্রা যাচাই করার পদ্ধতি কী? সামাজিক উপন্যাসের বাস্তবতা বিচারের পদ্ধতি আর ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বিচারের পদ্ধতি কি একই জাতীয়? বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বিচার যেমনভাবে করেছিলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার? 'সীতারাম' সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেছিলেন : 'এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই।'[৬] কিন্তু নবাবিষ্কৃত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিতে যদুনাথ সিদ্ধান্ত করেছিলেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাঙ্গালার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য···।'[৭] অথবা 'রাজসিংহ' বিষয়ে লিখেছেন : 'বঙ্কিমের পর এই অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে যেসব ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে···তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।'[৮] সত্য অর্থাৎ বাস্তব। কারণ সত্য মানেই তো 'the accurate correspondence between reality itself and a given account of reality.'[৯]। আসলে ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপন্যাসের সত্য বা বাস্তবতায় কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই—ঐতিহাসিক উপন্যাস অতীতের বাস্তবকে রূপায়িত করে, আর সামাজিক উপন্যাস রূপায়িত করে বর্তমানের বাস্তবকে। 'The ultimate principles are in either case the same. And they flow from a similar aim : portrayal of a total context of social life, be it present or past, in narrative form···'[১০]। এই কারণেই মার্কিন সমালোচক হ্যারি লেভিন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কটকে আদি রিয়ালিস্ট বলে সনাক্ত করেছেন।[১১] যদি এই কথা সত্য হয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক সত্য আর সামাজিক উপন্যাসের বাস্তবতা আসলে অভিন্ন পদার্থ—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য

শুধু কালগত—তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বিচারের প্রচলিত প্রণালী ব্যবহার ক'রে আমরা কি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বাস্তবতা যাচাই করার সুমিত সরকারের *The Swadeshi Movement in Bengal* বই পড়ে?

সামাজিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বস্তুসত্য নিরূপণে এই পদ্ধতির অসুবিধা অনেক। তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞান গড়ে উঠলেও, তাদের আজ আর কেউ পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তিনিরপেক্ষ বলে দাবি করেন না। উপন্যাসে নিশ্চয়ই ব্যক্তিসাপেক্ষতা বেশি; কিন্তু অতীত বা সমসাময়িক তথ্যনির্ভর ইতিহাসও একেবারে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। সুতরাং সেই ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে উপন্যাসের বাস্তবতা নির্ধারণ বিষয়ে সংশয় জাগে। তাছাড়া নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে একটা সময়ের ইতিহাসের ধারণা যদি বদলে যায়, তাহলে কি বারে-বারেই সেই সময় নিয়ে লেখা উপন্যাসের বাস্তবতার পুনর্বিচার করতে বাধ্য হব আমরা? হয়তো তাই আমাদের করতে হবে। প্রত্যেক প্রজন্মের আবিষ্কৃত তথ্য ও ইতিহাস-ব্যাখ্যানের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে দেখতে হবে অটুট থাকে কিনা তার বাস্তবতার দাবি। আসলে উপন্যাসের বাস্তবতা আর সামগ্রিকতার সমস্যা পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে সামগ্রিকতা আছে। বুর্জোয়া-মহাকাব্য উপন্যাসের মধ্যে যখন সেই সামগ্রিকতা ধরা পড়ে তখন সেই উপন্যাস হয়ে ওঠে বাস্তববাদী। স্কটের উপন্যাসের সঙ্গে ফ্লোবেয়ারের *Salammbo*-র তুলনা প্রসঙ্গে এই সামগ্রিকতার সমস্যা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন লুকাচ। স্কটের উপন্যাসে আছে বহির্জগৎ ও চরিত্রগুলির অন্তর্জগতের মধ্যে গভীর সাযুজ্য। কিন্তু তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দিলেও বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সেই সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি ফ্লোবেয়ার, তাই তাঁর উপন্যাসে archeological exactness of the outer world'.[১২] থাকলেও তার মধ্যে সামগ্রিকতা নেই, আর তাই বাস্তবতাও নেই। তবে একথা ঠিক, উনিশ শতকী উপন্যাসে বস্তুসত্যের ঘনত্ব যেভাবে দেখা যায়, বিশ শতকের ভাঙন আর বিপর্যয়ের মধ্যে উপন্যাসে বস্তুসত্য সেই প্রণালীতে প্রত্যাশিত নয়। প্রথমত, শিল্পের অগ্রগতি তার টেকনিকের অগ্রগতি, তাছাড়া বাস্তবের চেহারাও আজ পরিবর্তিত। বালজাক বাস্তববাদী, কাফকাও বাস্তববাদী। তাছাড়া উপন্যাসে বাস্তবকে বিধৃত করার ব্যাপারে বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপন্যাসিক প্রণালীগত স্বাধীনতা নিতে পারেন। সাহিত্য জীবনসত্যকে রূপায়িত করে বলে তার মধ্যে 'মাইমেসিস' আছে, আর সেই মাইমেসিসকে উপস্থিত করার যে সুষমা—'হার্মোনিয়া'—তারই মধ্যে নিহিত শিল্পীর প্রণালীগত স্বাধিকার। বস্তুসত্যকে কী প্যাটার্ন দেওয়া হবে, উপন্যাস কোন প্রণালীতে 'stylizes its mimicry'[১৩] তা অনেকটাই স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করেন ঔপন্যাসিক।

শেষপর্যন্ত উপন্যাসে বাস্তবতা আছে কি নেই তা নিরূপণের চূড়ান্ত উপায়

হয়ত আছে উপন্যাসের অন্তর্নিহিত অথেনটিসিটি বা অকৃত্রিমতার মধ্যে। উপন্যাসের স্ট্রাকচারের মধ্যে। অকৃত্রিমতা, যাথার্থ্য বা অথেনটিসিটি কোন উপন্যাসে আছে আর কোন উপন্যাসে নেই তা রবীন্দ্রনাথের দু'টি তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' আর 'চার অধ্যায়' তুলনা করলেই প্রতীয়মান হয়ে যাবে। সাহিত্যে বাস্তবতার দাবিকে বুদ্ধদেব বসু খুব একটা গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু তাঁর কাছেও 'চার অধ্যায়'-এর সমস্ত চায়ের দোকানটাই 'অলীক'[১৪] বলে মনে হয়েছে। কিন্তু শুধু চায়ের দোকানটাই অলীক নয়, এই উপন্যাসের পরিবেশ অনেকটা শ্রুতি-নির্ভর, অভিজ্ঞতা-জাত নয়, রোমাঞ্চকর আর তাই বস্তুঘনত্বের লক্ষণ থেকে বঞ্চিত। অন্য ভাষায় একই অভিযোগ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের : 'লিখিত ক্ষুদ্র চারি অধ্যায়ের পিছনে যে বহু সংখ্যক অলিখিত অধ্যায় আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহাদের অভাবে উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস যেন খণ্ডিত, ভারকেন্দ্রচ্যুত বলিয়া মনে হয়।'[১৫] অনেক অধ্যায় অলিখিত রেখেও অথেনটিক হয়ে উঠতে পারে 'চতুরঙ্গ'-এর মতো উপন্যাস—কারণ তত্ত্ব, ইতি-নেতির ডায়ালেকটিক, শচীশের আত্মজিজ্ঞাসা তার বিষয়। সেখানে প্রতিবেশ পরিণত হতে পারে রূপকে, আর হয়েও তার যাথার্থ্য বজায় রাখতে পারে। কিন্তু 'চার-অধ্যায়' রাজনীতি-নির্ভর, আর বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে রাজনীতির অস্তিত্ব নেই, ফলত বস্তুসত্যের অভাবে 'চার অধ্যায়' হয়ে যায় কৃত্রিম, বানানো, অথেনটিসিটি-হীন। নিশ্চয়ই 'তত্ত্বের যন্ত্রণা আর ব্যক্তির টেনশন, তত্ত্বের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আর ব্যক্তির উদ্বেগ এক হলে পলিটিক্যাল নভেল শৈল্পিক রূপ পায়।'[১৬] 'চার অধ্যায়'-এ ব্যক্তি আর রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতির টেনশন খুব সূচ্যগ্র আকারে উপন্যাসে স্থাপন করা হয়েছে, তবু এই উপন্যাস যে ব্যর্থ হল তার কারণ এই টেনশনের বাস্তব ভূমিটি নির্মাণ করা হয় নি। ফলে বুঝতে হয়, বক্তি ও তত্ত্বের দ্বন্দ্বই যথেষ্ট নয়, সেই দ্বন্দ্বের বাস্তব ভূমিটিও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে রচনা করা চাই। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সেই বাস্তব ভূমিটি অনুপস্থিত নয়। স্বামী-স্ত্রী-বন্ধুর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, তত্ত্ব ও ব্যক্তির টেনশনের পিছনে সেখানে রাজনৈতিক বাস্তবতার সত্য সক্রিয় ও নিত্য বর্তমান। সন্দীপ একদিকে যেমন অগ্নিযুগের যুবাদের এক স্তরের মানসিকতার প্রতিনিধি, তেমনি অমূল্য আর এক স্তরের মানসিকতার প্রতিনিধি। বিমলার উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, উন্মাদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে যেন সাকার হয়ে উঠেছে সমস্ত দেশের উন্মাদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। স্বদেশী আন্দোলন থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের দূরে সরে থাকা, বয়কট আন্দোলন যে অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছুকদের উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া—এইসব ইঙ্গিতের এক-একটি রেখার মধ্য দিয়ে তিনটি নরনারীর বক্তিগত ও তত্ত্বগত দ্বন্দ্ব বাস্তব ভূমি পায় এবং তার ফলেই উপন্যাসটি অকৃত্রিম সত্যের জোরে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। বাস্তব ভূমিকে, এবং বাস্তব ভূমির সঙ্গে পাত্রপাত্রীর সাযুজ্যকে, এমনভাবে বিশ্বাস্য ক'রে তোলার মধ্য দিয়েই উপন্যাসে অভিপ্রেত অথেনটিসিটি এসে যায়।

গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' মিলিয়ে যে 'ত্রিদিবা' উপন্যাস তার মধ্যে নায়ক অমিতের জীবনের তিন দিনের কথা আছে, আর তিনটি দিনের করতলে ধরা হয়েছে প্রায় দুই দশক সময়—১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যবর্তী অস্থির সময়ের রাজনৈতিক বিবর্তনের অভিজ্ঞতাকে। 'একদা'-র কাহিনী ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরের একদিন, 'অন্যদিন'-এর কাহিনীর বিষয় ১৯৩৭-৩৮ সালের একদিন, 'আর একদিন'-এর কাহিনী রচিত হয়েছে ১৯৪৮ সালের বিশেষ একদিনের ঘটনা নিয়ে। এইভাবে তিরিশের দশকের অগ্নিযুগ থেকে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে, শ্রমজীবী বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগে উত্তরণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা এই উপন্যাসত্রয়ীতে বিধৃত। 'ত্রিদিবা'-র তৃতীয় পর্বের শেষে তপন ভট্টাচার্যের কথা আছে। প্রাচীন বৈষ্ণব অধ্যাপক বংশের সন্তান সে, ফিজিকসের লেবরেটরি ক্লাসরুমের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে চটকল সূতাকল শ্রমিকের সংগ্রামে নিজেকে লিপ্ত করেছে—লেখকের ভাষায় 'ইন কোয়েস্ট অব রিয়ালিটি'। শুধু তপন ভট্টাচার্যের নয়, নায়ক অমিতেরও নয়, লেখক গোপাল হালদারের 'কোয়েস্ট অব রিয়ালিটি'-ই এই উপন্যাসের বিষয়। আর তাই অমিত নিজেই শুধু ক্রমে বাস্তবতার নিকটবর্তী হয় না, 'একদা' থেকে 'আর একদিন'-এ পৌঁছতে গিয়ে উপন্যাসটিও পেয়ে যায় অনেক বেশি বাস্তবের ঘনত্ব।

'একদা'-য় বাস্তবতাগুণ তুলনায় কম, আর নায়ক মধ্যবিত্ত যুবক অমিত যেন অনেকটা নির্লিপ্ত, বাস্তবজীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন থেকে খানিকটা দূরে যেন তার অবস্থান। দু'টো কবিতা পড়ে, কিংবা ইতিহাসের দু'টো অধ্যায়, কিংবা আর্ট একজিবিশনে গিয়ে শিল্পানুশীলনে মনকে হিল্লোলিত ক'রে সে অবশ্য তৃপ্ত হয় না। সহপাঠী শৈলেন বা সাতকড়ির চাকরি ও পেশাসর্বস্ব জীবন তার মনে বিতৃষ্ণা জাগায়। বাঙালির ইতিহাসের অনুসন্ধানে তার মনের অন্তঃপুরে প্রেমিকের প্রেমাকাঙ্ক্ষার মতো এক সুগভীর পবিত্র নিষ্ঠা জেগে ওঠে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদার পণ্ডিত হওয়ার শখ তার নেই—বরং 'যশ-কাঙাল পণ্ডিতসমাজের হ্যাংলাপনা' তাকে পীড়িত করে। প্রিয়জন অনুযোগ করে কেন সে পি. আর. এস. হচ্ছে না। সাহিত্য অমিতের অস্তিত্বের অঙ্গ, সাহিত্যের রশ্মিপাতে সে জীবনকে ব্যাখ্যা করে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষে সে স্কটের জগৎ থেকে ডিকেন্স-থ্যাকারের জগতে প্রবেশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শেকসপীয়র তার কণ্ঠাগ্রে। জীবনের প্রতিকল্প ও ভাষ্য সে খুঁজে পায় তাঁদের রচনায়। ইন্দ্রাণী-সবিতা-ললিতার আলগোছ সান্নিধ্য তার নিঃসঙ্গ জীবনে মাধুর্য সঞ্চার করে। সৎ বাঙালি ছেলের মতো বাবা-মা'র প্রতি, বিদ্যোৎসাহী পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রতি সে গভীরভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ,—যদিও সে জানে তাদের স্থিতিশীল জীবনাদর্শ বর্তমান অস্থির সময়ের পক্ষে আর উপযোগী নয়। ভাইবোনের প্রতিও তার গভীর স্নেহ। প্রথম পর্বের দিনটি অমিতের যায় সন্ত্রাসবাদী সুনীলের জন্য টাকা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা

করায়। সন্ত্রাসবাদী সুনীল-মনীশকে সে সাহায্য করে, যদিও জানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পৃথিবীর ভিত্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। এই আন্দোলনের রোমান্টিক আবেদন মধ্যবিত্তদের পেয়ে বসেছে, কিন্তু 'জনগণের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এমন প্রয়াসে অমিত বিশ্বাস হারাইয়াছে অনেক দিন।' অথচ গণ-আন্দোলনে যোগ দিতেও সে পারে না। সে নিজেই স্বীকার করে, 'মোতাহেরের মতো সে ডগমার কাছে নিজেকে সঁপিয়া দিতে পারে না, দাশের মতো আধা-শৌখিন আধা-ইনটেলেকচুয়াল ইডিয়লজি ও টেকনিক লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না; মজুর-কর্মীর উপযোগী স্থিরতা ও ধৈর্যও তাহার নাই। তাহার মনের গঠন স্বতন্ত্র···।' তার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসকে রাজনৈতিক উত্তাপ স্পর্শ করে, কিন্তু সমস্ত দ্বিধা জয় ক'রে সে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে না। বাসে যেতে-যেতে শোভাযাত্রার উপর সে পুলিশের লাঠি চালনা দেখে নিজেকে 'কাওয়ার্ড অ্যাণ্ড চীট' বলে ধিক্কার দেয়, কিন্তু শোভাযাত্রায় যোগ দেয় না। বাস থেকে শেয়ালদার মোড়ে ডেলি প্যাসেনজারের ভিড় দেখে অমিত ভাবে: 'সংসার সকলকেই ডেলি প্যাসেনজার করে ছাড়ে—কাহাকেও আর পিলগ্রিম থাকিতে দেয় না।' অমিত এখনো নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রী, এই তীর্থযাত্রী এখনো তার তীর্থে পৌছোয় নি, বাস্তবতার তীর্থে। 'একদা'-য় সে এখনো দ্বিধান্বিত, যদিও চলমান। সে জানে বর্তমান যুগ কর্মের যুগ, কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে সে আজো সমগ্র সত্তার সায় পায় না। সারা দেশে যখন আগুনের ফুলকি খেলে বেড়াচ্ছে, যখন ধনতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক মন্দায় শুরু হয়েছে সমাজবিপ্লবের প্রস্তুতি, তখন অমিত শেকসপীয়রের দ্বিধান্বিত নায়কের মধ্যে নিজের স্বরূপকে প্রতিবিম্বিত দেখে, 'Time is out of joint. O cursed time! that ever I was born to set it right!' সে বিশ্বকে তার অভ্রান্ত লক্ষ্যে পৌছে দেবার দায়িত্ব নেয় না, বরং হ্যামলেটের 'to be or not to be' উক্তির সংশয়ে আন্দোলিত হতে থাকে—রাজনৈতিক জীবনের বাস্তবতায় নিজেকে লগ্ন করবে কি করবে না। আর নায়কের এই দ্বিধার ফলেই যেন 'একদা' উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি ঘনীভূত বাস্তবতার অনুপস্থিতি—সুনীল, ইন্দ্রাণী, মনীশ, দীনু, সবিতা, ব্রজেন্দ্রবাবু কেউ যেন ত্রিমাত্রিক অস্তিত্ব অর্জন করে না। নায়ক অমিত জানে 'তার পূর্ণতা আপনাকে প্রসারিত করায়।' কিন্তু সে এখনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে গণ্ডীবদ্ধ। এই তীর্থযাত্রীর তীর্থযাত্রা আজো সংশয়পীড়িত, সত্তার পূর্ণতা যে প্রসারতায় যে লগ্নতায় সেখানে সে এখনো পৌছুতে পারে নি।

প্রথম পর্ব 'একদা'-র অন্তিমে ভোরবেলায় ঘরের সামনে পুলিশের বুটের শব্দ শোনা যায়—অমিত গ্রেপ্তার হয়। দ্বিতীয় পর্ব 'অন্যদিন'-এ তাকে পাই ১৯৩৭-৩৮ সালের একদিনে, যেদিন অমিত জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে। বিদায়মুহূর্তে

সে অনুভব করে জেলখানা তার কাছে ছিল যেন এক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে শেষ হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য তার প্রস্তুতিপর্ব। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে সে শিক্ষা লাভ করে মানুষের সান্নিধ্যে—এখানে চোর রঘু আছে যে মনে করে অমিত 'মনুষ্যত্ব' ভালো করবে, কালীকিংকরের মতো লোক আছে যে জেলে থাকার মূল্যে কিনে নিতে জানে কর্পোরেশনের কাউন্সিলর-পদ অ্যাসেমব্লির সদস্যপদ, লক্ষ্মীধরের মতো পুরাতনপন্থী স্বাস্থ্যব্রতী, শশাঙ্কনাথ, নিরঞ্জন, বিভূতি, ভুজঙ্গ সেনের মতো বিপরীতধর্মী বিচিত্র মানুষ। অথবা বাসীন নন্দীর মতো অকুতোভয় যুবক যে জেল সুপারকে সেলাম না দিয়ে জানায় সে সুপারকে চ্যালেন্‌জ করছে না, চ্যালেন্‌জ করছে ইংরেজ সাম্রাজ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপকে। পাশাপাশি চলে অধ্যয়ন, ফ্রেজারের *Golden Bough*, মার্কস-এঙ্গেলসের বই, অন্যদিকে আর একদলের আগ্রহ কেড়ে নেয়, 'ফ্রয়েডীয় মনো-বিজ্ঞানের মতো বৈজ্ঞানিক আর অপ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কামকলার চিত্তাকর্ষক তথ্য আর তত্ত্ব।' আর সর্বক্ষণ চলে রাজনৈতিক মত আর পথ নিয়ে বিতর্ক। স্পেনে গণতন্ত্রের সপক্ষে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের কার্যকলাপ অমিতকে উত্তেজিত করে, কিন্তু সে ভুলতে পারে না বিবেকানন্দের বাণী 'আমি ভারতবাসী, ভারত-বাসী আমার ভাই।' নিরঞ্জনের মতো কেউ-কেউ বাঙালির মিশন, ভদ্রলোকের নেতৃত্বে আস্থাবান। তারা ভাবে জাপানের সঙ্গে মিলে প্যান-এশিয়ান ঐক্য চাই। তাদের প্রত্যয়ের মধ্যে মেলে ফ্যাসিবাদের অংকুর। শেখরেরা আবার গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে এবার নতুন হাওয়া, কম্যুনিজমের হাওয়া। জ্যোতির্ময় ঘোষণা করে: 'বস্তু ছাড়া বস্তু নাই'· কমিউনিজমই পথ আর কোমিন্টার্নই গতি।' বিভূতিবাবুর মতো আন্দামান-প্রত্যাগত বিপ্লবীরা সাম্য-বাদের পথে আসছে, আসছে প্রাণবান শ্রেষ্ঠ যুবকেরা। অনেকেই তারা প্রিয় বন্ধু অমিতের, কিন্তু এখনো অমিত তাদের সঙ্গে একতান-মন হতে পারে নি।

জেলখানার ঠিকানায় লেখা পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠির দু'টো শব্দ 'অন্যদিন' পর্বে বার-বার পুনরাবৃত্ত হয়—'প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা'। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা অমিত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসবে; পাঠকের তথা লেখকের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা অমিত তার অ-সংলগ্ন প্রবাসবোধ অতিক্রম ক'রে লগ্ন হবে, লিপ্ত হবে। সেই প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা এই পর্বেও পূর্ণ হয় না। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গৃহাঙ্গনে ফিরে দেখে মা নেই, বাবার 'ক্ল্যাসিক্‌স-পরিপুষ্ট মনও ম্লান হইয়াছে', বোন অনু রাজনৈতিক আন্দোলনে আছে আবার সংসারও করছে—জীবন পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলেছে। 'একদা'-য় বন্ধুপত্নী সুধীরা একদিন প্রশ্ন করেছিল, 'আমাদের কি কিছু করবার নেই?'—আজ অনুর মতো মেয়েরা প্রশ্ন করে না, রাজনৈতিক আন্দোলনে নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ে যোগ দেয়। একদিকে ব্রজেন্দ্রবাবুর কন্যা বিধবা সবিতা যার কাছে অমিত 'ভারতীয় আদর্শ;

জাতীয় আত্মবিকাশের একটি প্রতীক,' অন্যদিকে ইন্দ্রাণী, স্বামী-বিচ্ছিন্ন রূপবহ্নি ইন্দ্রাণী, যাকে অমিত তার 'নিয়তি' বলে জানে। ইন্দ্রাণী অমিতের নাম ধরে ডাকলে মনে হয় সে 'যেন কণ্ঠস্বর নয়, রক্তকণার সম্ভাষণ।' এই ব্যক্তিগত আকর্ষণের সংকট থেকে অমিত ঘরে ফিরে এসে দেখে রাজনৈতিক কর্মীরা তার জন্যে অপেক্ষায়। সে আবার বোঝে, জীবন পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলেছে—জীবন, চতুষ্পার্শ্বের বাস্তব দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। অগ্নিযুগ ছিল মন্ত্রগুপ্তির যুগ—'মৌনতাই ছিল সেদিন সংকল্পের, দৃঢ় চিত্তের পরিচায়ক।' এখন ছাত্রনেতা শ্যামল, ডকমজুর নেতা মোতাহের খোলাখুলি মিছিল সংগঠন গণ-আন্দোলনের কথা বলে। মোতাহের জানায়, বসে নেই মজুর, নতুন দিন আনার পথে সে পা বাড়িয়েছে। মজুর যেই আত্মপরিচয় পাবে, মোতাহের বিশ্বাস করে, অমনি সে নিজের পার্টিকে চিনতে পারবে। 'কোটালের বান ডাকিতেছে আজ ইতিহাসে।' অমিত বুদ্ধি দিয়ে বোঝে 'In the beginning was deed'; সে জানে 'ইতিহাস ক্ষমাহীন, কারণ ইতিহাস সৃষ্টিশীল। আমি অমিত ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাসের অস্ত্রও।' সে আরো জানে, 'only in action do we know reality,'—রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণেই বাস্তবকে, জীবন-সত্যকে স্পর্শ করা যায়। বুদ্ধি দিয়ে বোঝে, কিন্তু কার্যত এখনো তার পক্ষে সক্রিয়ভাবে পার্টিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কোথায়ও একটা দ্বিধা থেকে যায়। মোতাহের জানতে চায়, অমিত পার্টির সদস্যপদ এখনো অঙ্গীকার করে নি কেন? মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিক যুবকেরা শ্রেণীস্বার্থ ত্যাগ করতে পারে না বলেই কি? কারণ যাই হোক, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণেই আমরা বাস্তবকে পাই, একথা বোঝা সত্ত্বেও সে এখনো সক্রিয় অংশ নিতে প্রস্তুত হয় নি। তবু বাস্তবতার অন্বেষণে সে যে নিত্য জঙ্গম তার প্রচ্ছন্নপ্রমাণ রয়ে গেছে অমিতের শেকসপীয়রের চরণ উদ্ধৃত করার মধ্যে। প্রথম পর্বে অমিত খালি ভেবেছিল 'to be or not to be!' এখন সে বলে 'What a piece of work is man!' শুধু মানুষের মহিমায় সে বিস্মিত হয় না। অমিত আরো দেখে মানুষ কীভাবে তার আত্মপরিচয় রচনা করে—Ah! how man makes himself! সে বোঝে 'নিজেকে মানুষ হারায়।' এই দেওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ আপনার আত্মপরিচয় রচনা করে।

তৃতীয় পর্বে 'আর একদিন'-এ এই তীর্থযাত্রী সমস্ত সংশয় জয় ক'রে তার বাঞ্ছিত তীর্থে পৌঁছে যায়। ১৯৪৮ সালের এক ভোর রাত্রে, সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষে, অমিত গ্রেপ্তার হয়ে আনীত হয় লর্ড সিনহা রোডের গোয়েন্দা দপ্তরে। এখন সে আর বাইরের লোক নয়, সে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আজ। ১৯৪৮-এর এই দিনে বসে অমিতের মনে পড়ে একশো বছর আগের ইয়োরোপের উত্তাল বিপ্লবী দিনগুলির কথা, যেদিন বসে ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেল্‌স কম্যুনিস্ট

ইস্তাহারে লিখেছিলেন, 'A spectre is haunting the world'। আজ একশো বছর পরে সেই স্পেক্টার সেই প্রেতচ্ছায়া ভারতবর্ষে সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, নব্য শাসক-কুলকে ক'রে তুলছে শংকিত। বারে-বারে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর এই বাক্যটি অন্তিম পর্বে পুনরাবৃত্ত হয়। আজ যেহেতু সিদ্ধান্তে নিশ্চিত এবং ক্ষুরধার অমিত, সেই কারণে হ্যামলেট চরিত্রের তাৎপর্যও তার কাছে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 'আজ অমিত জানে, সেদিন সে হ্যামলেটের চিন্তা-উদ্বুদ্ধ কর্মী চরিত্রকে চিনিতে পারে নাই। ভুল করিয়াছে, ভুল দেখিয়াছে কোলরিজের মতো কর্মশংকিত চোখে দেখিয়া হ্যামলেটকে। বুঝে নাই হ্যামলেট কর্মবীর ও চিন্তাবীর।'

রাজনৈতিক বাস্তবতার সত্যস্বরূপকে 'একদা'-য় অমিত যেহেতু অঙ্গীকার ক'রে উঠতে পারে নি, সেই বাস্তবতার সঙ্গে সে যেহেতু লগ্ন হতে পারে নি, সেই কারণে 'একদা' যেন পাতলা হাওয়ার বই, বাস্তবের ঘনত্ব সেখানে অনুভব করা যায় না। তুলনায় 'অন্যদিন'-এ বাস্তবতা ঘনীভূত, অমিত নিজেও সেখানে পরিমাণে অনেক বেশি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। 'আর একদিন'-এ অমিত যখন পরিপূর্ণ-ভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে একজন পার্টি সদস্য, তখন লক্ষ করি উপন্যাসের চূড়ান্ত এই তৃতীয় পর্বটি অন্য দুই পর্বের তুলনায় বাস্তবতাগুণে হয়ে উঠেছে নিটোল ও পরিপূর্ণ। নাও হতে পারত, যদি বিশেষভাবে মনে রাখি উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে লেখকের আত্মজীবনকে আশ্রয় ক'রে। লেখকের পার্টি-সদস্যরূপে যোগদানের সঙ্গে-সঙ্গে নতুন পার্টি-সদস্য অমিতের দৃষ্টি হয়ে যেতে পারত একদেশদর্শী; যে বহুমুখী চৈতন্য রিয়ালিটি-অর্জনের উপায় তা হয়ে যেতে পারত অনুপস্থিত, পার্টি-ইডিয়লজির নিঃসংশয় আনুগত্যে লেখা অসংখ্য সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম্-ধর্মী উপন্যাসে যেমনটি বারে-বারে ঘটেছে। ইডিয়লজি আচ্ছন্ন ক'রে দিতে পারত অভ্রান্ত রিয়ালিটি-দৃষ্টি।[১৭] কিন্তু আর্টের সততা তথা বাস্তবের সততা গোপাল হালদার বজায় রাখতে পেরেছেন, আর এখানেই উপন্যাসত্রয়ীর জয়, লেখকের কৃতিত্ব। এই বাস্তবতাকে চরিতার্থভাবে অর্জন করার প্রয়োজনে গোপাল হালদার এখানে একটি চমৎকার রচনাকৌশল ব্যবহার করেছেন। লর্ড সিনহা রোডে গ্রেপ্তার হয়ে আসা মানুষের তালিকায় নানা দীক্ষিত কম্যুনিস্টকে তিনি জড়ো করেছেন জীবনের ও সংগ্রামের নানা স্তর থেকে এবং সেই সমস্ত মানুষের বিবর্তনের গল্পের মধ্য দিয়ে পরিবর্তমান বাস্তবতার সামগ্রিক চেহারাকে রূপ দিয়েছেন। সম্পর্কিতা বোন সুরবালার মেয়ে মঞ্জুকে গ্রেপ্তার হয়ে উপস্থিত হতে দেখে আশ্চর্য হয়েছে অমিত। অমিতকে নিয়ে যার গর্বের শেষ ছিল না সেই সুরবালার বিয়ে হয়েছিল অবস্থাপন্ন ঘরে কিন্তু প্রতিকূল পারিবেশে। গাঙ্গুলি সাহেবের স্ত্রী হয়েও সে মেমসাহেব হতে পারে নি। সংসারে বন্দিনী সুরবালার আজীবন ক্ষোভ ছিল 'আমরা তো দেশের কোনো কাজেই

লাগলাম না!' বিশবছর পরে পরিবর্তমান নারীসমাজের প্রতিনিধি হয়ে, উচ্ছ্বাসপরায়ণা মঞ্জু যেন সেই ক্ষোভের জবাব দিচ্ছে আজ—'সে কাজ মেয়েরাও পারে।' সুরোর ট্র্যাজেডি মেনে-চলার ট্র্যাজেডি, মঞ্জুর ট্র্যাজেডি বিদ্রোহের ট্র্যাজেডিতে পর্যবসিত হবে কিনা তা ভবিষ্যৎ কালই বলতে পারে। আপাতত লক্ষ করি মঞ্জু সুরোর মতো ব্যর্থ হতে রাজি নয়, সে আপন ভাগ্য আপনি রচনা করবে। রসিদ আলি দিবসে আহত বিজয়কে সে বিয়ের প্রস্তাব দেয় গোয়েন্দা দপ্তরে বসে। পঙ্গু বিজয়ের কুণ্ঠাকে সে গণ্যই করে না। নিজের বিয়ে নিজেই ঠিক ক'রে সে মায়ের কথার মর্যাদা রাখে, আর অমিতের কাছ থেকে উপহার পায় তার 'বহুদিনের সহচর শেকসপীয়র'।

অমিতের অন্তর্লীন আত্মকথনের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি সংস্কৃত পণ্ডিত বংশের ছেলে তপনের কথা, যাদের বাড়িতে চতুষ্পাঠী ছিল। কালের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাভব মেনে তপনের বাবা ছেলেকে ইংরেজি পড়তে দিয়েছিলেন। ছেলে ফিজিক্স পড়ে, দর্শন পড়ে, কলেজে চাকরি নেয়। বার্নাল, হ্যালডেন পড়ে কম্যুনিস্ট হয়। In the beginning there was deed—শব্দ নয়, কর্মেই সৃষ্টির সূত্রপাত—অমিতের এই কথা তাকে প্রাণিত করে। মোতাহেরের সঙ্গে তপন জড়িয়ে পড়ে চটকল ধর্মঘটে। সেই ধর্মঘটের কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে শ্রমজীবী আন্দোলনের বাস্তবতা চলে আসে উপন্যাসে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মিল্ থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়, র‍্যাশন বন্ধ করা হয়। ৬৩ দিন পরে মালিকের গরজে কারখানা খোলে, কিন্তু তারপরেই ছাঁটাই হয় মংলী এবং রশিদ। আবার ধর্মঘট। পুলিশ এবং পূর্ব থেকে প্রস্তুত গুণ্ডাবাহিনী লাঠির জোরে কারখানা থেকে আবার মজুরদের বের ক'রে দেয়। পরের দিন মজুরেরা জোর ক'রে কারখানা দখল করতে গেলে গুর্খা পুলিশ গুলি চালায়। সাতজনের মৃত্যু হয়, মংলী আর মল্লিক নিখোঁজ হয়, তপন গ্রেপ্তার হয়ে চলে আসে গোয়েন্দা দপ্তরে। এই ধর্মঘটেরই প্রসঙ্গে উপন্যাসে এসে যায় অসামান্য দুই নারী শ্রমিক পার্বতী ও বিলাসপুরিয়া মংলীর কথা। অসুস্থ স্বামীকে বাঁচাতে দেশলক্ষ্মী চটকলে চাকরি নিয়েছিল বাঙালি বধূ পার্বতী—আজ সে ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী। দৃপ্তকণ্ঠে সে ম্যানেজারকে জবাব দিতে পারে: 'হয় না খেয়ে শুকিয়ে মরো,—নয়, খেটে মুখে রক্ত উঠে মরো,—মোটের উপর মরতেই হবে। এর মধ্যে তাহলে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কী আছে?' এই পার্বতীর সহযোদ্ধা বিলাসপুরিয়া মংলী, অথচ কতই পৃথক তাদের চরিত্র। আকণ্ঠ মদ্যপানে, জীবন-সম্ভোগে সে দ্বিধাহীন। পার্বতী স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাবতী, মংলী অস কোচে বহুপুরুষকে আত্মদান করে। সম্পূর্ণ অসামাজিক তার ব্যক্তিগত জীবন, কিন্তু মজুরের আন্দোলন সংগ্রামের সময় সে এক অকুতোভয় ক্রুদ্ধ বাঘিনী। এদের কথা স্মরণে রেখে অমিত ভাবে: 'দেশলক্ষ্মী মজুর ইউনিয়নের মধ্য হইতে উত্থিত হইতে পারে নাকি সত্যকারের ভারতীয় মজদুরনী নেত্রী বিলাসপুরিয়া মংলী আর

বাঙালি পার্বতী ?' মজুরদের জাগরণ, সংগ্রামী মনোভাব ও নিজেদের আন্দোলনে নিজেদের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা দেখে অমিত আরো ভাবে, তাদের মতো মধ্য-বিত্তরা আর হ্যামলেট নয়, নায়ক নয়, তারা নিতান্ত হোরেশিও—এই যুগের আসল হ্যামলেট, আসল নায়ক শ্রমজীবীরাই।

পাশাপাশি কানাই হাজরার কাহিনীর মধ্য দিয়ে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে কৃষক-আন্দোলনের বাস্তবতা। ভাগচাষী বা খেতমজুর ছিল না কানাইরা। বাবা মহিমের ছিল বার বিঘা জমি। কানাই শৈশবে বাপের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ শেখে, আবার পাঠশালাতেও যায়। উৎসবে-অসুখে জমি বন্ধক পড়ে, ঊনত্রিশের মন্দার আঘাতে জমি বিহারী ঘোষদের কবলস্থ হয়। চেতনার ব্যাপ্তি ও গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গে অভিজ্ঞতা কানাইকে যুক্ত ক'রে দেয় কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৪২ সালে কৃষক-সমিতির আন্দোলনে যোগ দেয় কানাই। ভেড়ির বাঁধ কাটা নিয়ে, ধানের ভাগ নিয়ে একের পর এক আন্দোলনে সে নেতৃত্ব দেয়। জামাই মধুও হয়ে ওঠে কানাই হাজরার সহযোগী। জমিদার মহাজনের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে কানাই ঝানু সমিতিওয়ালা হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠছে কমরেড। তেভাগা আন্দোলনে জেল খেটে, ফেরার হয়ে, সম্মেলনে যোগ দিয়ে আজ সভায় মিছিলে কৃষকনেতা কানাই হাজরা সকলের চেনা মানুষ। তার কাছ থেকেই জানা যায়, শুধু মঞ্জুর মতো শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে জাগরণের জোয়ার আসে নি, সেই জোয়ার এসেছে গ্রামেও। চাষীর বৌ-মেয়েরা বসে নেই—সেই সাহসিকারাও লড়াইয়ে নেমেছে। দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে গ্রামজীবনের বাস্তবতার পট।

একই কৌশলে গোপাল হালদার উপন্যাসে উপস্থিত করেন অবাঙালি ট্রাম-শ্রমিক কমরেড বুলকনকে। গোরখপুর বা আজমগড় জিলার মানুষ বুলকন। সামান্য ইংরেজি-পড়া বুলকন গাঁয়ের ঠাকুরদের ছেলেকে চড় মেরে ঘর-ছাড়া হয়েছিল। বনারস, কানপুর হয়ে কাজের ধান্ধার অবশেষে বুলকন এসে পৌঁছোয় কলকাতা শহরে। বড়বাজারে মালবাহী মজুরের কাজ নেয় সে। কিন্তু যেমন তার শারীরিক শক্তি, তেমনি তীব্র তার আত্মসম্মানবোধ। একদিন মর্যাদার সওয়ালে এক সাহেবকে মেরে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে সে পালিয়ে যায় দেশে। অনেক পরে কলকাতায় ফিরে মুরুব্বির সহায়তায় পেয়ে যায় ট্রাম কন্ডাক্টরের চাকরি। ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে উত্তরপ্রদেশাগত এই শ্রমিকের রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ হয়। দুর্গা দত্ত, অবধপ্রসাদ পাণ্ডে, মহম্মদ ইয়াকুবের নেতৃত্বে তারা গড়ে তোলে ট্রামশ্রমিকের ইউনিয়ন। যুদ্ধের সময় তারা কিন্তু হরতাল করে না, যেহেতু তখন ফাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াই চলেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলেই তারা ধর্মঘটের ডাক দেয়; একের পর এক আসে রসিদ আলি দিবস, ঊনত্রিশে জুলাই চতুর্দিকে প্রশংসাধ্বনি ওঠে, 'বাহাদুর ট্রামকো মজদুর'। এদের সঙ্গে গোয়েন্দা

দপ্তরে জড়ো হয় জ্যোতির্ময় সেন, যে একদিন পূর্বপাকিস্তানে নামজাদা কম্যুনিস্ট কর্মী ছিল। আজ হিন্দুর পক্ষে পূর্বপাকিস্তান নিরাপত্তাহীন—'জ্যোতির্ময় সেন—মিনতি সেন পর্যন্ত আর আজন্মের কর্মক্ষেত্রে তারা দাঁড়াইবার ঠাঁই পায় না।' আজ তারাও উদ্বাস্তু। লর্ড সিনহা রোডে পুলিশের গাড়ি ভর্তি হয়ে এসে পৌঁছোয় কৃষক-সভার সুরথ ভট্টাচার্য, মহেশ দাস, সৈয়দ আলি, অতীতের সন্ত্রাসবাদী বিনোদ ভট্টাচার্য, বেণু ঘোষ, শঙ্কর দয়াল, কান্তিলাল চতুর্বেদী, আর অমিতের বহুদিনের বন্ধু ডকশ্রমিকের নেতা মোতাহের। প্রত্যয়ে-প্রদীপ্ত এই মানুষগুলির পাশে বাস্তবতার মূর্তিকে সার্থক ক'রে তুলতে উপন্যাসে এসে যায় বিপরীত পক্ষের ছায়াময় প্রসঙ্গ। এসে যায় সুরবালার স্বামী আর মঞ্জুর বাবা গাঙ্গুলি সাহেবের কথা, ধর্মঘট ভাঙার পরামর্শদাতা জাফর সর্দার, নরমপন্থী কংগ্রেসী কৃষক-নেতা গণেশ, Intellectual Beauty মিসেস সেনরায় ওরফে কুইনি, কংগ্রেস পার্টির হুইপ ভুজঙ্গ সেনের কথা।

অমিত, তপন ভট্টাচার্য, কানাই হাজরা, বুলকন, মঞ্জু, মোতাহের প্রভৃতি যখন পুলিশের নির্দেশে কালো গাড়িতে উঠে জেলের উদ্দেশে যাত্রা করে তখন ব্ল্যাক মারিয়ার মধ্যে দেশকালের বাস্তবতার খণ্ড-খণ্ড অংশগুলি যেন পূর্ণাঙ্গতা পেয়ে যায়। তারা যায়, শুধু জেলের দিকে নয়—'ইন কোয়েস্ট অব রিয়ালিটি'—জীবনসত্যের অন্বেষণে। একদিন অমিতের আত্মপরিচয় কোথায় জানতে চেয়েছিলেন পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্র রায়—'সে পরিচয় আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেমমণ্ডিত গৃহরচনায়, ধ্যানসুন্দর প্রীতিসুন্দর গোষ্ঠীরচনায়, একান্তে বসিয়া আত্মরচনায়।···না, ছোট আমিতে সুখ নাই ইন্দ্রাণী, Only in intense living do we touch infinity.' ব্যাপক বাস্তবতার মধ্যে আত্মলোপেই সপ্রাণ জীবনযাপন সম্ভব, আর সতেজ জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই অমিত অসীমকে স্পর্শ করে। অন্যদিকে ইন্দ্রাণী সবিতা, যারা অমিতকে ভালোবেসে শ্রদ্ধা করেও বুঝতে পারল না 'collective living'-এর মধ্যেই মাত্র plentitude' বা ঐশ্বর্যলাভ সম্ভব, তারা অপচয়ের পথে চলে গেল। 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।' তারা বিনষ্ট হল, আর জেলের পথে, বাস্তবতার সন্ধানের পথে, কালো গাড়ি তাদের পিছনে ফেলে চলে গেল।

বিজয় কবিতা লেখে। বিজয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে অমিত ভাবে—'কোনো বড় কবিতাই তো আসলে ব্যক্তির কথা নয়। সত্যকার কবিতা সামূহিক অনুভূতির প্রকাশ, যুগের সৃষ্টিচেতনার উপলব্ধি কাব্যরূপের মধ্য দিয়া।···হয়তো আর একান্তভাবে তেমন লিরিক কবিতার যুগ থাকিবে না। আসিতেছে মহাকাব্যিক উপন্যাসের দিন। নিটোল-গল্পে-সমাপ্ত নবেলের দিনও আর থাকিবে না। দুই-

একজন নায়ক-নায়িকার কথা লইয়াও উপন্যাস আর সীমাবদ্ধ থাকিবে না। তাহা সামগ্রিক জীবনচিত্র, জগৎপ্রবাহের প্রতিকল্প হইয়া উঠিতেছে—দুইজন বা দুইশো জনকে আশ্রয় করিয়া।' এখানে লেখক অমিতের ভাবনায় ভবিষ্যতের উপন্যাস সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, অতীতের উনিশ শতকী উপন্যাসেই তো সেই সব লক্ষণ ছিল। টলস্টয়-বালজাকের উপন্যাস তো যথার্থই মহাকাব্যিক উপন্যাস, তাদের মধ্যেই তো সামগ্রিক জীবনচিত্র বা এপিকের বস্তুসমগ্রতার মহিমা খুঁজে পেয়েছেন লুকাচ।[১৮] তাহলে অমিতের কথার মধ্য দিয়ে গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'-র কোন বৈশিষ্ট্য আমরা বুঝে নিতে পারি? প্রথমত, উনিশ শতকী উপন্যাস জগৎপ্রবাহের প্রতিকল্প হিসেবে অবশ্যই বস্তুবাদী, কিন্তু 'ত্রিদিবা' উপন্যাসে আছে সেই বাস্তবতা অর্জনের ইতিহাস—সেই দিক থেকে এই বিশ শতকী উপন্যাসটি ভিন্নধর্মী ও আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত। আর লুকাচ না মানলেও একথা সত্য যে, 'Traditional techniques ot realism are inadequate to deal with the realities of our age.[১৯] তাই গোপাল হালদার বাস্তবকে রূপায়িত করতে গিয়ে বালজাক-টলস্টয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি। ব্যবহার করেছেন অন্তর্লীন আত্মকথনের প্রণালী। একজনের অন্তর্লীন চিন্তার মধ্য দিয়ে লেখক উপস্থিত করেছেন দু'শো জন মানুষকে আর তিনটি মাত্র দিনে সংহত করেছেন অস্থির পরিবর্তমান দুই দশক কালকে। তৃতীয় একটি দিক থেকেও এই বাস্তববাদী উপন্যাসটি স্বতন্ত্র। নায়ক অমিত রাজনৈতিক কমিটমেণ্টের মধ্য দিয়ে যতই বাস্তবতার দিকে এগোয়, ততই লেখক গোপাল হালদারের উপন্যাসও পর্বে-পর্বে বাস্তবতার কাছে পৌছে যায়। অমিতের বাস্তবতার অন্বেষণ আর উপন্যাসের বাস্তবতার অন্বেষণ একাকার হয়ে যায়। বিশ শতকের উপন্যাস বিষয়ে লিখতে গিয়ে হ্যারি লেভিন বলেছেন: 'The worker and the artist, Zola's hero and Prousts', pose the dilemma of twentieth-century literature; its Hamlet-like hesitation between active and a passive role, between participation and withdrawal—*solidaire* or *solitaire*, in Hugo's equivocation.'[২০] হ্যামলেটের কথা বারে-বারে এসেছে। অমিত শিল্পীর স্বভাব নিয়ে কর্মী হতে চায়, নিষ্ক্রিয় আর সক্রিয় ভূমিকার মধ্যে আন্দোলিত হয়, অবশেষে নিঃসঙ্গতা থেকে সংঘবদ্ধতায় উত্তীর্ণ হয়। আর উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়েই তার বাস্তবতার অন্বেষণ চরিতার্থ হয়।

তাই গ্যেটের ***Wilhelm Meister***-কে যে অর্থে নভেল অব এডুকেশন বা শিক্ষামূলক উপন্যাস বলা হয়েছে, 'ত্রিদিবা'-ও সেই অর্থে শিক্ষামূলক উপন্যাস। ইতিহাসের একটি লক্ষ্য বা তাৎপর্য আছে, সেই তাৎপর্যকে অন্বেষণই এই শ্রেণীর উপন্যাসের মৌলিক প্রসঙ্গ। 'The reader follows the life-story of a

character because it moves in step with, and assists the progress of, history towards justice.'[২১] অনেক মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অমিত একটি ক্রমে-উদ্ভিন্ন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, অর্জন করছে একটা পরিণতি, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন সম্বন্ধে একটি মহৎ শিক্ষা। ঘটছে তার আত্মিক বিস্তার, সক্রিয় যোগদানের মধ্য দিয়ে সে চরিতার্থতা অর্জন করছে—'in effective dealing with reality, and not merely in contemplation.'[২২] কিন্তু এই বাস্তববাদী শিক্ষামূলক উপন্যাসে সরল বর্ননামূলক পদ্ধতি ব্যবহার না ক'রে গোপাল হালদার অন্তর্লীন আত্মকথনের ভঙ্গি ব্যবহার করলেন কেন? সরল বর্ননামূলক পদ্ধতি উনিশ শতকী উপন্যাসে বাস্তবতার রূপায়ণে খুবই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে একথা ঠিক, আজ ঐ চিরাচরিত পদ্ধতিতে আধুনিক বাস্তবকে রূপায়িত করা যায় না। শুধু সেই কারণেও নয়, তার চেয়েও বড় কথা 'ত্রিদিবা' উপন্যাসে অন্তর্লীন আত্মকথনের পদ্ধতি উপন্যাসের নিজের গরজেই জরুরি ছিল—কারণ এই উপন্যাসটি কাহিনীপ্রধান নয়, আত্মসমীক্ষা-আশ্রয়ী। অমিত নিজের বিবর্তনকে নিজেই পর্যালোচনা করছে—নিঃসঙ্গ প্রবাসবোধ থেকে সঘবদ্ধতায়, ধ্যান থেকে কর্মে তার বিবর্তন। আর বাস্তব জগৎ উপন্যাসে এসে যাচ্ছে সেই আত্মসমীক্ষার সুযোগেই। উপন্যাসটি যেহেতু আত্মসমীক্ষামূলক সেই কারণে অনিবার্যভাবে গোপাল হালদার ব্যবহার করেছেন আত্মকথনের প্রণালী।

জয়সের ব্যবহৃত চেতনাপ্রবাহের পদ্ধতি তাঁর পছন্দ না হলেও লুকাচ স্বীকার করেছেন সেই পদ্ধতি তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক মান্ *Lotte in Weimer* উপন্যাসে গ্যেটের ব্যক্তিত্বের মর্মে প্রবেশের কাজে চমৎকার কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।[২৩] জয়সের ব্যবহার সম্বন্ধে লুকাচের মীমাংসা কতটা নিরপেক্ষ সে তর্কে আমাদের প্রবেশের দরকার নেই। চেতনাপ্রবাহ ও অন্তর্লীন আত্মকথনের প্রণালীর মধ্যে প্রভেদ বিষয়ে সচেতন থেকেও, আমরা শুধু লক্ষ করছি, গোপাল হালদারের উপন্যাসে অন্তর্লীন আত্মকথনের পদ্ধতি নিতান্ত শৈল্পিক একটা প্রথা নয়—উপন্যাসের আত্মসমীক্ষামূলক বিষয়ের গরজেই এই প্রণালীর এই উপন্যাসে ব্যবহার অপ্রতিরোধ্য ছিল। এখানে বিশিষ্ট আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়েছে আঙ্গিকের জন্যে নয়,—বাস্তবতার পটে, বাস্তবতার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে, নায়কের আত্মবিকাশ উন্মোচনের প্রয়োজনে। তাই এখানে অন্তর্লীন আত্মকথনের শৈলীর মধ্যে ধরা পড়েছে ক্ল্যাসিক্যাল উপন্যাসের বাস্তবতাবোধ।[২৪] এই সমন্বয় খুব নিপুণতার সঙ্গে গোপাল হালদার ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই এই উপন্যাস, অন্তর্লীন আত্মকথনের ব্যবহার সত্ত্বেও, নিন্দার্থে সাব্‌জেকটিভ বা বিষয়ীপ্রধান হয়ে যায় নি; বাস্তবের মাত্রাকে পূর্ণভাবে অক্ষুন্ন রেখে হয়ে উঠেছে আধুনিক॥

উল্লেখপঞ্জি

১ দ্রষ্টব্য *Studies in European Realism* গ্রন্থের ভূমিকা।

২ *Collected Poems of W. B. Yeats*, 1955, p 392, 'Politics' কবিতার এপিগ্রাফ্।

৩ 'Politics' কবিতার অংশ।

৪ দ্রষ্টব্য R. Palme Dutta, *India Today*, 1979, p 352

৫ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Partha Chatterjee, *Agrarian Relations and Politics in Bengal : Some Considerations on the Making of the Tenancy Act Amendment 1928*, Occsional Paper No. 30, CSSSC.

৬ বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৭ 'সীতারাম' উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভূমিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

৮ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ভূমিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

৯ Harry Levin, What is Realism ? *Contexts of Criticism*, 1969, p 68

১০ George Lukacs, *The Historical Novel*, 1969, p 290

১১ '…he (Scott) was virtually a sociologist ; and, certainly, was the forerunner of the realists.' *Contexts of Criticism*, p 174

১২ *The Historical Novel*, p 225

১৩ Levin, *The Gates of Horn*, p 6

১৪ রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, ১৯৫৫, পৃ ১৬৮

১৫ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৮০, পৃ ১৯০

১৬ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলাদিত্য পত্রিকা, জুলাই ১৯৮১, পৃ ১২

১৭ Ernst Fischer, *Art Against Ideology*, 1969, গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় Co-existence and Ideology-তে এই দ্বন্দ্বের চমৎকার আলোচনা আছে।

১৮ মহাকাব্য ও উপন্যাসের সামগ্রিকতার মধ্যে অবশ্য লুকাচ্ পার্থক্য করেছেন তাঁর *The Theory of the Novel* (1971) বইতে। তিনি লিখেছেন : 'The epic gives form to a totality of life that is rounded from within : the novel seeks, by giving form, to uncover and reconstruct the concealed totality of life. p 60

১৯ *The Meaning of Contemporary Realism*, 1962, গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০ *The Gates of Horn*, p 62

২১ Michel Zeraffa, *Fictions : The Novel and Social Reality*, 1976, p 99

২২ Lukacs, *The Theory of the Novel*, p 132-33

২৩ Lukacs, *The Meaning of Contemporary Realism* গ্রন্থের The Ideology of Modernism প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৪ ব্যাপারটা রণেশ দাশগুপ্তের নজরে ধরা পড়েছিল। দ্রষ্টব্য, অনন্ত ত্রিদিবা, পরিচয়, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ ১৮৩

নতুন কবিতা

…to speak a true word is to transform the world…
– *Pedagogy of the Oppressed*, Paulo Freire

এই অংশটিকে নতুন কবিতার একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র বলা যায়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একদল অতি তরুণ ও প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন কবির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের নবীনতা, সজীবতা ও আত্ম-প্রকাশের অনন্যতাকে স্বাগত জানাচ্ছে এক্ষণ। স. এ.।

দীপতোষ মজুমদার

মারমেইড্

ঘুম থেকে উঠে তার অবিমিশ্র সামুদ্রিক ক্ষোভ।
শতাধিক অক্টোপাস মুখ গুঁজে শাড়ির আঁচলে,
অথবা সে দু-চোখেতে জড়িয়েছে ডুবুরীর স্নেহ—
সহস্র মাইল নেমে দুঃখ পেতে, দুঃখ পেতে লোভ।

ক্লান্ত শুশুকের মত ফেনিল রোদ্দুর তার ত্বকে,
চুলের কুয়াশা চিরে সারিবদ্ধ চিল উড়ে যায়,
অতি সাধারণ কিছু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কথা
ঠোঁটের আগল খুলে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হতে চায়।

ফ্লেমিঙ্গো পাখির ডানা ঝরে গেছে রুদ্ধ জানালায়,
পেঙ্গুইন ফেরে কই রোমন্থক দেয়ালের হিমে ?
কড়িকাঠে ঝুলে থাকে দিশাহারা কম্পাসের শব,
নবমুখী স্তনে স্বেদরেখা এঁকে বয়স শুধায়।

স্তিমিত সকাল যাবে অতিবৃদ্ধ জাহাজের মত,
পরিতাপে বিদ্ধ হ'য়ে আরো কত দৈন্য হবে জমা ;
বৃষ্টি হয়ে, বৃষ্টি মেখে গভীর শরীরে তার এসে,
কেউ তাকে দিয়ে যাক অনাগত রাত্তিরের ক্ষমা।

প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোকে

তোকে সুনিপুণ হত্যা করার এমন আততায়ী সংবাদ গোপন করা হয়েছে
আমার কাছে যদি কোন প্রাচীন স্মৃতির গুহাদ্বার খুলে যায় সংগোপন
টানে যদি মূল হয় কক্ষচ্যুত সেই আশংকায় সুবেশ জল্লাদেরা সুরম্য
বাগানে খনন করেছে কবর তারপর এপিটাফ লিখে দিয়েছে নিজেদের
ভাষায় যে অক্ষর ছিল না তোর কোনদিন যে ঘাতক বর্ণমালাগুলো তুই
গাণ্ডীবটাংকারে বিদ্ধ করেছিস সেই বশংবদ আজ্ঞাবাহী আক্ষরিক
অনুকম্পায় ভূষিত করেছে তোকে এদিকে বসন্তের দ্বিধাহীন নখরাঘাত
ক্রুশবিদ্ধ মহিমায় আচ্ছাদিত তোর শবদেহ তোরই কবিতার কোমল
মুখের সামনে পোড়ানো হয়েছে কি নিদারুণ উৎসব আমি সেই কতদিন
জলরাশি স্পর্শ করিনি তোর তীক্ষ্ণ ক্রন্দন আমাকে জাগিয়ে রেখেছে
কতদিন পেরোই নি সেই সব পথের বাঁক একান্ত সজ্জিত শকটের উপর
তোর নিঃশঙ্ক অভিবাদন যেখানে ক্রমাগত ছায়া ফেলে আছে রেলিঙের
ধারে জমা আবর্জনা স্তূপে এখনো ছাখ্ ফুটফুটে রাধাচূড়া কি অমল
অপেক্ষায় নতজানু আকাশের যে অংশ এখনো পাণ্ডুর হয়নি তার কাছে
যাবে বলে তোরই স্বপ্নের আকুলতায় ভেঙে পড়তে চাইছে জলপ্রপাত
তুই দেখে যা একটা শিশু দুই হাত ভরে রাতভোর ঝড়ের শেষে ঝরে পড়া
নক্ষত্রমালা দিয়ে গেঁথে গেঁথে রেখেছে বৈভবহীন এক মুকুট তোকেই
পরাবে বলে এই ভোর যখন সনাক্ত করছে অন্ধকার পাথুরে স্তব্ধতা যখন
আলিঙ্গন করছে ভয়াবহ মূক এক অশ্বত্থ আজন্ম যার পাতাগুলি সবুজতম
কোন প্রলেপ পায়নি বৃষ্টির কাছ থেকে এ শহর আমার স্নায়ুতে এমনি
সব কথা খচিত করেছে তপ্ত ঘৃণায় তোর বারান্দায় এলো চুল হাওয়ার
সমর্থনে শুধু ভালো থাকার শঙ্খধ্বনি যেন দীর্ঘতম গান হয়ে না বাজে
এক টুকরো কাগজের ওপর আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা একটা চিঠি
কিম্বা অনন্য সুস্থতার প্রতিশ্রুতি যাতে নূপুর পরে ডানা মেলে প্রত্যর্পণ
করতে না পারে তোর উত্তর তাই চুরমার করে উদগ্রীব বারান্দা ডাক-
বাক্স আছড়ে ফেলে শুভ্র দেওয়ালে স্বজন হননে রক্তের দাগ মুছে দিয়ে
উদগ্র রক্তের প্রলেপে তোকে সুনিপুণ হত্যা করার এমন আততায়ী
সংবাদ গোপন করা হয়েছে আমার কাছে।

এপ্রিল ১৯৮১

জয়দেব বসু

ছয় টুকরো

"পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন···"

১

বিবর্ণ বসন্ত ওড়ে, ধূ-ধূ-হাওয়া আদিগন্তে লীন
কখনও হেমন্ত নামে, জমে খড়, কখনও শীত ;
এখানে আমার পাশে জমে রাত – মাথার ভিতরে –
জল ঝরে···জল ঝরে···ঝরে যায়···জল···শুধু জল···

২

কোন পথে, কতদূর, পায়ে হেঁটে নাকি বুকে সয়ে ?
সীমান্তে তমসা নামে, কপোলের প্রান্ত বেয়ে চুল ;
তুমি কি আমার হবে – নাকি দেবে করাঘাত আরো ?
আমার দুয়ার দেখ কেঁপে ওঠে – কেঁপে-কেঁপে ওঠে –

৩

আমরা তো একা নই, মহাদেশে প্রদেশ হয়েছি।
শবযাত্রীরা যায় পথে পথে হরিবোল দিয়ে,
আমারই অবসান তাতে উড়ন্ত খইএর মত ওড়ে –
একথা অজানা নয়, জান তুমি, জেনে গেছি আমি···

৪

তবে কার দোষে আজ একা আমি হতেছি একেলা !
মাথার ভিতরে জানি স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন গড়ে রাজ্যপাট।
কেন, কার দোষে আজ ভোগো তুমি অসুখ – অ-সুখে !
এ কোন ব্যক্তির নয় – ভয়াবহ সামাজিক পাপ।

৫

ভরা পেট, ভালবাসা—এই দুই সূর্যের কাছে
আমাদের চলাচল—চলা শুরু অতীত প্রত্যুষে,
এখনো ক্লান্তি আছে, ঠিক জানি ভালবাসা আছে,
এ পথে বিপথ আছে, এও জানি শপথও শাণিত।

৬

এই পথে, বহুদূর, পায়ে হেঁটে আর বুকে সয়ে···

আত্মকথন : উপমন্যুর প্রতি

আমিও তোমার মত পড়ে আছি অন্ধকার কূপে,
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাঁকে, কৃমিকীটে এবং মণ্ডুকে,
আমিও তোমার সাথী—একই সাথে অন্নে নিরত,
বিরত গ্রহণে দুগ্ধ, এমনকি উৎসারিত ফেন-ও ;

দগ্ধ হই, দগ্ধ হই—শুধু দাহ আকন্দ আহারে,
বণিক বিধানে আছি, আছি কূপে অনন্ত আঁধার,
উড়িয়ে পলিত কেশ, আগুন জ্বালিয়ে বুকে-পেটে
চারিপাশ ঘিরে নাচে দিল্লীর মায়াবী জরতী ;

কেন, কোন অপরাধে পড়ে আছি পাতাল প্রদেশে ?
কামনা করিনি দ্বেষ, মাৎসর্য এবং অসূয়া,
চেয়েছি দু-মুঠো ভাত—মানুষের পেট ভরে যাতে,
উদার উন্মুক্ত এক উদ্বেল উড়াল আকাশ !

আমাদের ক্ষুধা ছিল, আর ছিল আলো পিপাসা,
মানুষ কি আজও নয় আলোর স্তাবক !
নিশীথে বুঝিবা বাজে কারও বীণে আহীর-ভৈরব,
তবে কি ঘনায় ভোর—দিনের নকীব আসে উষা !

আমার অজ্ঞাত সব···নিষ্প্রদীপ চোখে ঝরে জল···

এপ্রিল ১৯৮২

দেবাশীষ চক্রবর্তী

ঋতুসংহার

গ্রীষ্ম

পোড়াকপালী ধানক্ষেত শুয়ে আছে
চাতক, চাতক তো বুকে
এমনকি চোখে চোখে জল নেই
কলকাতা বাঁকুড়া বীরভূম পাশাপাশি বসে আছে
এত প্রতীক্ষা রাখবে, কত গভীর তোমার ডিপ্-ফ্রীজার ?

বর্ষা

শহর ফিরে গেছে নিজস্ব অবধানে, আমরা যে যার
ভুবনে ঘিরে আছি বৃষ্টির ছায়াকে, ছোঁয়াছুয়ি নেই
পরস্পরে, ভালোবাসাবাসি নেই, উজান লাগে বুকের
ভেতরে, আর কোনোদিন ফিরে যাওয়া যাবে, যাবে ?

শীত

যে কোনো নারীর চেয়ে সুন্দর আকাশ
আজ তার উদোম বুক খুলে দিয়েছে হিমস্নানে
পাথর জ্বলানো রূপো চরাচর নিঃস্ব করে রাখে
বারুদের বর্ম খুলে অপমান আজ রাতে জেগে থাকে কোষে
ভালোবাসার গর্বে স্বেচ্ছামৃত্যুর চরিত্রেরা
এমন রাতে গল্প হয়ে ফিরে আসে, কোন্ প্রলাপে
বেঁচে যে আছি, তার জন্য, আজ রাতে অহংকার হয় !

বসন্ত

কৃষ্ণচূড়া, ঝলসে উঠলে রেড রোডের ধারে
বসন্তে এবার পাঁজরে জ্বলছে আরো আগুন
ফাল্গুন হাওয়া রুক্ষ চুলেতে শৃঙ্খলা আনে
কৃষ্ণচূড়া আকাশ হচ্ছে ক্রমশ লাল, ক্রমশ লাল

পোড়ামাটির মুখ চেয়ে

আমার কবিতা পড়ে তুমি ঘুমোও
আর বুকে খাতা চেপে ধরে একটা আঁচড় কাটবার জন্য
সারারাত জেগে থাকি আমি

সকালে তুমি আমার দরজায় কড়া নাড়ো
আর আমি দড়ি পাকিয়ে খবরের কাগজের মতো
কবিতা ছুঁড়ে দিই
অথচ কাল সারারাত আমার স্বপ্নের পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ বুলেট
একটা আঁচড় কাটবার জন্য সারারাত্তির জেগে থাকি আমি

তোমার রজনীগন্ধার উৎসবে স্বপ্নের চারধারে
আলো জ্বালা বিশ্রাম
কবিতাকে অলঙ্কার করেছ
অথচ সময় থেকে উৎসারিত আগুনে ফুসফুস পুড়িয়ে
আমার কবিতাকে আমি পোড়ামাটির স্বাদ দিতে চেয়েছিলাম

কোথাও ঠাণ্ডা হাওয়া ছুঁয়ে থাকে ঠোঁট
কোথাও পাঁজর
কোথাও ভাঙামানুষ কেবলই বইয়ের প্রচ্ছদ
আর কোথাও স্বয়ং জড়িয়ে ধরে চিতা

তুমি যখন কবিতার গর্ব করছো
তখন কাপুরুষের লজ্জা আমার রক্তে সুন্দরবনের বান ডেকে আনে

সোনা আমার
তোমার ঘুমের জন্য তো আর আমি
রণসজ্জা খুলে ফেলতে পারি না।

উনি এবং আমরা

উনি বললেন—'মানুষ'
আর ওনারই বই থেকে অক্ষর তুলে নিয়ে আমরা বললাম
'আগে ঠিক করতে হবে বুর্জোয়ারাও স্বাধীন কিনা!'

উনি প্রশ্ন করলেন – 'মানুষের জ্বালা ?'
আমরা জবাব দিলাম
'শ্রেণীফ্রণ্টের তত্ত্ব ছাড়া আমরা এক পাও নড়ছি না'

উনি উচ্চারণ করলেন – 'মানুষের স্বপ্ন'
আমরা বললাম
'সংস্কৃতির মধ্যে গড়ে তুলতে হবে দুর্গ'

উনি ভেঙে পড়লেন, 'মানুষের কি হবে ?'
আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রমণের অপরাধে আমরা ধমকে উঠলাম
'চুপ করো উনিশ শতকের বুড়ো
যুক্তির যুগে নতুন সব ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে
যা বোঝার মতো ক্ষমতা তোমার নেই !'

'ভুল হচ্ছে, ভুল হচ্ছে' বলতে বলতে
উনি কুয়াশার দিকে চলে গেলেন ॥

সৌমিত্র ঘোষ

দু'টি কবিতা

১

মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পুড়িয়ে
তোমার জন্যে গড়ে দিয়েছি   অনবরোধ
অনবরুদ্ধ তুমি তোমার
রেখে যাচ্ছো তীরবর্তী
অসংলগ্ন পায়ের ছাপ।
প্রতিরোধ তো সীমাহীন নয়,
তাই কি তুমি মহাসাগর নিঙড়ে আসা
ঢেউয়ের মাথায় মুখ রাখলে

আবার আমি আসবো বলে
গ্রহণ লাগা চাঁদের জরদ জ্যোৎস্না এখন ঢেউয়ের চূড়োয়
ভেঙে যাচ্ছে মহাসমুদ্রে।

এখন আমি নগ্নদেহেও তীর পাই না
এখন আমি স্থবির আমার অনুভবেও যন্ত্রণা নেই।
হাওয়া এখন বইছে না আর
হাওয়া এখন দুলে উঠছে
বিষাদগ্রস্ত হাওয়া এখন টুকরো টুকরো
প্রতিনিয়ত কেঁপে যাচ্ছে।

২

জেলে দিয়েছি আত্মা
বৃষ্টিতে, ঝড়ে, বিদ্যুতে।
যে মেঘের পেছনে থাকো তুমি
তারই সঙ্গে গভীর হয়েছে সন্ধে।
দূরে, বহুদূরে তখন আত্মমগ্ন মেঘের
সামুদ্রিক প্রতিফলনে,
শোনা গেছে পদধ্বনি।
সমাহিত সমুদ্রের অন্তর্নিহিত গর্জনে
শীতার্ত সূর্যের শেষ সম্মোহিত রশ্মিতে
ভূকম্পনে, বিহ্বল অগ্নুৎপাতে
ভূমধ্যীয় সঙ্গীতে
প্রতীক্ষা ছিল
দ্বারপ্রান্তে পদধ্বনি ছিল।

গাগী দত্ত

অসুখ

অথচ এখনও জল
অথচ এখনও সেই নির্জন দ্বীপান্তর
সেই উদ্বিগ্ন প্রহর গোণা
এখনও থামে না।

আজকাল যাওয়া হয় না।
আজকাল পৌঁছতে গেলেই
জল পার হতে হয়।
তুমি লক্ষ্য করেছ,
আজকাল 'পৌঁছানো' শব্দটায়
হলুদ রঙ ধরেছে—
ধারগুলো কেমন খয়েরী ?

অথচ,
সবচেয়ে জরুরী কথাটাই
এখনও না-বলা রয়ে গেল।
আমার সেই ছল-ছল নদীটার কথা—
আর পাড়ের ধারের সেই অশ্চর্য ঋজু গাছটা,
যার নাম আমার মনে নেই—তাদের কথা,
সব কথা
বলব ভেবেছিলাম।
কোনো দুপুরের
নীল প্রহর ভরে বলব ভেবেছিলাম।

এখনও আমার যাওয়া হল না।

শুধু মাঝে মাঝেই
দু-চারটে জলের ফোঁটা
ছুটে আসে কপালে, গালে, চোখের পাতায়···

আরো কতকাল তুমি,
এই একইভাবে
ঢেউ গুণে যেতে বল আমায় ?

সোমক রায়চৌধুরী

পয়লা ফাল্গুনের কবিতা

কোনও বারণ ছিলো না। হাহাকার, প্রার্থনা ছিলো না
জেনেও গতকাল ধুলোয় গড়াগড়ি খাওয়া ময়লা মেঘ
আকাশে হানা দিলো বহুদিন বাদে। যারা চোখ তুলে
চাইল তাদের চোখে দু-এক ফোঁটা জল পড়ল ওপর থেকে।
যারা নীচের দিকে চাইল—তাদের চোখ থেকে নীচে।
তবু নিশ্চিতভাবে অকাশবাণী তরঙ্গে
খোনা গলায় খনা বলছিলেন—যদি বর্ষে মাঘের শেষ ইত্যাদি।

কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো মেটরো রেলের খাদে মুখ লুকিয়ে
আছে—ধোঁয়া—ধুলো আকাশ আর ন্যাড়া গাছের
ফাঁকে টেপরেকর্ড-করা কোকিলের ডাক শুধু বিস্মৃতিই
বহন করে—এইমাত্র গর্জন ক'রে তিনটে ট্রাক বস্তা-বোঝাই
হ'য়ে পশ্চিমে যেতে যেতে বলে গেল। এবং
তোমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে
অন্যমনস্কভাবেই হয়তো তোমার চোখের
আয়নায় দেখে আল্‌তো আঙুলে চুলটা আঁচড়ে নিয়েছিলাম।

গতকাল মাঝরাতে উচিত ছিলো কিন্তু বাজে নি
গঙ্গাবক্ষে দাঁড়ানো জাহাজের উদ্‌গ্রীব সাইরেন—বাজে নি
বিপন্ন বিবেক এবং বালিশটাকে আঁকড়ে ধ'রে যখন শুয়ে আছি
বিমুখ কোকিল, প্রজাপতি এবং ফুল ফুটুক না ফুটুক
সবাইকে উপেক্ষা ক'রে মেঘেরা বলে গেল—

তোমার উপস্থিতি ছাড়াই ক্যালেণ্ডারে আজ পয়লা ফাল্গুন।

ফাল্গুন ১৩৮৮

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

কয়েকটি কবিতা

কোথায় ভীষণ কান্না
সময় কোথায় পুড়ছে
ভয়াবহ এই আয়োজন
সুখের কিম্বা দুঃখের
সময় ভীষণ পুড়ছে
ফুটপাত জুড়ে পুড়ছে
বিকেল মানেই রোদ্দুর
সুখের কিম্বা দুঃখের
বিচূর্ণ রোদ অস্থির
মানুষ একাই হাঁটছে
কোথায় ভীষণ কান্না
সময় কোথায় পুড়ছে

বসন্ত ১৯৮১

দূরবীন দিয়ে কতদূর আর দেখা যায়
সাপের ফনারা দুলছে কেবলই দুলছে
অবিনশ্বর জিহ্বার খর লাস্য
মৃত্যুলোলুপ কংক্রীট্ অই নীলিমা
ভরতুকি চায় ভোরের আলোর ঝর্না
ফুল মরে গেলে হৃদয়ে গেঁথো না সংঘাত
সস্তা বাজার লুঠ ক'রে থাক রাত্রি
নরম ঘড়ির মুখোশ পরেনি ভাবীকাল

সেপ্টেম্বর ১৯৮১

...

হাওয়া বিলোয় পাতা ঝরার এলোপাথাড়ি ঝর্না
চতুর্দিক ত্রস্ত হয় ঝলসে যায় ফুল
নিথরতার অতল এই কাণ্ড দেখে হাসছে
দুয়ার খোলো দুয়ার খোলো সমুদ্রের হল্‌কা

ছায়া ফেলেছে অন্ধকার মুহুর্মুহু লাস্য
চাঁদের মূল নোনা দিনের গভীরে ঢুকে যায়
মৃদঙ্গের স্খলন আহা নিথরতার নৃত্য
দুয়ার খোলো দুয়ার খোলো সমুদ্রের হল্‌কা

আমরা দুটি তারার মত অর্থবহ হবো
অথবা যদি শূন্যে দোলে লম্বমান ঘড়ি
এলোপাথাড়ি ঝর্না দেবো তোমার কালো চুলে
দুয়ার খোলো দুয়ার খোলো সমুদ্রের হল্‌কা

রামধনুর পাঁজর থেকে ভেঙে এনেছি কান্না
মন্দিরের ফাটলগুলো আমার দিন ভাঙছে
যদিও বুক প্লাবিত হয় মদির ঔদাস্যে
দুয়ার খোলো দুয়ার খোলো সমুদ্রের হল্‌কা

নভেম্বর ১৯৮১

এমন কোনো ইস্‌তাহার নেই আমার
যাকে ভালোবাসা যায়
এমন কোনো ফুল নেই যাকে
পূজা করি
এমন কোনো পদ্য নেই যার স্তব
গাওয়া যায়
এমন কোনো ইস্‌তাহার নেই আমার

এমন কোনো গাছ নেই শূন্যতা আছে
এমন কোনো ফুল নেই পাতার
ঝলসানো প্রতিবিম্ব
এমন কোনো ইস্তাহার নেই

চকিতে বৃষ্টি
গাড়ির টায়ারে
টেলিগ্রাফের পোল্ জুড়ে
মিথ্যা মামলার বর্ণনায়
বৃষ্টি
এখন বিয়াত্রিচের লাশ
পড়ে আছে সর্বত্র বন্দরে
উপত্যকায়
নষ্ট লাশ নষ্ট বনভূমি

এমন কোনো ইস্তাহার নেই আমার
যাকে পূজা করা যায়
এমন কোনো ফুল নেই
যাকে ভালোবাসি।

মে ১৯৮২

শেষ প্রস্থের দিনগুলি

…যদি আনন্দের মধ্যে তোমরা অন্ধকার পাও
আমি প্রত্যেক ডাকবাক্সে লিখে দেব
ভালো আছি

টেলিফোনে বরফ জমলে
তোমার কথা মনে পড়বে
এখন নির্জনতা নেই উত্তম নেই
শুধু তোমার চুরমার হয়ে যাওয়া মুখ

...

হারানো সিন্দুকের চাবি
আমার কাছেই পাবে
নদীয়ার মাঠ নদী আকাশ আমার
মাটির ঘ্রাণ আমার

আমি কী আমাকে জানাও
মাটির মাতাল গন্ধে আর কর্পূরের বীভৎসতায়
বাঘের চামড়ার মত স্পষ্ট ভাষায়
আমাকে জানাও আমার স্বদেশ কোথায়

গাছের ছায়ায় বসে আছে ওরা কারা
পুতুল নয় দৈত্য নয়
মানুষের অবয়ব নিয়ে হত্যার জলকেলী হবে।

...

আর কি হবে শুকনো মুখে
বিষণ্ণতার গানটি শুনে
আর কি হবে ছায়ায় থেকে
আর কি হবে মায়ায় বলো
শোক ছেড়ে দাও শয্যা ছাড়ো
এবার পরো ধূসর মুকুট
আর কি হবে ছায়ায় বলো
মায়ায় তো আর মন ভরে না!

...

নিষ্ঠুর সুড়ঙ্গপথ বেয়ে যে এসেছিল
হন্তারক কৃষ্ণচূড়ার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিল
সমুদ্রের ঢেউএ
তারপর গল্পটা শেষ—কেননা
কারুর মনে নেই শুরু হয়েছিল
কবে এবং কোথায় কোন্
বনচ্ছায়া সজ্জিত রাতে

বড় ভুল হয়ে গেছে
ভেবে দেখিনি কোন্ দিকে
মুখপোড়া দেওয়ালগুলো
ডানা মেলে দেবে
ভুল হয়ে গেছে
বড় ভুল হয়ে গেছে
তোমায় দেখিনি যখন
খুব কাছে এসেছিলে

•••

কুটিল চোখ তাকিয়ে আছো অন্ধকারে
তোমার দ্বারে ভেঙে পড়ছে ময়ূরাক্ষী
ভেঙে পড়ছে শব্দকল্প পাইন অরণ্য
তোমার কাছে ঝর্না যাবে অন্ধকারে
তুমি কোথায় হারানো মুখ খুঁজে ফিরছো
তুমি কোথায় স্নায়ুর অসুখ গ'ড়ে নিচ্ছ
ময়ূরাক্ষী অন্ধকারে তোমার দ্বারে
ভেঙে পড়ছে তারার মত মেঘের মত

ধূর্ত বিষাদ এসেছে
সমুদ্র হাতে নিয়ে
অনেক শতাব্দীর শূন্যতা পেরিয়ে
যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে
ভিজে তোয়ালের মত আলিঙ্গনে
ভরিয়ে দেব তোমার আরণ্যক গহ্বরগুলি
কেননা ধূর্ত বিষাদ
এসেছে নানান হাওয়ায় হাওয়ায়

হারানো শব্দের মানে আমাকে
ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও
কৈশোরের ধৌত মুখ দিনগুলি
সবুজ পাতায় যখন মৃত্যুর আস্বাদ
ছিল না

...

কেউ কি মজার আত্মকেন্দ্র
খুঁড়ছে এখন চতুর্দিকে
কেউ কি এখন হাওয়ায় হাওয়ায়
এ-নগ্নতার ভ্রান্ত বিকার

মেঘ তো আছে অন্ধকারে
ধৌত কিরণ বাঘের মত
মেঘ তো আছে চতুর্দিকে
মেঘ তো আছে মজার মত

মাঝ সমুদ্র তীক্ষ্ণ নদী আছড়ে
পড়ছে, গানগুলি সব সোনার খাঁচায়
দুলছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে
রুদ্ধ দুয়ার গানগুলি সব
মাঝ সমুদ্র তীক্ষ্ণ নদী
অস্পষ্টতা বুঝিবা ভাসছে
কিশোরের পাপ কৈশোর নয়
হাঙরে গিলছে দোল পূর্ণিমা
মাঝ সমুদ্র তীক্ষ্ণ নদী

...

ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে কপালে পুঞ্জ পুঞ্জ মরুভূমি ট্রিগারে হাত রেখেছিলে বিষণ্ণতা বুল্‌স-আই ছিল মেয়েটির কি সুন্দর টিপ বিষণ্ণতা একরাশ ছায়ায় তুমি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করোনি তুমি অতীতের স্তম্ভ-গুলোকে ভারী ভারী হল্‌কা দিয়ে ঘিরে ফেলোনা কেন অনির্বাণ সঙ্গীতের মতন কাঙ্ক্ষিত মুখগুলি দেওয়ালির স্রাবোৎসব সব বুঝি পালিয়েছে বুকে হাত রেখে কথা ছিল বিষণ্ণতা কাজের সাথী না হ'লেও তুমি বন্ধু হবে এখন ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে কপালে তপ্ত বালির নিশানা ট্রিগারে সুন্দর আঙুলের সংশয় বুল্‌স-আই ঘিরে খেলা করছে অন্য সুখের অধিকারী গাঢ়তর মৃত্তিকার সংশয় তার মুখের বৈভব আমি ভুলিনি

যদিও তিন বছর হয়ে গেছে প্রথম দেখেছিলাম অমন সুন্দরতায় ঝলসে
উঠছে নির্জন আঙুল অন্য শব্দ অন্য ট্রিগার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
বিষণ্ণতা আর জনশ্রুতির মত তোমার সংশয় ছড়িয়ে আছে মরুভূমির
দুধারে উজ্জ্বল নদীর অপেক্ষায়।

...

বুনো চেরীর ছায়ায় দোলে
আকৈশোর ছদ্মমুখ
তোমাকে চাই ভীরু আশায়
ঠিকানাহীন হিশেবহীন
ঘড়ির মাপ যতই হোক
বঁড়শি গাঁথা দিনগুলোয়
বুনো চেরীর ছায়ায় দোলে
অনেক ভালোবাসার শোক।

...

এখন দূরে দূরে পড়ে আছে
তোমার আমার গতিমুখ
এখন দূরে দূরে প্রাচীরের
অনঙ্গ ধারায়
পড়ে আছে তোমার আমার মৃত্যুর
গতিমুখ দূরে দূরে পড়ে আছে

...

এই হাতে যন্ত্রণার হিম ছিল
শব্দের ডানায় ছিল
অনাহূত বস্ত্রের শোক
এই হাতে সমুদ্র ছিল

গাঢ়তর পাখিরাও ছিল
খড়কুটো লেগে ছিল
বন্ধুর রক্তের ভিতর
এই হাতে মুখ ছিল
চুম্বনের অঙ্গীকার ছিল

...

রাজদ্রোহের সাক্ষী
সেদিন ছিল না বাতায়নে
বাতায়নে ঝরা ফুল
রেখেছিলে কিংখাবের মত
কালো গ্যাবার্ডিন্ প্যাণ্ট
যদিও তোমাকে মানাবে না
ঘড়িতে নারীর মুখ
তোমাকেই ভুলতে পারিনি

...এখন মনে পড়ে তোমার মৃত্যুর
পল্লবিত মুখগুলো
এখন মনে পড়ে
ইমনের শান্ত ছায়ায়

মার্চ ১৯৮২

বিভাস ভৌমিক

তোমাকে বলবার জন্যে

তোমাকে বলবার মত কয়েকটা কথা
বিশেষ সময় লাগবে না
চলো।

আকাশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। জ্যামিতি। ত্রিভুজ।
ঘুরে যাচ্ছে অবাস্তব চাকা।
ভুতুড়ে ছায়া হেঁটে যাচ্ছে নরম শামুকে।
হুইসেলে দ্রুতগামী চাকা।
কারা জোরে হেসে উঠল
আলো জুড়ে পাক খাচ্ছে কথা,
জ্বলছে নিভছে চারপাশে আয়ু
ফেটে যাচ্ছে বাজি।
শব্দ পুড়ে পুড়ে ছাই,
ক্রমাগত ক্লান্ত চোয়াল, পেশী,
পুড়ে যাচ্ছে সব

দূরে কেউ ঘুরিয়ে দেয়
স্টিরিওর নব্

কোনদিকে যাবে!
পথ ঘাট বাড়ীগুলো ফণা নাড়ছে,
একটা পাথর তার অক্ষপথে ঘুরে চলেছে অলৌকিক বেগে,
রেস্তোরায় চারজন, কথা, মুখ, হাততালি।
কার হাতে দু পাঁচটা পয়সার চোখ—নতুন সেলুন
পড়ে থাকা চুল আর ক্রমাগত অজস্র গিরগিটি কালো কালো
ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে পিল্‌পিল্
নিয়মিত ল্যাম্পপোস্ট সার সার সন্ধেবেলা স্যালুট জানালে
তুমি ভাব "চলো যাই ঘুরে আসি এদিক সেদিক।"

প্রত্যেকটা চায়ের দোকান
ওঁৎ পেতে থাকে অকারণে।

কিছুটা সময় দরকার
গুছিয়ে বলবার জন্য কিছুটা সময়।

ফুটবল ছুটে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য রোবটের দিকে।
কলকারখানা বাড়ছে
রুটির লড়াই নিয়ে বক্তৃতা, দূরে প্লেন, ফেনা।
মুখ। হাততালি। উড়ন্ত রুমাল।
বাদামের নষ্ট খোসা ছেয়ে ফেলছে সমস্ত শহর।
পট করে ভেঙে ফেললে মুহূর্তগুলো দাপিয়ে বেড়ায়
তারপর চুপ।

পুড়ে যাচ্ছে সব।
দূরে কেউ ঘুরিয়ে দিল স্টিরিওর নব্।

আমি কি থমকে যাই! ভয়?
কার ভয়? কেন ভয়?
কিছুটা সময় দরকার
গুছিয়ে বলবার জন্যে কিছুটা সময়।
সব মুখ মুছে যাচ্ছে, শব্দমালা দেওয়ালের গায়ে
হামাগুড়ি দেয়। তুমি হেসে ওঠো,
অকারণে—
কিসের কৌতুক।
মুখ নেই সার সার ল্যাম্পপোস্ট সন্ধেবেলা হাত তুলে
স্যালুট জানালে
তুমি বলো "চলো যাই ঘুরে আসি এদিক সেদিক।"

শহরের প্রত্যেকটা মোড়, প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোস্ট, প্রত্যেকটা ধুলো
চারকোল, বুকের নিশ্বাসে জ্বলে উঠে নিভে যায়
দূরের হাসির শব্দ লাফ দিতে দিতে দিতে ডুবে যায়
প্রপাতের নীচে।
অনেক গভীর জলে কার হাত পাক খায়

কয়েকটা আঙুল নখ জানলা থেকে বড়ো বাড়ীর দেয়ালে
ওঠে নামে আঁচড়ায়—

কি যেন বলবার আছে
কি যেন বলবার ছিল।
ফোয়ারার জল, অনাবিল জলে পায়ের রেখা ফুটে ওঠে
তোমাকে কয়েকটা কথা। কয়েকটা মিনিট।
বিছুক্ষণ মোটে কিছুক্ষণ।
তোমার কাছে কয়েকটা মিনিট।

কারা হাসে একদল মেয়ে।
"ওলি গিয়ে বলে আয়"
শহরের প্রত্যেকটা মোড়, দোকান এবং গলি
আলো। মুখ। পরিচয়। পরিচিত ছায়া। উপচ্ছায়া।
ওলির কি বলবার আছে।
কার কাছে
কোন কথা
কোন স্তব্ধতা।

এইভাবে কথা হয় লোকজন আত্মীয় স্বজন।
মাঝে-সাঝে ত্যাখা সাক্ষাৎ। মাঝে মাঝে রাস্তায় পুরোন বন্ধুর সাথে
কিছুটা সময়
মাঝে মাঝে নেশা করে বুকের বোতাম খুলে কাশে। সাম্প্রতিক
মৃত্যুর দ্রুত অভিজ্ঞতা।
ট্রামে বাসে রাজনীতি
পোস্টার। ছাইদান। মূল্যবৃদ্ধি। বাজারের থলে।
ধর্মঘট লক আউট ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক কর্মসূচী।

মাঝে মাঝে চায়ের টেবিলে
আদিম কীটের মত বুক ভেঙে হেঁটে যাই চড়াই-উৎরাই
চাঁদ গলে পড়ে
মহাকাশে টিকটিকি পেড়ে যায় সময়ের ডিম।

তারও পর। তোমাকে বলবার জন্যে কয়েকটা কথা।

ভাঁড়টা রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দাও
তারপর শোন।
তুমি সাথে সাথে বলে ওঠো "অন্য কথা, অন্য কোনও কথা।"
তুমি কি জেনেছ কোনদিন ও বাড়ীর ছোট্টো পাপু বেড়ে উঠছে
হিংস্র দেয়ালে হাত রেখে।
তুমি কি জেনেছ কোনও দিন, কয়েকটা নম্বর নিয়ে তোলপাড় ঘটে যাচ্ছে
সেই বুড়ো দাদু রাত হলে ছেলেকে খুঁজতে বাইরে বেরুন।
ছেলে তার কবে কোনদিকে হেঁটে গেছে।
জানে কেউ ?
জানে না কেউই।

দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। রক্তপাত। অ্যাটম। ন্যাপাম।
দাঙ্গা। মন্বন্তর ! গঙ্গার চর ভাঙছে। ইরানে ফাঁসির লিষ্টি প্রতিদিন।
কসমেটিক্স্।

আসলে এসব কথা বলতে গেলে কখন সময়।
"তার চেয়ে চলো যাই এক কাপ চা"
পাপু বলে "তাঁত মামা টিপ্ দিয়ে যা।"

সারারাত জাহাজের ভোঁ বাজবে। খালাসীরা কথা বলবে আর
আরও কিছু কথা থাকবে তোমার। আমার।
কখন সময়।

আমার ঠাকুমা বেঁচে আছে। দ্যাশের বাড়ীর কথা। বন্যা যুদ্ধ রক্তপাত
এইসব ক্লান্ত বিড়বিড়।
কানে ইদানীং শুনতে পান না কিছু।
পুরোন ডোবার জলে শ্যাওলার সবুজ আস্তরণ
জেলে রাখে ছানি পড়া চোখ।

কলকাতার ফুটপাথে বেড়ে উঠছে বেওয়ারিশ শিশু

একদিন আমাদের যাওয়ার রাস্তায়
একজন যুবকের লাশ পড়ে ছিল। ছুরিকাহত পরিচয়হীন।

সমস্ত রাস্তার রেখা। যুবকের রক্তহীন শিরা।
সমস্ত শহর আর যুবকের থ্যাতলানো চোখ।

কেন এইসব মৃত্যু আসে। আলোয়। প্রান্তরে। ঘাসে।
কারা তাস খেলে পয়সা দিয়ে
আসর সাজিয়ে

কারা লাফ দেয় সুইমিং পুল থেকে অট্টহাসি পাথরে পাথরে।
বরফ পড়ার শব্দ।

রাস্তার মোড়ে থাকে কার লাশ।

একদিন পাপুও খেলতে থাকবে চাঁদ নিয়ে বলের মতন।
আমার বয়স বাড়ছে। তোমাকে বলবার মত কথা।
আমার চারপাশ ঘিরে কান্নাকাটি গেরস্থালি ক্ষুধা।
নখ এসে আঁচড়ে যায় আমার শরীর। স্নায়ু।
শুয়ে থাকি। জ্বলে ল্যাম্পপোস্ট। তোমাকে বলবার মত
কথা থাকে।

নরম সমুদ্র ছুঁয়ে আরও একদিন।
প্রপাতের খুব কাছে আমরা দুজন
বহুদূরে আর্তনাদ ভেসে আসে জল থেকে চাঁদে সূর্যে গ্রহে।

সময় কখন হবে। সময় কখন

পুনর্মুদ্রণ

মনোদা দেবী

১

আমার বয়স যখন কেবল মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে কিংবা হয় নাই ঠিক মনে পড়িতেছে না। মস্ত বড় বাড়ীখানাতে মস্ত বড় এক বিরাট ব্যাপারের সূচনার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই অবসরে সেই ছত্রিশখানা ঘর সংযুক্ত বাড়ীখানার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে হইল। বাড়ীখানা ছিল প্রচুর জমি লইয়া একটি বৃহৎ পাড়া বা হাটের মত। লোকজনও ছিল বহু। সুতরাং বাড়ীখানা যেমন মস্ত ছিল, তদনুযায়ী লোকজনের উপস্থিতির কোন ত্রুটি ছিল না। বাড়ীখানা বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন জনবহুল গৃহস্থদের প্রায়ই ঐরূপ থাকিত। বাড়ীর সর্ব্বপ্রথমেই বাড়ী-রক্ষক মুসলমান সর্দ্দারদের (এখন তাহা ভাবিতে বা বলিতে যেন মনে কত ব্যথা-বেদনায় হৃদয় ভরিয়া যায়।) তখন সেই মুসলমানদের

তত্ত্বাবধানে গৃহস্থেরা ধন, প্রাণ, এমন কি মান-সম্মানকে গচ্ছিত রাখিয়া নিরুদ্বেগে কর্মস্থলে বা জমিদারী রক্ষার্থে দূর-দূরান্তে নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সর্দ্দারগণও তাদের প্রভুর ধনসম্পদ ও মান-ইজ্জৎ রক্ষার জন্য দিবা-রাত্রি কায়-মনে-প্রাণে বিনিদ্র যামিনী কাটাইয়া তাদের সমস্ত জীবনকে প্রভুর পদে উৎসর্গ করিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিত। থাকিবার ও রান্না-খাওয়ার ঘর। তারপরে দূর-দূরান্তের অপরিচিত অতিথি অভ্যাগতদের থাকা ও রান্না খাওয়ার ঘর। তারপরে দুর্গামণ্ডপ ও বৈঠকখানা ইত্যাদি ঘর। তার পরের খণ্ডেই ঠাকুর, চাকর, মালী ইত্যাদি থাকিবার ঘর। এর পরেই গৃহদেবতা লক্ষ্মী, গোবিন্দ ও নারায়ণ, শালগ্রামের বাসগৃহ অর্থাৎ গোঁসাই-মণ্ডপ। তারপরই ভিতর বাড়ীর মস্ত বড় বড় আটচালা ও চৌচালা ঘর ইত্যাদি ও সর্ব্বশেষ খণ্ডে রান্না, খাওয়া ও জল পরিষ্কারের কলের ঘর অর্থাৎ ঐ ঘরে কাঠের ফ্রেমে-আঁটা থাক্-থাক্ করা উঁচু উঁচু মঞ্চের মত দাঁড়ান থাকিত এবং এক একটি থাকে বড় বড় হাঁড়ি ফুটা করিয়া রাখিয়া তাহাতে যথা-নিয়মে জল, কয়লা ও বালি রাখা হইত। বড় হইয়া জানিয়াছিলাম, ইহা না কি আমার ৺পিতার ব্যবস্থামত স্বাস্থ্যের জন্য করা হইয়াছিল। আমার ছোট পিতামহ ৺মুকুন্দচন্দ্র সেন (ডাক্তার) মহাশয়ও ইহাতে খুব উৎসাহিত হইয়া চীনামাটির প্রস্তুত দু'-তিনটি জল পরিষ্কারের জন্য ফিল্টার গ্রামের বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়া-ছিলেন। গ্রামে কোন কোন সময় পানীয় জল দূষিত হইয়া উঠিত। সে সময় পরিস্রুত জলের অতি আবশ্যকতা সকলেই অনুভব করিত। এর পরে আমাদের পুরানো বাড়ীতেও (মাখন সেনের বাড়ী) এই নিয়মে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কল-ঘরের এক দিকে দাসী-চাকরাণীদিগের থাকা ও শোয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া চাউলের ঘরটিকে অধিক করিয়া স্মরণের দু'-একটি বিশেষ কারণ ছিল। সে-ঘরটি কোলাহল হইতে নিজেকে একটু দূরে রাখিয়া বৌ-ঝিদের আড্ডা জমাইবার পক্ষে খুবই সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, কারণ, কাজ-কর্ম্মের পরে অথবা কাজ-কর্ম্মের মধ্যে বৌ-ঝিরা ঐ ঘরখানাতে নিরুদ্বেগে ঘোমটা খুলিয়া, গলা ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ করিয়া খুব খুসী হইত। বয়স যদিও আমার খুবই কম ছিল, কিন্তু ঐ স্বাধীনতার আনন্দটুকুর যেন অংশভাগিনী হইয়া যাইতাম। তার পরে চাউল তুলিতে মাঝে মাঝে কাঙ্গালা ভাই ঘরে যাইত, কোন কোন দিন মাটিতে পোঁতা বিরাট মট্‌কী হইতে চাউল উঠাইবার ব্যাঘাত হইয়া যাইত, অর্থাৎ চাউল কমিয়া গেলেই হাতে যখন আর চাউল তোলা যাইত না তখন আমাদের মত ছোটদের ঐ মট্‌কীর মধ্যে নামাইয়া দিয়া ছোট ছোট ডালা ভরিয়া চাউল তুলিয়া দিতে বলা হইত। আমরা ত' এই কাজের জন্য মহা আনন্দে কে কার আগে মট্‌কীর ভিতরে ঢুকিব তার দিশা পাইতাম না। ঐ ঘর ও তার স্মৃতিটুকু যেন কিছুতেই ভুল হইয়া যায় নাই।

মট্‌কীগুলি বৃহদাকার। এক একটি মট্‌কীতে বিশ হইতে পঁচিশ মণ পর্যন্ত ধান-চাউল রাখিবার ব্যবস্থা হইত। বহু বহু পরিবর্তনের মধ্যেও মট্‌কীগুলি তার অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ সেদিনও যেন শূন্যগর্ভাবস্থায় অতি দৈন্যতা লইয়াই দাঁড়াইয়াছিল।

এত বড় বাড়ীতে কোন দিকে কখন কি ঘটিত তাহা অনেকেই অনেক সময় খোঁজ-খবর রাখিত না বা পাইত না। এক দিন বাহির বাড়ীর খণ্ডে ছুটিয়া যাইতেই দেখিলাম, বৈঠকখানা ঘরের সামনে পাশের দিকে খুব লম্বা লম্বা মোটা থাম পুঁতিয়া তাহার উপরে ছোট একখানা ঘর তোলা হইয়াছে। আমি তো দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ঘরে উঠিবার সিঁড়িও দেওয়া আছে। আমি সামনে দেখিলাম ঠাকুর-কাকাকে ও কাঙ্গাইলা ভাইকে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ ঘর কার? কে থাকিবে?' দু'জনেই হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং আমাকে বলিল, 'তোমার দিদির বিয়া। ঐ টঙ্গ-ঘরে বাদ্যকার উঠিয়া যাইয়া বাদ্য বাজাইবে।' আমার বিশ্বাস হইল না। একেবারে ছুটিয়া মার কাছে যাইয়া সব বলিতেই তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ, কুড়ি দিন বাদেই তোমার দিদির বিয়া হবে।' আমি তো অবাক! বিয়া কি! এবং সে বস্তুটাই বা কেমন? তাই শুধু বারংবার মনের মধ্যে তোলপাড় হইতে লাগিল। টঙ্গ-ঘরকে তিনি নহবৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। আমিও ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরকাকা ও কাঙ্গাইলা ভাইকে বলিলাম, উহা টঙ্গ-ঘর নহে—মা বলিয়াছেন, "নব-নব হতি", যেই বলা, উহারা খুব হাসিয়া উঠিয়া আমাকে বলিল, 'উহা নগদখানা।'

বাস্—কোনটাই আমার বলিবার যোগ্য ভাষা হইল না। শেষে আমি টঙ্গ-ঘরটাই সহজ সরল মনে করিয়া লইয়াছিলাম। কোন এক শুভ দিনে ঐ ঘরে বাদ্যযন্ত্র সহকারে কয় জন লোক পিঁড়ি দিয়া সেই টঙ্গ-ঘরের মধ্যে যাইয়া নাগাড়া, টিকাড়া ইত্যাদি বাজাইতে সুরু করিতেই পাড়ার বহু বহু ছোটর দল আসিয়া হাততালি দিয়া নাচিয়া বাড়ীখানাকে মুখরিত করিল। বল্য বাহুল্য, সে আনন্দ ও নৃত্যের মধ্যে আমাদের বাড়ীর ছোটর দলটিও সেই হাততালি ও নাচের আসরকে পরিপুষ্ট করিতে ত্রুটি করে নাই। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় বাদ্য-কাররা ঐ টঙ্গ-ঘরে বাজনা বাজাইয়া বিবাহের বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া যাইতে লাগিল। এক সময় মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! এমন ভাল বড় সুন্দর বাদ্যকারের ঘর থাকিতে ঐ ছোট্ট টঙ্গ-ঘরে কেন উহারা উঁচুতে উঠিয়া বাদ্য বাজায়?' মা বলিলেন, 'ঐ উঁচু ঘর হইতে বাজনা বাজাইলে বহুদূর হইতে লোকেরা জানিতে পারিবে তোমার দিদির বিয়া। দেখিবে কত লোকজন আসিবে, হৈ-হল্লা কত হইবে ইত্যাদি।' বুঝিলাম এই সবই দিদির বিয়ার জন্য, কিন্তু বিয়াটা কি তাহাই কেবল মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল।

দিন দিনই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে কেবল হৈ-হল্লা করিয়াই আমাদের

ছোটদের দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। দিন দিনই দলে দলে লোক-জন —ছোট-বড়-বৃদ্ধা সকলেই হৃষ্ট চিত্তে আসিয়া উঠানে জড় হইতে লাগিল। দিদিমার আদেশে চাকর ও দাসীগণ উঠান জুড়িয়া হোগলা বিছাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, এই সব লোকজন নিম্নশ্রেণীর—বর্তমানে মহাত্মাজীর হরিজন। সকলকে যত্ন করিয়া বসিতে বলিয়া পান, তেল, সিন্দুর ও দু'হাত ভরিয়া বাতাসা বিতরণ করা হইত। বিবাহের বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই এই আনন্দ ব্যবস্থার বরাদ্দ হইয়াছিল; দিদিমা উঠানে নামিয়া হাসিয়া সকলকে বলিতেন, 'আশীর্ব্বাদ করিবা যেন এই শুভবিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হয় এবং সর্ব্বমঙ্গল হয়,' ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন দলের বউ ও মেয়েরা নিজ হইতে নাচিয়া গান গাহিবার নিমন্ত্রণ লইয়া যাইত এবং যে কোন দিন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া গান করিবার জন্য দাঁড়াইয়া যাইত। বাড়ীর সবাই ও দিদিমা তাহাদের অতি সমাদরে বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও তাদের পান ও সিন্দূরের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিতেন। গানের শেষে বাড়ী যাওয়ার সময় দু'হাত ভরিয়া বাতাসা পরিবেশন করা হইত। গানের সুরটা এখনও যেন কানে লাগিয়া রহিয়াছে। অতি চিৎকার, তবে মাঝে মাঝে শ্রুতিমধুরও ছিল না তাহা বলা চলে না। এর মধ্যে একটি খুব মজার বিষয় ছিল এই যে, প্রতি দুই জন করিয়া জোড় বাঁধা থাকিত, প্রথম এক জোড় গাহিয়া যাইত পরে অপর ফের গান ধরিত। এক হাত লম্বা ঘোম্‌টার মধ্য হইতে নানা কাহিনীযুক্ত গান গাহিত। গানের জুড়ী দুইটি, কিন্তু তাদের সুদীর্ঘ ঘোমটা দু'টিকেও মুখামুখি করিয়া জুড়িয়া লইয়া গান করিত; কিছুতেই তাহাদের মুখ দেখা যাইত না। গানের সুর তাদের গ্রামান্তরে যত কেন চলিয়া যাউক না— কিন্তু তাদের তেল, সিন্দূরলিপ্ত মুখগুলি সকলের অদৃশ্যেই থাকিয়া যাইত! আমরা ছোটরাও সকল বিষয়েই অতি উৎসাহী। সুতরাং গায়িকাদের মুখ না দেখিতে পাইলে গান শুনিতে ভালোই লাগিত না। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া গায়িকাদের মুখ দেখার চেষ্টা করিয়া হয়রান হইয়া যাইতাম। হঠাৎ কোন কোন সময়ে বিদ্যুতের মত ক্ষণকালের জন্য আমাদের সুযোগ-সুবিধাও হইয়া যাইত, অর্থাৎ তেষ্টার সময় জল ও মৌতাতের সময় পান খাওয়ার উপলক্ষ্যে। গানের অর্থ কিছুই বোধগম্য হইত না, তবে কি না রাম ও সীতার বিবাহের কথাই যেন গানের পদাবলী ছিল মনে পড়ে। আমাদের ছোটদেরও গান শুনিবার তেমন আকর্ষণ কিছুই ছিল না, তবে একটা কিছু অজুহাত পাইলেই হইল, হৈ-হল্লার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারিলেই মহা আনন্দ!

এই ভাবে অতি দ্রুত গতিতে যেন দিদির বিয়ার দিন আসিয়া পড়িতে লাগিল। কত গ্রাম, শহর ও কত দূর-দূরান্তর হইতে কত লোক-জন, ছোটর দল আসিয়া অত বড় বাড়ীখানা ও অতগুলি ঘর সবই যেন পূর্ণ করিয়া দিল। নিত্য নূতন খেলার সাথী—খেলিয়া খেলিয়া যেন কূল পাইতেছি না। বহু দিনের কথা,

অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। বহু বিচিত্র ঘটনাগুলি যেন মনের দুয়ারে উঁকি দিতেছে সন্দেহ নাই। তবে তন্মধ্যে দিদির বিবাহ ব্যাপারটিই যে খুব মধুময় আনন্দের উজ্জ্বল চিত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিবাহ যে কি, তাহা ত' জানি না, বুঝি না কিছুই। এর আগে পুতুলের বিবাহ দিয়াছি বহু বার, জামাই-বৌর আদান-প্রদান সমবয়সীদের মধ্যে বহু বার হইয়াছে। আবদার করিয়া মার নিকট হইতে ভাল ভাল খাবারও বরযাত্রীদের জন্য সংগ্রহ করিয়া আতিথ্য ও সম্বর্ধনার অভিনয়ও বেশ ভালো ভাবেই করিয়াছি। সত্য সত্য খাবার—লুচি, মণ্ডা ও সরভাজারও কোন অপ্রতুল ছিল না মার কৃপায়। মাতা ঠাকুরাণী আমার এ সকল আবদারই খুব সন্তুষ্ট চিত্তে প্রতিপালন করিয়া যাইতেন। ভাবিতাম, এইরূপই একটা খুব বড় রকমের বিবাহের খেলা হইবে; খুব লোকজন বাদ্য-বাজনা ও খুব ভালো ভালো খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি। রাস্তা দিয়া লোকজন চলিয়া যাইতে যাইতে বলাবলি করিতেছিল 'ঐ নগদখানা উঠিয়াছে—ডেপুটি বাবুর নাতনীর বিয়া।' কেহ কেহ বলিয়া চলিল, 'আনন্দবিশারদের নাতনীর বিয়া।' দিদির বিবাহ যেন গ্রাম ছাড়াইয়া বহু দূর গ্রামে ও বন্দরে গিয়াও হাজির হইয়া গেল। বন্দর হইতে কত দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল। সবই দেখিয়া দেখিয়া যেন কূল পাইতেছিলাম না। তবুও মনে হইতেছিল, আমার পুতুল বিয়ার মতই একটা খুব বড় বিয়া।

তখনকার দিনের কথা মনে হইলে কি যে অদ্ভুত পট পরিবর্ত্তন দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে! সামান্য তেল, সিন্দুর, পান ও হাতভরা বাতাসা দিয়া কি সুন্দর সহজ সরল আনন্দের আস্বাদন লাভ করা—যাহা এখনকার লোকেরা ভাবিতেই পারে না। ভাবে এ কী অসভ্যতা! যাক সে কথা। দেখিতে দেখিতে দিদির বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। টঙ্গ-ঘরের বাজনাও খুব বাড়িয়া চলিল। এখনও মনে পড়ে সেই তেল, সিন্দুর, পান, বাতাসার গ্রহীতা ও দাতার সমান সরলতার কি স্নিগ্ধ মধুর প্রতিমূর্ত্তি! কালের স্রোতে সেই সহজ-সরল আনন্দের নৈবেদ্য বিতরণ ও সেই সহজ আনন্দ, ঘোর জটিলতাময় বহু অর্থব্যয়ের সাপেক্ষ রূপ ধরিয়া মানব-জীবনে বহু দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে আমোদ-আনন্দ করিতে গেলেই ঘরে সাজ-সজ্জা ও নানা কারণে বহু অর্থব্যয় জনিত দুশ্চিন্তায় আনন্দ উৎসাহ মনে ঠাঁই পাইতে পারে না।

দিদির বিবাহের দিন ক্রমেই নিকট হইয়া পড়িল, বাড়ীর লোকজন যেন এক মুহূর্তের জন্যও অবসর পাইতেছিল না। আমরা ছোটরা কেবল অন্দর ও বাহির-বাড়ীতে ছুটাছুটি করিয়া, হৈ-চৈ করিয়া বাড়ীখানাকে একখানা মস্ত বড় হাটের সামিল করিয়া তুলিলাম। মস্ত বড় মস্ত কারুকার্য্যময় বিরাট সামিয়ানা টাঙ্গান হইল। অপর খণ্ডে খণ্ডেও আবশ্যক বোধে ছোট, মাঝারী রং-বেরংএর সামিয়ানা টাঙ্গান হইতে লাগিল। আমাদের তো সবটাতেই মহা আনন্দ! নাওয়া-খাওয়াও

যেন ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। কাঙ্গাইলা ভাই ও ঠাকুরকাকা প্রভৃতি মাঝে মাঝে খুব বকাবকি করিয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত রান্নাঘরে। তখন বাধ্য হইয়া কোন প্রকারে খাওয়ার পর্ব্ব শেষ করিয়া ফেলিতাম ও মুখ ধুইয়াই আবার সেই হৈ-হল্লার মধ্যে ডুবিয়া যাইতাম।

যথাসময়ে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বিবাহের আসর ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদিতে অপরূপ শ্রী ধারণ করিল, রাত্রিতে দিদির বিবাহ হইবে। বিবাহের স্থানে আলো দিয়া দিনের মত অলোকিত করিল। রাস্তা-ঘাট ও সকল খণ্ডে মশাল জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। কাহারও চলা-ফিরার কোনই যেন অসুবিধা না হয়। এই ভাবে সকল অলোকসজ্জার বন্দোবস্ত হইয়া রহিল। বহু বাজনার আমদানী হইল। কোন আনন্দ ফেলিয়া কোন আনন্দে যে ছোট আমরা যোগ দিব, তাহার যেন কোন ঠিক-ঠিকানা পাইতেছিলাম না। এদিকে 'জামাই আসিয়াছে', 'জামাই আসিয়াছে' মহা কলরব উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানা একেবারে যেন কি অপরূপ হইয়া গেল! জামাই তাদের আত্মীয় বাড়ীতে উঠিয়াছে। বিবাহের শুভ লগ্নে আসিয়া দাঁড়াইবে ঐ সুসজ্জিত আসর-খানাতে সামিয়ানার নীচে। এই কয় দিনেই নবাগত ছোটদের হইতে বিবাহ কি, সে জিনিসটার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম। সারা দিনের আনন্দ-উল্লাসের পরিশ্রমে একটু রাত হইতেই কখন যে আমি অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলাম, তাহা জানিতেই পারিলাম না। দুই দিকের কত বাজী-বাজনা হুলুধ্বনি হইয়া দিদির বিবাহ হইয়া গেল, আমি কিছুই টের পাইলাম না। গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াই রহিলাম। সকালে ঘুম হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়াই আমার মনে পড়িয়া গেল "দিদির না বিয়া"! কেন যে এমনটি হইয়া গেল, তাহা একটু বড় হইয়া চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলাম। বিবাহের লগ্ন ছিল বোধ হয় গভীর রাত্রে —তখন ঘুমের মানুষটি আমাকে অধিকার করিয়াছিল। তুলিলে একটি বড় রকমের অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। মা কর্ম্মে ব্যস্ত, হয়ত বায়না ধরিব মার কাছে শুইবার জন্য।

সে যাহা হউক, কেহ কেহ আমার এই দুঃখের জন্য দুঃখও করিয়াছিল। এক মাস পূর্ব্ব হইতে যে বিবাহ দেখার জন্য নাচানাচি করিয়া দিন কাটাইলাম, সে বিবাহ মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আমার দেখা হইল না! সকাল বেলা তাড়াতাড়ি দিদির খোঁজে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলাম, মস্ত বড় ঘরখানাতে অনেক লোক ভীড় করিয়া রহিয়াছে। আমিও সে ঘরে ভীড় ঠেলিয়া ঢুকিয়াই দেখিতে পাইলাম, একখানা নূতন তোষক-লেপ-বালিশের বিছানার এক পাশে দিদি লাল টুকটুকে কাপড় পরিয়া সেই গান গাহিবার দলের বৌদের মত মস্ত বড় এক হাত লম্বা একটি ঘোমটা দিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি আর তখন এ-দিক ও-দিক কিছুই না দেখিয়া সটান আমার একরাশ চুল সমেত মাথাটাকে দিদির ঘোমটার মধ্যে

প্রবেশ করাইয়া দিয়া চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "দিদি, দিদি! তোর না লো বিয়া!"

সেনজী তের বৎসরের বালক; বরশয্যায় শুইয়া ছিলেন। তিনি হী-হী করিয়া হাসিতেই সে ঘরের উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল। আমি ত' লজ্জা পাইয়া সেখান হইতে একেবারে দে ছুট—পড়ি বা মরি জ্ঞান ছিল না। যাক, সে হাসাহাসির পরে বাকী বিবাহের ঘটা দেখিলাম। দুই দিককার নানারূপ বাজনার চমৎকারে সবাই মুগ্ধ, আমাদের ন্যায় ছোটদের তো কথাই নাই। তার মধ্যে বরপক্ষের একটি বাদ্যযন্ত্রের কথা বিশেষ করিয়া আজও যেন মনে রহিয়া গিয়াছে। বাদ্যযন্ত্রটি পিতলের বলয়াকার, অভ্যন্তরে বাদকের সমস্ত শরীর ঢুকাইয়া দিয়া মাত্র একটি সরু নল ওষ্ঠাধরে লাগাইয়া বাজাইতে ছিল এবং তার স্বর অতি অদ্ভুত মনে হইতেছিল। ঐরূপ বাদ্যযন্ত্র আর এই সুদীর্ঘ জীবনে দ্বিতীয় বার দেখি নাই এবং উহার নামও জানি না। শুধু আমরা ছোটরাই যে এই বাদ্যযন্ত্রের রূপ ও গুণে আনন্দে হৈ-চৈ করিয়াছিলাম, তাহা নহে, বাড়ীর উপস্থিত শত শত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই বাদ পড়িল না।

এদিকে এই বাদ্যযন্ত্রের নূতনত্বের সংবাদ দূর দূর গ্রামেও যাইয়া পৌঁছিল। যে পারিল ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া খুব হাসাহাসি করিয়া চলিল। এর পরে ক্রমে আসিয়া পড়িল কন্যা লইয়া বরের দেশে যাত্রাভিনয়। সেও একটি দৃশ্য বটে! দেখিলাম দিদিমা (ঠাকুরমা), ঠাকুর খুড়া (উমেশচন্দ্র সেন) প্রভৃতি দিদিকে ঘেরিয়া কোলে লইয়া বসিয়া খুব কান্নাকাটি করিতেছেন। বাড়ীর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন তো আছেনই, দর্শক হিসাবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই যেন সেই কান্নাতে যোগ দিতে লাগিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়াছিলাম মনে পড়ে, কিন্তু এত আনন্দ দৌড়ঝাঁপের মধ্যে এই কান্নাটাকে যেন তেমন ভাবে অনুভব করিয়া লইতে পারিতেছিলাম না। বড় হইয়া পরে এই কান্নার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। এত যত্নে আদরে প্রতিপালিতা মেয়েকে জন্মের মত নিজ স্বত্ব-স্বামিত্ব ত্যাগ করিয়া পরের হাতে তুলিয়া দিতে তাঁদের বুকফাটা কান্না সহজেই আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া আমরা দুই বোন ছিলাম পিতৃহীনা—তখন সে কথাটাও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়া নদীটি যাইয়া সাগরে পতিত হওয়ার রূপ পরিগ্রহ করিল। দিদির বয়স অল্প ছিল, মাত্র এগারো বৎসর। (অবশ্য সেকালে আট-নয় বৎসরে গৌরীদানই প্রশস্ত ছিল)। এই সময়ের একটি কথা শুধু মনে পড়িতেছে। ঠাকুরমা মাকে খুব বকাবকি করিতেছিলেন অর্থাৎ মেয়েটা চলিয়া যাইতেছে তবু তার এখনও কেবল কাজই বেশী হইল! ইত্যাদি।

মা তাড়াতাড়ি আসিলেন। তাঁহারও চোখের জলের অভাব ছিল না, তবে সে যে বাড়ীর 'বড় বৌ'—সকল দায়িত্ব বর্ত্তব্য যে তার মাথার উপরে! তাই যখন তখন তার ছুটিয়া আসা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। ঠাকুরমা সবই বুঝিতেন,

কিন্তু বুঝিয়াও মেয়েটার উপর নিষ্ঠুর মনে করিয়া মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পূর্ণানন্দের মধ্যে অবারিত চোখের জলের ভিতর দিয়া নব-দম্পতীকে ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট সুখ-দুঃখের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন সবাই। বিরাট বজরা বিরাট শোভাযাত্রার সঙ্গে বর-কন্যা লইয়া ময়ূরপংখী নায়ের ন্যায় চলিল তার গন্তব্য পথে। কে জানিত, দিদির সোহাগধূলা মাপিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যবিধাতা তাদের ভবিষ্যতের জন্য কি মর্ম্মান্তিক ব্যবস্থারই বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তারপরে ভ্রাতৃস্নেহের উন্মেষ ও মমত্ববুদ্ধির সূচনা। আমার সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। একদিন দেখি, মহা হৈ-হল্লা চলিয়াছে। ছুটাছুটি করিয়া সবাই যেন কি এক মজা দেখিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। আমিও কিছুই না বুঝিয়াই উহাদের সঙ্গ লইয়া ছুটিয়া চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে সবাই আমাকে বলিয়া চলিল, "তোমার একটি ভাই হইয়াছে। বড় হইয়া তোমাকে দিদি বলিয়া ডাকিবে।" আমিও জনতার মধ্যে অগ্রগামী হইয়া ছুটিয়া চলিলাম। দেখিলাম একটি ঘরের দুয়ারে ভীড় করিয়া সবাই কি দেখিতেছে। আমিও ভীড় ঠেলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে গেলাম। দেখি, মার কোলে একটি ছোট মানুষ, তাকে সবাই বলিতেছিল আমার ভাই। কি সুন্দর কোঁকড়ান চুল, নিটোল নবনীতুল্য ক্ষুদ্র দেহখানা অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। বিস্ময়ে আমি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। অপরূপ শিশুটি হাত-পা নাড়িয়া ওঁয়া-ওঁয়া শব্দ করিতেছিল। ক্রমে দেখার ভীড় কমিয়া আসিতে লাগিল। পরে জানিলাম 'ওঁয়া' শব্দই নাকি শিশুর কান্না। আমি কিন্তু শিশুর ঘরের দরজা হইতে একটুও নড়িলাম না। কেবল অপূর্ব্ব শিশুমূর্ত্তি দেখিয়া কি আনন্দে ভরপুর হইয়া গেলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এই তো আমার ভাই। বড় হইয়া দিদি ডাকিবে আমাকে। কে যেন মনের মধ্যে বলিয়া দিল, এই আমার ভাই। এমন অপরূপ আনন্দময় রূপ তো আর দেখি নাই! ঘরের দুয়ারে আমি অপলক দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মা ভাবিলেন, মার কোলে শিশুটিকে দেখিয়া বুঝি বা আমার মনে কোনো ভাবান্তর হইয়া থাকিবে। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "এই তোমার ভাই, বড় হইয়া তোমাকে দিদি ডাকিবে।" ভাইটি ছিল আমার খুড়াত ভাই (পরে নামকরণে ধীরেনচন্দ্র সেন)। মার কোলে ভাইটিকে দেখিয়া আমার কিন্তু মনে কোনো ক্ষোভের কারণ হয় নাই। মার কাছ ছাড়া আমি ত' কোনদিন কারো কাছে রাত্রিতে শুইতাম না, সে কথা সবাই জানিত। মার মনে কিন্তু সেই একটা মস্ত বড় ভাবনা হইল। আমি হয়ত মার কাছে শুইবার জন্য কান্নাকাটি করিব। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "আমি ভাইকে কোলে নিব।" আমার এ কথা শুনিয়া সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এই সদ্যোজাত শিশুকে কি অন্যের কোলে দেওয়া সম্ভবপর? তবে মা

একটা কথা চিন্তা করিয়া স্বীকৃতা হইলেন। কারণ এই সদ্যোজাত শিশু ও প্রসূতিকে অন্য কোন লোকজনের জিম্মায় রাখা চলে না। মাকে উহাদের লইয়া থাকিতেই হইবে সবাই সে কথা জানিত। মা একটু বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলেন, "তোমার কোলে ভাইকে দিব। কিন্তু তুমি যদি আমার একটা কথা রাখ।"

আমি তো কথাটির গুরুত্ব ইত্যাদি কিছুই চিন্তা বা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলাম, "তোমার কথা শুনিব।" মা বলিলেন, "তুমি আমার কাছে শুইতে পারিবে না—আমি ভাইকে তোমার কোলে নিশ্চয়ই দিব।" আমি ত' তখনই স্বীকার হইয়া গেলাম। কেবল মা বুঝিলেন, ভাই কোলে নেওয়ার লোভে আমি কত বড় মস্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়া বসিলাম। মার কাছ ছাড়া শোওয়া এই যে তোমার প্রথম দিন। "না আমি তোমার কাছে আর শুইব না ও তোমার জন্য কাঁদিব না।" এই কঠোর সর্ত্তে মা আমাকে আঁতুড় ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন ও ভাল ভাবে বসাইয়া দিয়া ভাইটিকে আমার কোলে নিজ হাতে ধরিয়া রাখিলেন। কি যে আনন্দ! এই ত ভ্রাতৃস্নেহের প্রথম উন্মেষ। ভাবিতে লাগিলাম ভাইটি ত' বড় হইয়া আমাকে দিদি ডাকিবে। ভ্রাতৃস্নেহে সেদিন আমার ক্ষুদ্র হৃদয় হইলেও যেন সে এক অপূর্ব্ব স্নেহের রসে আপ্লুত হইয়া গেল! ভাইয়ের মধুর স্পর্শ-সুখ আজও মনে হইলে যেন নাচিয়া উঠে সমস্ত হৃদয়খানা। কিছুক্ষণ পরেই আমাকে আঁতুড় ঘর হইতে বাহিরে আসিতে হইল এবং ভালো রূপে স্নানাদি করাইয়া শুচিতার সহিত আমাকে ঘরে লইয়া গেল সবাই। আমি তখন ভ্রাতৃস্নেহ মমতায়, অন্য চিন্তা আমার কিছুই নাই। কেবল ভাইটির অপরূপ ছবি ও অপরূপ স্পর্শানুভবে যেন ডুবিয়া রহিলাম। বিছানায় শোয়াইয়া দিল সবাই অনেক কথা বলিয়া কহিয়া, অর্থাৎ ভাইটি যে আমারই ভাই সে মমত্বজ্ঞানটুকুকে অতি বড় করিয়া ধরিয়া দিল আমার চক্ষুর সামনে মনের দুয়ারে। ভ্রাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব আবেশে ও ভ্রাতৃমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু হায়! ইত্যবসরে বিধাতা পুরুষের চিত্রগুপ্ত তার পাকাখাতায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মসী টানিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন, ভাই-বোন দুটিকে চিরজন্মের মত 'শোকাতুর' পর্য্যায়ে !!

২

এদিকে সেই কান্নাকাটির পরে দিদি শ্বশুরবাড়ী হইতে (অর্থাৎ কুড়াশী গ্রামের রাজপুত্রবধূরূপে) আসিলেন সোনারঙ্গে। সঙ্গে লোক-জন, চাকর-দাস-দাসীতে পরিপূর্ণ একখানা গ্রীনবোটে করিয়া। আমাদের এ বাড়ী হইতেও সঙ্গে ধাই-পিসিকে দিদির সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। ধাই-পিসি ছিলেন আমাদের অতি

স্নেহশীলা। তিনি না কি আমার বাবাকে বিবাহ করাইয়া বৌ লইয়া আসিয়াছিলেন, তার পরে দিদির সঙ্গেও অনেক দিন কাটাইয়া আসিয়াছিলেন। তার পর আমার বিবাহের সময়ও আমার সঙ্গে ছিলেন ও তার পরে আশার সঙ্গেও তার শ্বশুরবাড়ীতে যান। ধাই-পিসি ছিলেন আমাদের স্নেহময়ী পিসিমাই বটে। ধাই-পিসি আসিয়া দিদির বাড়ীর অনেক ২ কথা বলিতে লাগিল। দিদিমা হাসিতে ২ সবই শুনিয়া যাইতেছিলেন। তার মধ্যে একটি মজার কথা ছিল এই যে, দিদির বাড়ীর দাসীটিকে সবাই সেখানে খুব ক্ষেপাইত। বেচারা ভাবিল, যাক্ ছেলের শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে—এখানে আর কেহই ক্ষেপাইয়া ছড়া বলিবে না। কিন্তু এদিকে ধাই-পিসি রগড় করিয়া সেই ক্ষেপানোর মন্ত্রটি আমাদের বলিয়া ফেলিল। আর কি উপায় আছে, যত ছোটর দল দিদির বাড়ীর দাসীটির পিছনে লাগিয়া গেল। দাসীটির নাম ছিল 'আরাধনী'—"আরাধনী বারা বান্ধে ঢেঁকি উঠে না, তেল সিন্দুর পইরা রইল জামাই আসে না।" হায়! হায়! কি অঘটনটাই না হইল! কৃত্রিম কোপের সহিত দিদিমা লাঠি হাতে ছোটর দলের পিছনে ২ ছুটিলেন, কিন্তু দুষ্টের দলকে দমন করা দিদিমার অসাধ্য ছিল।

তখনকার দিনে পদ্মানদীর দক্ষিণ ও উত্তর পাড়ের লোকজনদের আচার-ব্যবহারে অনেকটা পার্থক্য ছিল। দক্ষিণ পাড়ের বিশেষতঃ রাজবংশের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা একটু বেশী ২ সেকালের ভাবাপন্ন ছিল। উত্তর পাড়ের লোকেরা তাহাপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া দু'পুরুষের ডেপুটী-বাড়ী আমাদের তখনকার দিনেও নানা বিষয়েই চক্ষুষ্মান্ হইয়া গিয়াছিল। তাই দিদির সঙ্গে রাজবাড়ীতে যাইয়াও ঠিক এ' বাড়ীর মত অনেক কিছুই অন্য রূপ দেখিতে পাইয়া ধাই-পিসি যেন একটু মনমরা হইয়া গিয়াছিল। দিদিমা কিন্তু সে সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি জানিতেন এই উত্তরপাড়ের ও প্রায় সকল গ্রামেই আমাদের মত এত-শত ফিটফাট থাকিত না। যাক্, যথাসময়ে মানে সম্মানে রাজবাড়ীর নৌকাখানিকে যথাযোগ্য ইনাম বকসীস্ প্রদানান্তে বিদায় দেওয়া হইল; এত দিনে দিদি যেন হাঁফ ছাড়িয়া মাথার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বাঁচিলেন। একদিন রাত্রে পান খাইতে উঠিয়া দিদিমা ফোঁপাইয়া ২ কাঁদিতে ২ দাদামহাশয়কে বলিতে লাগিলেন, "রাজবাড়ীর কর্ত্তারা ঠারাইনদের খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে ও দাসীকে লইয়া খাটে শোয়"—ইত্যাদি। তখন অল্প বয়স, একথার কি যে অর্থ বুঝিলাম না, পরে বড় হইয়া বুঝিয়াছিলাম। দাদা-মহাশয় তখনই বলিয়া উঠিলেন, "তোমার ভয় নাই। ছেলের বয়স অল্প, বুদ্ধিমান ছেলে, উহাকে আমি নিজের কাছে রাখিয়া মানুষ করিব।" কাজেও কিন্তু তাহাই হইল। ১৩ বৎসরের ছেলেকে তিনি সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া B. L. পাশ করাইয়া ঢাকাতে জজকোর্টে বসাইয়া দিয়াছিলেন।

এদিকে দাদামহাশয়ের ছুটি ফুরাইয়া গেল। তাঁহার কর্ম্মস্থান বরিশালে যাইতে

হইবে। দাদামহাশয়ের মাসিক ভাড়ার মফঃস্বলে যাওয়ার গ্রীনবোটখানা আসিয়া হাজির হইল। সেও যেন এক মহা আনন্দের মহা সমারোহ! বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ায় দুঃখটা যেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, নিকটতম আত্মীয়স্বজন এবং ঠাকুর চাকর সবাই তো সঙ্গেই যাইতেছে। বোটের মধ্যেও হৈ-হল্লা বেশ চলিতে লাগিল। দিদিও সঙ্গে আছেন। নৌকাখানা ছিল এক বিরাট বপু একটি মস্ত পরিবারের থাকা-খাওয়া ইত্যাদির কিছুই অসুবিধা ছিল না। বিশেষ করিয়া আমাদের মত ছোটরা তো সিঁড়ী দিয়া নৌকার ছাদে উঠিয়া খুব মজা করিতাম যখন তখন। বলা বাহুল্য, নৌকার ছাদখানা রেলিং-ঘেরা ছিল— ছোটদের পড়িয়া যাওয়ার ভয় ছিল না। তদুপরি চাকরদের সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত সর্ব্বদা। তখনকার দিনে নৌকাপথে না কি ডাকাতের ভয় ছিল কিন্তু শোনা যায় তারা হাকিমদের নৌকার ধারেও আসিত না। যে সব স্থান ভয়ের বলিয়া চিহ্নিত ছিল, সেস্থানে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই নৌকা হইতে সজোরে টিকারা বাজান হইত। ইহাতেই নাকি ডাকাতরা খুব সাবধান হইয়া যাইত। বিশেষ করিয়া রাত্রিতেই বেশী করিয়া টিকারার বাজনা চলিতে থাকিত। ডাকাতরা কি করে, তাহারা মানুষ না অন্য কিছু তাহাই তখন ধারণায় ছিল না। সুতরাং তেমন করিয়া মনের মধ্যে কোন ভয়ও হইত না।

দিনের বেলায় নদীর ঢেউ জেলেদের মাছধরা নদীর ঢেউর সঙ্গে সঙ্গে শুশুক জন্তুর উঠানামা যেন একটা দেখিবার জিনিস ছিল। যখন দরকার হইত নৌকাখানা জেলেদের নৌকার কাছে লইয়া যাইত এবং যত ইচ্ছা ও দরকার বড় বড় ইলিশমাছগুলি কিনিয়া লইত। আমার জীবনে সেই প্রথম পদ্মা নদীতে মাছ ধরা দেখিলাম। মাছগুলি যেন ঝুপ-ঝাপ করিয়া জেলেদের নৌকার মধ্যে কপাল কুটিয়া আছাড় খাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। সকলেই তো মহানন্দে মাতিয়া বড় ও ভালো ভালো মাছ বাছিয়া লইতে লাগিল—ঠাকুর-চাকর ও বাবুরা সবাই। কিন্তু আমার মনে যেন ঐ মাছগুলির জন্য খুবই কষ্ট হইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া কে যেন বলিয়াছিল, উহারা আবার মানুষ হইবে ও আমরা মাছ হইয়া জলে থাকিব এবং উহারাই আবার এমন করিয়া আমাদের ধরিয়া মারিয়া খাইবে। কথাটা যেন মনের মধ্যে একটা গভীর দাগ কাটিয়াছিল। ভাবিলাম, তবে তো আমাদের মাছ খাওয়া কিছুতেই উচিত নহে, মাছ খাওয়া খুব অন্যায় ও পাপ। চাকর-ঠাকুররা মহা আনন্দে মাছগুলিকে কাটিয়া-কুটিয়া সুস্বাদু করিয়া রান্না করিয়া রাখিল। ইত্যবসরে আমি ঐ মাছের কথা চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সেদিন আর [illegible]াইলা ভাইর আমাকে সে মাছ খাওয়ানোর আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। কিছুতেই আমি মাছ খাইলাম না।

লোকলস্কর সহ বিরাট গ্রীনবোটখানা ২।৩ দিন পরে যথাস্থান বরিশালে আসিয়া নোঙর গাড়িল। একটা হৈ-হৈ রব পড়িয়া গেল, হাকিম বাবুর উদ্দেশে কত কত

লোকজন আসিয়া হাজির হইয়া গেল। ক্রমে ঘোড়ার গাড়ী যথাস্থানে বাসায় আমাদের পৌছাইয়া দিল। নৌকার অন্যান্য সকলে হৈ-হৈ করিয়া যথাসময়ে মস্ত বড় বাসাখানাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। এর পর হইতে চলিল আমার বরিশালের জীবনযাত্রার কাহিনী। বরিশালের বাসা ছিল দুই খণ্ডে বিভক্ত—অন্দর ও বাহির। বাহিরের খণ্ডে ছিল রান্নাবান্নার ঘর, ঠাকুর, চাকর, চাপরাশি, মালী প্রভৃতির থাকিবার ঘর ও ছেলেদের বাবুদের থাকার ঘর। ভিতরের খণ্ডে ছিল মেয়েদের খাওয়া, থাকা, শোওয়ার ঘর। ঠাকুর রান্না করিয়া অন্দরে আনিয়া মেয়েদের দিয়া যাইত, আমরা ছোটরা বাহিরের ঘরেই খাওয়া-দাওয়া করিতাম। এই অন্দর ও বাহিরের ব্যবস্থা শুধু বরিশালেই ছিল, অন্যত্র ঐরূপ ছিল না।

বাসায় একটি ঘাটওয়ালা পুকুর ছিল, আমরা চারি-পাড়ের ছোটর দল সবাই মিলিয়া খুব ঝাঁপাঝাঁপি করিতাম। দৈবক্রমে এক দিন ঐরূপ জলকেলির পরে, একে একে সবাই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে আমি কিন্তু পা ফস্‌কাইয়া গভীর জলে পড়িয়া গিয়াছি। ইহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারে নাই, আমিও বোধ হয় ভয়ে ভয়ে কোন শব্দই করি নাই, ভাবিয়াছিলাম নিজেই উঠিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু পুকুরটি ছিল জোয়ার-ভাঁটার। সে সময় ভাঁটার টানে আমাকে দূরে লইয়া চলিল, কিন্তু দৈবক্রমে আমাদের বাসার অতি নিকটেই একটি চাপরাশির বাসা ছিল, সে সে সময় স্নান করিতে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিতে পাইয়াই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমার চুলের মুঠী ধরিয়া টানিয়া উপরে লইয়া আসিয়া সবাইকেই এই খবরটা দিল। আমি ত জল খাইয়া ওজনে বেশ বাড়িয়া গিয়াছি। বাড়ীতে লাগিয়া গেল মহা হৈ-চৈ। দাদামহাশয় ঠাকুর, চাকর, আরদালী সকলকেই বলিয়া দিলেন আমাকে ও ছোটকাকাকে ৩।৪ দিনের মধ্যেই যেন সাঁতার শিখান হয়। যেই হুকুম সেই তামিল, পুকুরে কলাগাছ নামিল, ঘরে ছিল সাদা ধপ্‌ধপে দুইটি বয়া (ইহা নাকি ঠাকুর খুড়া চাটগাঁ হইতে পাঠাইয়াছিলেন)। চারি দিকে লোকজন নামিয়া গেল আমাদের সাঁতার শিখানোর উদ্দেশ্যে। মহা হৈ-হল্লার মধ্যে আমাদের সাঁতার শেখার অভিনয় চলিল। সাঁতার শিখিবার আনন্দ ও জলের ভয়ও ছিল, তবে যাহারা আমাদের সাঁতার শিখাইতেছিল তাদের উপর খুব বিশ্বাস রাখিতাম, সুতরাং ৩।৪ দিন মধ্যেই আমার একরূপ সাঁতার শিক্ষা হইয়া গেল। এখন শুধু নিজে-নিজে প্রাক্‌টিস্ করা, পুকুরের ওপাড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এত শীঘ্র এরূপ সাঁতার শেখা না কি খুব কম ছেলে মেয়েরাই পারে, সবাই একথা বলাবলি করিতে লাগিল, ইহাতে আমি যেন বেশ একটু গর্ব্ব বোধ করিতেছিলাম মনে পড়ে। এক সপ্তাহের পরেই আমি ঐ পুকুরটা পাড়ি দিয়া এপাড়-ওপাড় করিতেছিলাম অনায়াসে। এই গেল আমার সাঁতার শেখার অধ্যায়।

এর পরে আবার ঘোড়ায় চড়িবার সখ আসিয়া দেখা দিল। আমার বয়স তখন

ছয় কি সাড়ে ছয় বৎসর হইবে। ছোট কাকার বয়স সাড়ে সাত কি আট বৎসর। বাসায় ছিল একটা ঘুড়ী ও তার একটা বাচ্চা। সহিসের সহিত খুব খাতির করিয়া লইলাম, অন্দর হইতে বেশী করিয়া পান-সুপারী আনিয়া সহিসকে দিতে লাগিলাম; অন্য কেহ যেন টের না পায়। আমার মন রক্ষার জন্য ভোরে বা সন্ধ্যায় সহিস ছোট বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া ১০।১২ মিনিট সময় একটু ধরিয়া ধরিয়া ঘুরাইয়া লইয়া আসিত রাস্তায় রাস্তায়। এদিকে ছোট কাকা বড় ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া চড়িয়া ক্রমে ঘোড়ায় চড়া একটু রপ্ত করিয়া লইল। একদিন দৈব দুর্ব্বিপাকে ঘোড়ার পিঠ হইতে আমি পড়িয়া গেলাম এবং বেশ একটা চোট পাইয়াছিলাম পায়ে, সহিস ত ভয়ে ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং বাড়ীর ভিতরে না জানাইয়া থাকারও উপায় ছিল না। দাদামহাশয় ও দিদিমার কানে এই ঘটনা যাহাতে না পৌঁছে সবাই সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। সবাই আবার চুপিসাড়ে আমাকে বলিতে লাগিল, "ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলে তোর বিয়া হইবে না" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিবাহের অর্থ বা মর্ম্ম কিছুই আমার বোধগম্য ছিল না, ভাবিলাম যত দেখি বিবাহ, কেবল হৈ-হৈ, রৈ-রৈ, দৌড়-ঝাঁপ, ইহা নাই বা হইল আমার! আমি কেন ঘোড়ায় চড়িব না! মনটা দুঃখে ভরিয়া গেল আমার। সহিস এত দিন খুব সাবধানেই আমাকে ঘোড়ায় চড়াইতেছিল, দৈবের বিধান খণ্ডন করিবে কে? এদিকে ছোট কাকা বেশ ঘোড়-দৌড় শিখিয়া গেল, আমি অদূরে দাঁড়াইয়া ছোট কাকার ঘোড়-দৌড় অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিতাম আর ভাবিতাম, "আচ্ছা ছোট কাকার যদি ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায় তবে ত তারও বিবাহ হইবে না—আমার বেলায় ঘোর আপত্তি। সে যাহা হউক, মাণিকের (অর্থাৎ পুতির) অমৃতময় ভাষায় আমার ঘোড়ায় চড়া জন্মের মত "খতম" হইয়া গেল। কিন্তু কেন জানি না, কেহ ঘোড়ায় চড়িলে আমি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতাম ও সময় সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতাম।

বরিশালে আমাদের বাসার নিকটেই মস্ত বড় একখানা মাঠ ছিল সবুজ রংয়ের, যেন ম্যাটিংকরা, সে মাঠের চারি পাড়েই সব বড় বড় উকীল, মোক্তার ও আত্মীয়-স্বজন, পিওন-চাপরাশিদের বাসায় পরিপূর্ণ ছিল। ছেলেদের খেলাধূলা, আমোদ-উৎসব কিছুই বাদ পড়িত না ঐ মাঠখানাতে। চড়ুইভাতী, ঝুলন, ছায়াবাজী, সাপের খেলা, ম্যাজিক্—আরো যে কত কি—প্রায় প্রতি দিনই উৎসবের উৎস ছড়াইয়া পড়িয়া মাঠখানা যেন আনন্দের জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিত। এক বারের একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে, সবাই ঝুলনের উৎসবে মত্ত, মাঠের চারি পাশের লোকজন ও বাড়ীর সব ছেলের দল, ঠাকুর, চাকর, চাপরাশি, পেয়াদা, ঘোড়ার সহিস, কেহই এই আনন্দের বাহিরে ছিল না। ইহা ছাড়া ঝুলন উপলক্ষ্যে ছেলের দল যার যার বন্ধু বান্ধবদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল; সবাইর উপস্থিতিতে মাঠখানা যেন একটি আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ঝুলনের দোলমঞ্চখানাকে

কাগজের নানারূপ ফুল-লতাপাতায় অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। এই সব কারুকার্য্যময় কাগজের ডিজাইন মা নিজ হাতে সরবরাহ করিয়াছিলেন। এদিকে পূজার আয়োজন, নানারূপ নারিকেলের খাবার তৈয়ার করিয়া দিয়া ছেলেদের আনন্দের ইন্ধন যোগাইতেন। সন্ধ্যায় পূজা, আরতি, বৈকালি ও প্রসাদ বিতরণ এক মহা ব্যাপার ছিল। বহু লোক সমাগম হইত। সে আজ কত যুগ-যুগান্তরের কথা, কিন্তু মনে হইলে যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠে!

অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাঠখানার এক কোণে কতকগুলি কচুগাছ ছিল। কেন যে ঐ কচুগাছগুলি পরিষ্কার করা হইয়াছিল না, তখন তাহা বোঝা ত দূরের কথা এখনও তাহা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না। সেই কচুবনের মধ্যে সন্ধ্যার পরক্ষণেই কয়েকটি দুষ্ট বালক চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাইয়া আমিও উহাদের মত কচুবনে ডুব দিয়া লুকাইয়া রহিলাম, কিন্তু কেন, তাহার কোন খোঁজ আর লইলাম না, এও বুঝি ঝুলনের একটি আমোদ, পরে জানিলাম যে, উহারা ভূত সাজিয়া দর্শক ও পথিকদের ভয় দেখাইয়া একটা খুব মস্ত মজা করিবে এই ছিল তাহাদের প্ল্যান। আমার বয়স ছিল ঐসব ছেলেদের অপেক্ষা অনেক কম। আমি উহাদের দেখাদেখি কচুবনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, মুখ হাঁ করিয়া; নতুবা ভূতের অভিনয় হইবে কি করিয়া? কিছুকাল পরেই যেন টের পাইলাম আমার মুখের মধ্যে যেন কি একটা প্রবেশ করিয়াছে, তাড়াতাড়ি হাত দিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাত পিছলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন উপায়হীন, হইয়া পড়িলাম ও কান্দিতে লাগিলাম এবং হাতের মধ্যে কাপড় জড়াইয়া জিহ্বাটাকে খুব জোরে পরিষ্কার করাতেই দেখা গেল, অতি বড় একটা চ্যাটা। কোথায় ভূতের ভয় দেখাইয়া সকলকে জব্দ করিব, তাহার বদলে আমি চিৎকার দিয়া কান্না জুড়িয়া দিলাম, বহু জন সমাগমের মধ্যে একটা বিষম হৈ-চৈ লাগিয়া গেল এবং আমাকে ঘেরিয়া চারি দিক হইতে নানা প্রশ্ন করিয়া সকলে যখন ঘটনাটা জানিয়া লইল, তখন সকলের হাসির ধূম লাগিয়া গেল। আমি ছুটিয়া আসিয়া মায়ের পাশে শুইয়া পড়িয়া কান্দিতে লাগিলাম। মাও আমার কাছে সকল কথা শুনিয়া এক চোট্ হাসিয়া লইয়া বলিলেন, এরূপ মন্দ খেলা আর কখনও খেলিও না, দেখিলে ত মন্দ খেলার ফল হাতে হাতে পাইয়া গেলে। কান্দিতে কান্দিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না, তবে সেদিনের ঝুলনের আনন্দটা আমার মাটি হইয়া গেল। পরের দিন লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না, বিশেষ করিয়া সেনজীকে (ভগ্নীপতি)। এই ত গেল ঝুলনের ঘটনা।

আমাদের বাসার খুব কাছেই ছিল এক ইংরেজ জমীদারের কুঠী ও ঘাটলা-ওয়ালা খুব বড় একটা পুকুর। সে পুকুর খুব বড় বড় রক্তবর্ণ সাপলায় পরিপূর্ণ ছিল এবং বহু সংখ্যক রাজহাঁস সেই সাপলা-বন মথিত করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া তাদের বাড়ীর গেইটের সামনে সারি বাধিয়া দাঁড়াইয়া তাদের নানারূপ

শব্দে কুঠীখানাকে মুখরিত করিয়া তুলিত। হাঁসগুলির বোধ হয় ইচ্ছা হইত গেইটের বাহিরে এক বার আসিয়া বেড়াইয়া যায়, কিন্তু তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কারণ গেইটের দরজাখানা সর্ব্বদাই বন্ধ রাখা হইত। হাঁসগুলি যখন সারিবদ্ধ হইয়া গেইটের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন আমরা ও পাড়ার ছোটর দলেরা লাঠি দিয়া উহাদের খোঁচাইতে থাকিতাম, হাঁসগুলি খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া গেইটের উপরে খুব ঠোক্‌রাইতে থাকিত। ইহার বেশী শক্তি তাদের কিছুই ছিল না, কারণ গেইটটি বন্ধ। আমাদেরও একটু একটু লাঠির খোঁচা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিবার উপায় ছিল না। কুঠী হইতে সব মানুষরা আমাদের উভয় পক্ষের অক্ষমতা দেখিয়া বেশ একটু হাসাহাসি করিয়া আমোদ উপভোগ করিত। কখনও কিন্তু কোনরূপ তিরস্কার বা বিরক্তি প্রকাশ করিত না।

এক বার সেই কুঠীর জমীদারের একটি মেয়ে—বয়স ১৫।১৬ হইতে পারে, দাদার সঙ্গে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া দিনক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথাসময়ে দাদা ও মেয়েটি চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া গেল। দাদার ঘোড়াটিও ঐ মেয়েটিই যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। যথাসময়ে বহু জনসমাগমের মধ্যে মেয়েটি তার ঘোড়ায় এক লাফেই যথারীতি উঠিয়া বসিল, কিন্তু দাদা যেই তার ঘোড়ায় চড়িতে গেলেন, ঘোড়াটি এক লম্ফ প্রদান করিয়া তার অমত প্রকাশ করিয়া বসিল। দ্বিতীয় বার আবার চেষ্টা করিতেই আবার সেই উল্লম্ফন! কি করা যায়, ঘোড়ার সহিস তখন ঘোড়াটিকে খুব বুঝসুঝ দিয়া চাপড়াইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া খুব তোয়াজ করিয়া দাদাকে কোন রূপে ঘোড়ায় চাপাইয়া দিল এবং সাঙ্কেতিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। দর্শকরাও মহা উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল কে হারে, কে জিতে। দর্শকদের মধ্যে আমি ও ছোট কাকা যে অতি উৎসাহী তাহা বলাই বাহুল্য।

এদিকে কয়েক মিনিট পরেই এক অঘটন ঘটিয়া গেল, দাদার ঘোড়াটি দাদাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া লাগাম-মুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে, সহিস ঘোড়াটিকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। দাদাকে লইয়া তখন এক বিষম হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। দর্শকরা সব জড়ো হইয়া কেহ ডাক্তারের বাড়ী, কেহ বরফ, কেহ বা পাখার বাতাসের বন্দোবস্তে লাগিয়া গেল। এদিকে সেই ইংরেজ মেয়েটি তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া দেখিতে পাইল দাদার ঘোড়াটি অতি বেগে সওয়ার বিহীন অবস্থায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সহিসও ঘোড়া ধরিবার জন্য প্রাণপণ ছুটিয়া চলিয়াছে ঘোড়ার পিছন পিছন। ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না, মেয়েটি খুব দুঃখিতা হইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দাদা যেখানে পড়িয়া গিয়াছেন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। দাদার আঘাত খুব গুরুতর হইয়াছিল, তার মধ্যে বিশেষ করিয়া সামনের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পরে কথাবার্ত্তায় জানা গেল ঐ ঘোড়াটি যার ছিল

তাকে ছাড়া অন্য সওয়ার ঘোড়াটি কখনও বহন করিত না। এই জন্যই বার ২ ঘোড়াটি তার ঘোর আপত্তি পূর্বাহ্ণেই জানাইয়াছিল, সহিস হয়ত বক্সীস পাওয়ার লোভে ঐ গুরুতর কথাটি গোপন করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল এক বার চড়াইয়া দিতে পারিলেই ঠিক হইয়া যাইবে, এত বড় অঘটন সে মনেই করিতে পারে নাই। দাদাও খুব হুজুগপ্রিয় ছিলেন, একে একে দুই বার প্রত্যাখ্যানকে অগ্রাহ্য করিয়া মহা অনর্থের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। দাদা এই ঘোড়দৌড়ের হুজুকে কয়েক মাস শয্যাগত হইয়া রহিলেন। দাদার ঘোড়ায় চড়ার চিত্রটি আমার খুবই মনে গাঁথা ছিল এবং এর পরে আর আমার ঘোড়ায় চড়িবার সাধ রহিল না। আমার ঘোড়ায় না চড়িবার দুঃখ চিরতরে ঘুচিয়া গেল।

বরিশালে থাকিতে একদিন দাদামহাশয় মাকে বলিয়া গেলেন ছোট কাকা ও আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া, সাজ-পোষাক পরাইয়া রাখিতে। মহারাজ সূর্য্যকান্তের জাহাজে উহাদের একটু বেড়াইয়া লইয়া আসি। আমাদের ত আনন্দের সীমা রইল না। জাহাজ তখনও চোখে দেখি নাই, নাম শুনিয়াছি। জাহাজ নামক একটি জিনিস আছে, সেই আশ্চর্য্যজনক জাহাজে বেড়াইতে যাইব আহ্লাদের আর সীমা কই! যথাসময়ে জাহাজের লোকেরা আমাদের লইতে আসিল, মা পূর্ব্বাহ্ণেই আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজ-পোষাক পরাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন মনে হইলে হাসি পায়। ছোট কাকা ও আমার জরিদার টুপী আমার পুতির কারুকার্য্যময় গাউনের বাহার, তদুপরি জরীর বাহার, ছোট কাকারও তদনুরূপ পোষাক সজ্জার ত্রুটি রহিল না! সাজ-পোষাক পরিয়া যেন বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম। চলিলাম বরিশাল নদীঘাটে, জাহাজখানা নোঙ্গর করা ছিল, যথারীতি আমাদের ও আমাদের তত্ত্বাবধানের লোকজনদের জাহাজে তুলিয়া লইতেই যথাসময়ে জাহাজখানা ছুটিয়া চলিল, একে ত জাহাজ দেখি নাই, তাতে জাহাজে চড়া, ইহাতে যে কি গর্ব্বিতা হইয়া গেলাম!

রাজার জাহাজ কত কত সরঞ্জাম দিয়া সজ্জিত, তার অন্ত ছিল না, খাট-চেয়ার ভেলভেটে মোড়া, টেবিল চেয়ারের কতই না বাহার! মুহূর্ত্তমধ্যে ঝপাঝপ্ করিয়া নলসিটী ইত্যাদি কয়েকটা স্থান ঘুরাইয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রায় সন্ধ্যার সময় আবার আমাদের সকলকে নদীর ঘাটে নামাইয়া দিল জাহাজখানা।

এখন ভাবিয়া দেখি, বর্ত্তমানের তুলনায় সে জাহাজখানার কলার মোচার খোসার সঙ্গেই তুলনা চলে। তখন ভাবিতাম বাবা রে! কত বড় জাহাজ! মহা আনন্দ করিয়া সে সময় মায়ের বুকে যথাসময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। তার পর দিন সমবয়সীদের নিকট গল্প করিতে লাগিলাম, তাহারাও গল্প শুনিয়া শুনিয়া খুবই আনন্দ পাইতেছিল, তার কিছুক্ষণ পরেই সবাই হঠাৎ গভীর মহাদুঃখের সহিত বলাবলি করিতে লাগিল, "তোরা দুই জনে জাহাজে চড়িয়া বেড়াইলি, আমাদের কেন নিয়া গেলি না?" ইত্যাদি। উহারা কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার যেন

চেতনা হইল, সত্যই ত আমি একা একা জাহাজে চড়িয়া বেড়াইয়া আসিলাম, আর উহারা যাইতে পারিল না। জাহাজ-চড়ার আনন্দ অপেক্ষা সমবয়সীদের অনুযোগ যেন আমাকে অত্যন্ত বেদনা দিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিলাম, সত্যই ত সকলে মিলিয়া যদি এই আনন্দ পাইতে পারিতাম, তবে কতই না সুখের হইত! এ ভুল কেন যে করিলাম, তাহা বুঝিবার মত বয়স আমার ছিল না। জাহাজে চড়িবার আনন্দেই মস্‌গুল হইয়া সমবয়সীদের কথা বেমালুম ভুল হইয়া গিয়াছিল আমার। বিশেষতঃ সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী ছোট কাকা ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন তাই অন্য কারো কথা আমার মনেই আসে নাই। পরে মা বলিলেন, ১০।১২টি ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব নিতে জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষও রাজী হইত কিনা সন্দেহ ছিল। মা আমার এই দুঃখটাকে দূর করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি আমার মনের মধ্যে একটা গভীর দাগ কাটিয়া রহিল। যে কোন আনন্দ ব্যাপারে একা একা আমার মন কিছুতেই অগ্রসর হইত না। আজ শেষ জীবনের পারে দাঁড়াইয়াও আমার সে কথাটি যেন অন্তরে জাগিয়া রহিয়াছে!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই আনন্দের লীলাভূমি বরিশাল সহর হইতে আমাদের জন্মের মত চলিয়া যাইতে হইবে ঢাকা শহরে। বরিশালে একাদিক্রমে দাদামহাশয় ১৪ বৎসর কাল প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়াছিলেন। ঢাকায় ইংরেজ ম্যাজষ্ট্রেট হেয়ার সাহেব ৬ মাসের ছুটি নিয়া বিলাত চলিয়া যাইতেছেন। সেই স্থানে দাদামহাশয়কে ঢাকা যাইতে হইবে। দাদামহাশয় ছিলেন অতি সরল সদাশয় ব্যক্তি, বরিশালে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। যখন ক্রমে সবাই জানিতে পারিল, দাদামহাশয় বরিশাল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন সবাই যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল। বরিশাল হইতে চিরবিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল; এত কালের সংসার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়া সহজসাধ্য নহে। ৭।৮ দিন পূর্ব্ব হইতেই গুছানের অন্ত ছিল না। যেদিন প্রকৃতপক্ষেই বরিশাল হইতে যাত্রার দিনক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, সেদিন সকাল বেলা ১০।১১ টার মধ্যেই সকলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নদীঘাটে যাইয়া সমবেত হইতে লাগিল। আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে নদীঘাটে আসিয়া নৌকায় যাইয়া উঠিলাম।

নৌকাখানা অতি বড় গ্রীনবোট। ইহা দাদামহাশয়ের মাসিক ভাড়ার নৌকা, মফঃস্বলে যাওয়ার জন্য নদীঘাটেই বান্ধা থাকত। এদিকে সহর ভাঙ্গিয়া আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব ও দাদামহাশয়ের অফিসের ডেপুটি, মুন্‌সেফ উকীল মোক্তার প্রভৃতি দলে দলে আসিয়া নৌকায় উঠিতে লাগিল, যাহারা নৌকায় উঠিতে পারিল না তাহারা নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে দাদামহাশয়কে বিদায় অভিনন্দনের জন্য ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এই ভাবে দলের পর দল আসিয়া ক্রমাগত বাড়িয়া গেল জনতার সংখ্যা। জানি না

কাহারা। তবে হাউ হাউ করিয়া কান্নার শব্দ শুনিতেছিলাম। এই ভাবে বিদায় অভিনন্দনের পালা শেষ হইয়া না কি রাত্রি ১২টার সময় নৌকা ছাড়িবার অবকাশ পাইয়াছিল। তখন আমরা ছোটর দল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ "বদর। বদর।" চিৎকার ধ্বনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জানিতে পারিলাম আমাদের নৌকাখানা বরিশালের তীর ছাড়িয়া জন্মের মত যেন হেলিয়া-দুলিয়া তার গন্তব্য স্থান ঢাকা সহরের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। হায়! হায়! বরিশালের আনন্দ আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই ত ফেলিয়া যাইতে হইল কোন এক অপরিচিত নূতন জায়গায়। মনটা বড়ই দুঃখে ভরিয়া গেল, এই ভাবে কিছুকাল গুমুরিয়া কান্দিতে লাগিলাম, পরে নৌকার মধুর দোলানিতে মায়ের বুকের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোরের দিকে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন নদীতে সূর্য্য উঠিয়া গিয়াছে। বিছানায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বরিশালের ছবি, জন্মের মত বরিশালের লীলাখেলা সাঙ্গ হইয়া গেল, ভাবিতেই যেন কান্নায় মনটা ভরিয়া গেল। বহু দূর নৌকা জলপথে অগ্রসর হওয়ার পরে যথাসময়ে রন্ধনাদি করিবার একটা ভাল স্থানের খোঁজ করা হইতে লাগিল। মাঝিরা এইসব পথের খোঁজ-খবর সর্ব্বদাই রাখিত, বিশেষতঃ নৌকাপথে বরিশালের রাস্তা খুবই বিপদজনক ছিল। তবে এত লোকজন সহ এত বড় নৌকা বিশেষতঃ চিহ্নিত খারাপ স্থানে পৌছিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সজোরে টিকারা বাজানোর শব্দে বহু দূর দূরান্তে খবর পৌছাইয়া যাইত। হাকিমের নৌকা নিকটবর্ত্তী, ডাকাতগণও বুঝিয়া শুনিয়া বেশ ভদ্রভাবেই নৌকার সম্মুখীন হইয়া হাকিমের কিছু দরকার বোধ করিলে যোগান দেওয়ার জন্য অতি আগ্রহে আগাইয়া আসিত। নৌকাখানার কাছে পৌছিতেই দারোগা-পুলিশ ইত্যাদি নৌকার সম্মুখে আসিয়া হাকিমকে সসম্মানে অভিবাদন করিত এবং কি কি দ্রব্যাদির প্রয়োজন ও তাহার সংস্থান করিয়া দিত। এদিকে চাকর বিশেষ করিয়া কাঙ্গাইলা ভাই বাজারে যাইয়া বাজারের সব সেরা জিনিস যাহা প্রয়োজন কিনিয়া লইয়া আসিত। আবার লোকজনের পরামর্শমত ভাল স্থানে রান্নার আয়োজন করিতে চাকররা ও ঠাকুর প্রভৃতি কাজে লাগিয়া যাইত। এত লোক সঙ্গে যেন একটি নিমন্ত্রণ বাড়ী। আমরা ছোটরা পাড়ে নামিয়া আনন্দে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলাম। রান্না হইয়া গেলেই চাকররা ছোটদের স্নান করাইয়া দিত নদীর জলে। নদীতে অনেক শুশুক ছিল, বড়রাও কেহ নদীতে নামিয়া স্নান করিতে সাহস করিত না। এইভাবে বরিশাল হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের আসিয়া গেল একদিন।

ঢাকায় নদীঘাটে পৌছিবার কিছু পূর্ব্বেই মাঝিরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ঐ ত শ্যামপুরঘাট দেখা যাইতেছে, আর বেশীক্ষণ বাকী নাই ঢাকার নদীর ঘাটে পৌছিতে" ইত্যাদি। হঠাৎ দেখি দিদিমা চীৎকার দিয়া কান্দিয়া উঠিলেন, নৌকার

লোকজন সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল, মাও দেখি নিঃশব্দে কান্দিয়া আকুল হইতেছেন, কিছুই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। বয়স আমার ৭।৮ হইতে পারে সম্ভব। বাবার নাম ধরিয়াই দিদিমা কান্দিতেছিলেন তাহা আমার বুঝিতে বাকী ছিল না। পরে কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে পর সব বুঝিলাম। ঢাকাতে চিকিৎসার্থে ২৯ বৎসরের সুযোগ্য পুত্রকে লইয়া আসিয়া শ্যামপুর ঘাটের মহাশ্মশানে আহুতি দিয়া মাতাঠাকুরাণী ও বহু আত্মীয়-স্বজনসহ পুত্র-শোকাতুরা দিদিমাকে সোনারঙ্গের বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। শ্যামপুর ঘাট-এর নাম শ্রবণ মাত্রই পুত্র-শোকাতুরা দিদিমা ও পতিহীনা মাতাঠাকুরাণীর অবস্থাটা বুঝিয়া লইতে আমার বিলম্ব হইল না। পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া যেন নূতন বেশে আসিয়া দিদিমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। হায়! তখন কে জানিত সেই মৃত পুত্রের বংশ প্রথম দৌহিত্রটিকেও তার মা এই শ্যামপুর ঘাটে শ্মশানচিতায় তুলিয়া দিবে! কে জানিত এই আনন্দনিরতা ক্ষুদ্র বালিকার উত্তর জীবনের শেষ অভিনয় ২৫ বৎসরের সুযোগ্য পুত্রকে পিতামহীর ন্যায় শ্যামপুর ঘাটে শ্মশান-চিতায় তুলিয়া দিবে! বিধাতার কি বিচিত্র বিধান!

যথাসময়ে আমাদের বহু জনপূর্ণ গ্রীনবোটখানা ঢাকার বুড়ীগঙ্গার ঘাটে নোঙ্গর গাড়িল; হৈ-চৈ করিয়া ছেলের দল তীরে নামিয়া পড়িল। ঠাকুর, চাকর, চাপরাশির দল ঘোড়ার গাড়ীর সন্ধানে ছুটিয়া চলিল; মালবাহী গাড়ীও কয়েকটা আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আমরা হৈ-চৈ করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, পশ্চাতে রহিয়া গেল বরিশালের আনন্দময় জীবনের মধুর স্মৃতিটুকু। যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট হেয়ার সাহেবের কুঠীতে কল্‌তা বাজারে আমরা সকলেই পৌছাইয়া গেলাম। সাহেবদের বাড়ী ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ম্যাটিং-করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; অনেকগুলি কোঠা সাজ-সজ্জাও বেশ মনোহর ছিল। বাড়ীখানা বহু স্থান লইয়া অবস্থিত। বহু জায়গা মাঠের মত; ছাঁটা ঘাসে মাঠখানাকে যেন সবুজ কার্পেটের ম্যাটিং-করা মনে হইত। ফল ও ফুলের গাছগুলি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত ছিল, তন্মধ্যে অধিকতর লোভনীয় ছিল নারিকেল-কুলের গাছটি। কুলের গাছটি খুব বড় ছিল এবং কুলগুলি অতিমাত্রায় গাছে লোভনীয় হইয়া ঝুলিয়া থাকিত এবং গাছভর্ত্তি কুল হইত। আমাদের ছোটদের ত লোভের সীমা ছিল না, দেওয়াল-ঘেরা বাড়ী, গেইটে দারোয়ান। বাসায় বহু লোকজনের সমাগম। দাদামহাশয়ের নিজ পরিবার ছাড়াও গ্রাম সম্পর্কে বহু আত্মীয়-স্বজনের সমাবেশ ছিল ঐ বাসায়, ৫০ জন লোক ত হইবেই। মহা আনন্দে আমাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইত।

বাড়ীর নারিকেল-কুলের গাছগুলিতে অতিমাত্রায় কুল ধরিত তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। যে কোন সময় গাছের তলায় গেলেই শুনিতে পাইতাম ছোট ছোট

ছেলে-মেয়েদের কাতর প্রার্থনা। মস্ত বড় বাড়ীখানা ছিল দেওয়ালঘেরা দুর্গস্বরূপ, দেওয়ালের অপর পৃষ্ঠ হইতে ভাসিয়া আসিত "বি-বি একটা বইল" "বাবু একটা বইল" (বরইর অর্থ বইল)। তখন গাছের তলা হইতে যাহা পাইতাম কুড়াইয়া লইয়া দেওয়ালের অপর পারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। ওপারে লাগিয়া যাইত কি মহানন্দের কাড়াকাড়ি! আবার সেই সঙ্গে খুব ছোটদের কান্নার সুর ভাসিয়া আসিয়া কানে বাজিতে থাকিত, তাহার কারণ এই ছিল বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুল কুড়াইবার সামর্থ্য তাদের ছিল না, সুতরাং "বালানাং রোদনং বলং" হইয়াই তাদের বিমর্ষ হইয়া থাকিতে হইত। কোন কোন দিন চাকরদের বিশেষ করিয়া কাঙ্গাইলা ভাইকে অনুনয় বিনয়ের যুক্তিতর্কে রাজি করিয়া লইয়া অনেক পরিমাণে কুল সংগ্রহ করিয়া তার বলিষ্ঠ হাতের নিক্ষেপ দ্বারায় কুলগুলিকে দেওয়ালের ওপারে বাঞ্ছিতদের কাছে পৌছাইয়া দিতাম। কি যে আনন্দ তাদের! এই ত সংসারের রীতি নীতি! কেহ হয়ত পায় না কেহ হয়ত পর্য্যাপ্ত জিনিসের অংশগুলিকে পচনের পথে ঢালিয়া দেয়!

ক্রমে আমার বয়সের সঙ্গে ইডেন স্কুলে যাওয়ার দিন ঘনাইয়া আসিল। ইডেন স্কুলের গাড়ীখানা যথাসময়ে বড় গেইটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়, পূর্ব্বাহ্ণেই চট্‌পট্ করিয়া মুখে ভাত গুঁজিয়া উঠিতেই কাঙ্গাইলা ভাইর ধমকানিতে আবার পাতে বসিয়া কিছু বেশী ভাত খাইতে বাধ্য হইতাম, এবং খাওয়া সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে অতি যত্নে হাত মুখ ধোওয়াইয়া আমার গুছান বইগুলি হাতে লইয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিত। আজ অন্যান্য স্মৃতির বাহুল্যের মধ্যেও কেন জানি কাঙ্গাইলা ভাইর সেই স্নেহ মমতার ব্যবহার-গুলি মনে হইতেছে নূতন করিয়া। কাঙ্গাইলা ভাই এ বাড়ীর বেতনভোগী চাকর ছিল না, সে ছিল এ বাড়ীর স্নেহ-মমতার একজন নিকটতম অংশীদার।

এক বার যখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষে সমস্ত উড়িষ্যা থানা মৃত্যুমুখে উপস্থিত সে সময় সরকার পক্ষ দাদামহাশয়কে উড়িষ্যায় রিলিফ কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দারুণ মর্ম্মান্তিক ব্যাপার! ভাই বিধবা ভগ্নীকে, পিতা বিধবা মেয়েকে খাদ্যাদি দিতে না পারিয়া হাকিমের দুয়ারে, পায়ের উপরে ধর্ণা দিয়া পড়িল। বলিতে লাগিল, "সব রইল, কিছু কিছু টাকা দেও খাইয়া বাঁচি" এই ভাব। কি করিবেন দাদামহাশয় কিছুই যেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না, কয়েকজন বিধবা ও পুত্রবতী মেয়েদের তিনি খাওয়া দিতে লাগিলেন। ভাই বা পিতামাতা কেহই আর খোঁজ খবর করিল না। এতগুলি মানুষকে তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তখন ঐ মেয়েরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দাদামহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, আপনি আমাদের আপনার দেশে লইয়া যান, আমাদের যত দূর সাধ্য আপনার বাড়ীর কাজ কর্ম্ম করিব ইত্যাদি ২। কাজেও হইল তাই—সেই মেয়েদের একজনের

একটি শিশু সন্তান ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে সেই আমাদের স্নেহশীল কাঙ্গাইলা ভাইরূপে সংসারে দাঁড়াইয়া গেল।

সম্মতি ক্রমে ঐ ৪।৫ জন মেয়েদের দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, যথাসময়ে মেয়েদের অভিভাবকদের খবর দেওয়া হইল, ক্রমে ক্রমে অভিভাবকরা আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং হাকিম বাবুর জিম্বায় মেয়ে ও বোনদের সমর্পণ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। জানা যায় মেয়েদের অভিভাবকদিগকে দাদামহাশয় খুসী করিয়া বকসীস দিয়া বিদায় করিলেন। কাঙ্গাইলা ভাইর মায়ের নাম ছিল রেশমী, যাহাকে আমরা ধাই-পিসি ডাকিতাম, তার নাম ছিল পার্ব্বতী ইত্যাদি ২। এই ভাবে ভীষণ বুভুক্ষার পীড়নে জন্মের মত কয়েকটি প্রাণী ছিটকাইয়া পড়িল পূর্ব্ব বাঙ্গালায়। এই সম্পর্কে একটি হাসিবার কথা লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

৩

এই সবই বড় হইয়া আমার শুনা কথা; দিদি আমার ৭ বৎসরের বড়, তখন পর্য্যন্ত জন্ম হয় নাই। খুল্লপিতামহ ঢাকাতে তখন ডাক্তারী করিতেন ও আমার বাবা সেখানে থাকিয়া ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। যথাসময়ে ঐ মেয়ের দলটি ছোট দাদামহাশয়ের জিম্বায় আসিয়া পৌছিল এবং উহাদের যেন কোনরূপ খাওয়া-পরা ইত্যাদির কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে দাদামহাশয় বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া পাঠাইলেন। ছোট দাদামহাশয় যথাসম্ভব উহাদের যত্নের ত্রুটি যাহাতে না হয় সেরূপ উপদেশ দিয়া ঠাকুর-চাকরদের বলিয়া দিলেন, সময় ও সুযোগ মত উহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, আছে তারা ভাল ভাবেই; খাওয়া-পরার স্বচ্ছন্দতার মধ্য দিয়া দেশছাড়া, আত্মীয় বন্ধুদের হইতে চিরজন্মের মত বিচ্ছেদটা যে তাদের মনের মধ্যে উঁকি না দিত তাহা নয়, কিন্তু উদরের জ্বালার কাছে সবই যেন ডুবিয়া যাইত। তাই উহারা বেশ ভাল ভাবেই অর্থাৎ হাসিখুসী হইয়াই উহাদের দিনগুলি কাটাইতেছিল। কিন্তু একদিন দেখা গেল, একটি কোঠার মধ্যে উহারা ৪।৫ জন গলাগলি ধরিয়া হাউ-মাউ করিয়া বিষম কান্নাকাটি করিতেছে; ছোট দাদামহাশয় রুগীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া এটা কি ব্যাপার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। যতই উহাদের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় ততই যেন উহারা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে বেশী করিয়া। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিবার পর তাদের কান্নার ভাষা হইতে প্রকাশ পাইল, ঠাকুর ও চাকররা বলিয়াছে তাদের 'বলি' দেওয়ার জন্য আনা হইয়াছে এবং আলমারীতে সিরাপ ও পাল টুকটুকে ঔষধগুলি দেখাইয়া প্রমাণ করিল, ইহা বলির রক্ত রাখা

হইয়াছে। ঠাকুর ও চাকররা ইহা বলিয়াছে এবং দেখাইয়াছে। তখন ছোট দাদামহাশয় নাকি কিছু কাল হাসি বন্ধ করিতে পারিলেন না, পরে ঠাকুর চাকরদের বলিয়া দিলেন ভবিষ্যতে যেন এরূপ ঘটনা না হয়।

যথাসময়ে উহারা বাড়ীতে একটি বিরাট পরিবারে সোনারঙ্গ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গেল এবং মহা নিশ্চিন্ততার মধ্যে তাদের নূতন জীবন আরম্ভ করিল। কাঙ্গাইলা ভাইর বয়স যখন মাত্র ৫ বৎসর, দুর্ভাগ্যক্রমে তার মার মৃত্যু ঘটিয়া গেল। পিতৃমাতৃহীন ঐ শিশুটিকে মাতা ঠাকুরাণী ও দিদিমা অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্গাইলা ভাইকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন মাতা ঠাকুরাণী। কিন্তু তাহার মন গেল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। থালা, ঘটী ইত্যাদি মাজিবার দিকে তার ঝোঁক্ গেল বেশী করিয়া, তার মত এমন ঝক্‌ঝকে বাসন কেহই মাজিতে পারে না, এই ছিল তার বড় গর্ব্বের বিষয়। মা বহু চেষ্টা করিয়াও নাম স্বাক্ষরটুকুও শিখাইতে পারিলেন না। সকলের ইচ্ছা ছিল যে, অন্ততঃ উহাকে একটা প্যাদা বা পিওন, চাপরাশীগিরি কাজে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। কিন্তু কিছুতেই আর সেটা পারা গেল না, অগত্যা দাদামহাশয় কিছু কিছু টাকা কাঙ্গাইলা ভাইর জন্য জমা রাখিতে লাগিলেন। উত্তর জীবনে সেই টাকায় বহু জমী-সংযুক্ত ২।৩ খানা টীনের ঘরসহ একখানা বাড়ী করিয়া দিয়া কাঙ্গাইলা ভাইকে সংসারে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন।

কাঙ্গাইলা ভাইকে দিদিমা বিবাহ করাইবেন, আমরা ছোটর দল একটা হুজুগ পাইলেই আনন্দে উন্মত্ত; বিবাহে আমাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামের লোকদিগের আনন্দের ত কথাই ছিল না। আমার বয়স তখন ৮ বৎসর, এ বিবাহে দিদিমা ঘটা করিলেন যথেষ্ট এবং সেই দিদির বিবাহের মত তৈল সিন্দুর ও পান-বাতাসার বরাদ্দ যথেষ্ট হইল। ঘটক একটি ভাল সম্বন্ধ জুটাইয়া দিলেন। জানি না, কন্যাপক্ষ ঘটক বিদায় কত টাকা দিয়াছিলেন। এক ঠাকুরবাড়ীর মৃতা দাসীর ৫ বৎসরের একটি মেয়েকে অতি সস্তায় মধ্যস্থের হাত দিয়া ৫০০৲ শত টাকায় কিনিয়া লইলেন আমার ঠাকুর মা। মেয়ের পেটভরা প্লীহা-যকৃত, কত দিন তায় পরমায়ু তাহাই বা কে বলিতে পারে? কাঙ্গাইলা ভাই ছিল কুৎসিত কদাকার ও কালো, তার জন্য দিদিমা আনিলেন একটি অতি ফর্সা টুক্‌টুকে বৌ, ইহাতেই তিনি আহ্লাদে আটখানা! কত সস্তায় পাইলেন এমন টুক্‌টুকে বৌ! আমরাও এই আনন্দের মধ্যে থেই হারাইয়া গেলাম। এই বিবাহ ব্যাপারে বহু টাকা খরচের জন্য দাদামহাশয়ের কতখানি স্বীকৃতি ছিল তাহা আমরা বড় হইয়াও সন্ধান লইতে আগ্রহান্বিতা ছিলাম না। যিনি এই বিবাহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, তাঁহার উপরে "টু" শব্দটি করিবার দ্বিতীয় লোক যে কেহ ছিল না তাহা আমরা অতি অল্প বয়সেও বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিতাম। কল্‌তা বাজারের কুঠীর স্মৃতির

সঙ্গে আজও কয়েকটা বিশেষ ঘটনা মনে জাগিয়া রহিয়াছে। একবার কলিকাতা হইতে লাট সাহেবের সঙ্গে ৪০ জন কেরাণী প্রভৃতি ঢাকায় গিয়াছিল এবং তাহাদের খাওয়া দাওয়ার ভার দাদামহাশয় নিজে লইয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে সে এক বিরাট ব্যাপার! আমাদের ঠাকুর কাকার নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র, তাকে দাদামহাশয় অতিযত্নে প্রতিপালন করিতেন, তার বিশেষ একটি কারণও ছিল। তার বড় ভাইটি বাবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্মস্থলে ঘুরিয়া বেড়াইত ও বাবাকে খুব যত্ন করিত। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য—বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এক বৎসরের মধ্যেই সে ঠাকুরটিও মারা গেল। সেই অবধি ঠাকুর কাকাকে সবাই খুব স্নেহের চক্ষে দেখিত, বিশেষ করিয়া বাবার নামের সহিত তাহার নামের মিল ছিল, ইহাও যেন একটা বিশেষ করিয়া ঘনিষ্ঠতায় জড়াইয়া গেল। ঠাকুর কাকারও পড়াশুনার দিকে মন বসিল না। তাই দাদামহাশয় ঠাকুর কাকাকে আমিষ, নিরামিষ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করিবার সুযোগ সুবিধা দিয়া একেবারে রান্নার কাজে ওস্তাদ করিয়া তুলিলেন। কমিশনার রমেশ দত্ত ও দাদামহাশয় যখন মফঃস্বলে বাহির হইতেন তখন দাদামহাশয় ঠাকুর কাকাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং রমেশ দত্তের খান্‌শামার নিকট হইতে ঠাকুর কাকাকে নানা প্রকার মাংসের রান্না শিখাইয়া লইতেন। উত্তর জীবনে ঠাকুর কাকা আমিষ, নিরামিষ, মিঠাই, মণ্ডা তৈয়ার করিবার উঁচু দরের ওস্তাদ হইয়া গিয়াছিল। লাট সাহেবের দলকে ভাল ভাবে খাওয়াতে হইবে, এবার ঠাকুর কাকার রান্নার সমস্ত রকম পরীক্ষা হইবে; ঠাকুর ও চাকর মহলে বিরাট হৈ-চৈ লাগিয়া গেল। চাঙ্গারী ভরা ভরা মুর্গী ও মাছ ইত্যাদি। ঠাকুর কাকা এই রান্নায় খুব প্রশংসা পাইয়াছিলেন। আমি মায়ের ঘরের নিরামিষ ডাল তরকারি দিয়া ভাত খাইয়া মার বুকে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিমন্ত্রণের খাওয়া দাওয়া চুকিয়া যাইতে বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ছোট কাকার চিৎকার দিয়া কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম দিদিমা অতি মাত্রায় ক্রোধান্বিতা হইয়া হাতের পাখাখানা দিয়া ছোট কাকাকে বেদম মারিতেছেন, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং ইচ্ছা হইল দিদিমার মারণাস্ত্রখানাকে ছিনাইয়া লইয়া আসি, কিন্তু দিদিমার ঐ দুরন্ত রাগের সাম্‌নে কে দাঁড়াইতে পারে? একমাত্র দিদি (প্রমদা) ছাড়া; দিদি তখন শ্বশুরবাড়ীতে। যাক্, মনের সাধ মিটাইয়া দিদিমা ছোট কাকাকে মারিয়া থামিলেন, কিন্তু তর্জ্জন-গর্জ্জন চলিল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত। পরে দাদামহাশয় খুব শান্ত কণ্ঠে বলিলেন "দেখো, যে মারটা আজ তুমি ধনেশকে মারিলে ইহা সবই আমার পিঠেই পড়িয়াছে। ধনেশের কোনই দোষ নাই, সব দোষই আমার," ইত্যাদি।

দিদিমা আবার রাগিয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন, আপনার পিঠে কি করিয়া মার পড়িল? ইত্যাদি নানা কথার কাটাকাটি করিতে লাগিলেন। মোট

কথা মুর্গী ইত্যাদি সেদিনে হিন্দুর অতি নিষিদ্ধ জিনিস, তাহা আবার স্বামী ও পুত্রগণ সকলেই খাইল, ইহাতে দিদিমার রাগের কারণ যে যথেষ্ট ছিল, তাহা অস্বীকার করা কিছুতেই চলে না। বিশেষতঃ সে যুগের দিনে। এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, উত্তর জীবনে এমন একটি মহা বিপর্য্যয় আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল যে স্বামীকে মুর্গীর মাংস ও সুপ ইত্যাদি রান্না করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাক, সেদিনের ব্যাপারে আমি খুবই বাঁচিয়া গেলাম, কারণ—আমি ত আর সেদিন ঐ সব অখাদ্য গ্রহণ করি নাই, দিদিমা ইহাতে আমার উপর মহা খুশী।

এদিক কাঙ্গাইলা ভাইর এক মহা কাণ্ড! সকলে এত সব জিনিস খাইল, কেবল মাত্র আমিই বাদ পড়িব ইহা যেন তার সহ্য হইতেছিল না। সে সব জিনিসই প্রচুর পরিমাণে পরের দিনের জন্য অতি যত্নে আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল। পরদিন অতি চুপি চুপি রান্নাঘরে আমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া আমাকে খাওয়ানোর জন্য অতি ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তখন আমি খুব প্রতিবাদ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কাঙ্গাইলা ভাই তাহা কোন ক্রমেই গ্রাহ্য করিল না। বাধ্য হইয়া খাইলাম ও খাওয়ার পরেও ভয়ে ভয়ে যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। খাওয়ার পরে কাঙ্গাইলা ভাই সাবান ও লেবু দিয়া খুব পরিষ্কার করিয়া আমাকে আঁচাইয়া দিল এবং ভাল করিয়া আমার মুখ মুছিয়া দিল, যেন পেঁয়াজ বা মাংসের গন্ধ না থাকে। বলা বাহুল্য, কুঠি হইতে রান্নাঘরখানা অনেক দূরেই অবস্থিত ছিল, সুতরাং দিদিমা ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু আমি যেন চোরের মত সারা দিন অতি অপ্রসন্ন ভাবে কাটাইতে লাগিলাম কত যেন অপরাধী আমি!

কল্‌তা বাজারের বাসার আর একটি ঘটনা বিশেষ করিয়া মনে জাগিয়া রহিয়াছে আজও। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর চাকর ছেলের দল সকলেই যেন কি একটা উপলক্ষে কুঠি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার সময় সমস্ত ঘরেই আলো জ্বালাইবার সময় উপস্থিত, কিন্তু চাকররা সে সময় কেহই বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। সুন্দর খুড়ীমা টেবিলের উপর সজ্জিত গ্লাসের বাতীটি ম্যাচ দিয়া ধরাইয়া দিয়া আসিলেন। তখনকার দিনে খোলা কাচের গ্লাসের বাতীরই চলন ছিল; সুন্দর খুড়ীমার বয়স ১০।১১ হইতে পারে। এদিকে টেবিলের নিকটের জানালাটা বন্ধ না করিয়া আলো জ্বালাইয়া দেওয়াতে এক ঝটকা বাতাস আসিয়া জানালার পরদাখানাকে খোলা গ্লাসের বাতীর উপর ফেলিতেই দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সুন্দর কাকার সদ্য বিবাহিত শ্বশুর-বাড়ী হইতে প্রাপ্ত মূল্যবান ক্রেপ ইত্যাদির মশারি গদী প্রভৃতি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল অল্প সময়ের মধ্যে। মাতাঠাকুরাণী যখন এই আগুন লাগিবার খবর জানিতে পারিলেন তখন ছুটিয়া যাইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলেন

'ভারী' স্নানের ঘরে জল রাখিয়া গিয়াছে, তাহা অতি বড় বড় পিতলের পাত্রে ভরা, এক একটির ওজন দুই কি আড়াই মণ হইবে। মাতাঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি সেই একটি বড় জল-ভরা পাত্র ও মুড়ি খাইয়া কে যেন একখানা ডালা সেই ঘরে রাখিয়াছিল, সেই ডালাসহ সেই অগ্নিময় ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে জলসেচন করিতে লাগিলেন এবং আগুনের গুরুত্বটা জলসেচনে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। এদিকে বাড়ীর সবাই বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং মাতাঠাকুরাণীর উপস্থিত বুদ্ধির ও অসম্ভব শক্তির অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল, তাহা আমার খুবই স্মরণ আছে। এত বড় জলপাত্রটা একটি মেয়েমানুষ যে কক্ষান্তরে বহন করিয়া আনিতে পারে, ইহা যেন কেহই ভাবিয়া ঠিক পাইতেছিল না। সবাই বলিতে লাগিল, ইহা একটি ভৌতিক কাণ্ড-বিশেষ। দেওয়াল-ঘেরা বাড়ী, ২।৩ দিক ঘেরিয়া ঢাকাই কুটিদের বস্তী ছিল। আগুন লাগার দরুণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল সাহায্য করিবার জন্য, কিন্তু সাহেবের কুঠীতে বিনানুমতিতে কোন্ সাহসে তাহারা ঢুকিবে! এইখানেই গরীব ও ধনীদের মাঝখানে প্রকাণ্ড লৌহ-যবনিকা! শত বিপদপাতেও কেহ কাহারও কাজে লাগে না।

কল্‌তা বাজারের বাসার আর একটি ঘটনা লিখিয়াই এই অধ্যায় শেষ করিব। আমি ত একদিন বিকাল বেলা সমস্ত বাগান ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবিষ্কার করিলাম কি চমৎকার বড় বড় পটল লতা-গাছ ভরিয়া রহিয়াছে! ডালা ভরিয়া আনিয়া দিদিমাকে সেগুলি দিলাম, তিনি ত মহাখুসী, আমারও উল্লাসের অন্ত নাই। দিদিমা মালী, ঠাকুর, চাকরদের বলিতে লাগিলেন, কেহই দেখিয়া শুনিয়া বাগানের জিনিসপত্র ঘরে আনে না, আমাকে খুব তারিফ করিয়া তখনই বসিয়া গেলেন তরকারী কাটিতে। নানা রকমের তরকারী ছিল তন্মধ্যে দিদিমা সদ্য-তোলা পটলও কাটিয়া দিলেন কতকগুলি। ঠাকুর কাকাও খুব তেল, ঘি সংযোগে ডাল করিয়া প্রায় ৪০ জনের তরকারী এক মস্ত কড়াইতে রান্না করিলেন এবং লবণ ইত্যাদি ঠিক হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাঙ্গাইলা ভাইকে দেওয়া হইল। কিন্তু কাঙ্গাইলা ভাই উহা মুখে দিয়াই চিৎকার দিতে দিতে রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিল "কুইনাইন! কুইনাইন!" হায়! হায়! এ কি হইল! ব্যাপার কি! এত সখের তরকারী কেন এমন হইল কেহই কিছু ঠিক পাইতেছিল না, বহু সন্ধান চলিতে লাগিল, এদিকে মায়ের কাণে একথা পৌঁছিতেই তিনি তরকারির ডালা হইতে সদ্য-তোলা পটলের কিয়দংশ লইয়া জিহ্বায় দেওয়া মাত্রই এই অনাসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিলেন। তখন লাগিয়া গেল হৈ-চৈ, আমার বাহাদুরী গেল গোল্লায়। দিদিমা নিজেও খুব হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার নিজের ত্রুটিও ছিল। ঐ পটলগাছগুলি নিজে নিজেই জন্মাইয়া থাকে উহাকে "তিত পটল" বলে, উহা কেহই খাইতে পারে না, দিদিমা

যদি কাটিবার সময় একটু আস্বাদ করিয়া লইতেন তবে আর এতগুলি লোকের এক কড়াই তরকারী নর্দ্দমায় ফেলিতে হইত না। আমি ত ছেলেমানুষ, আমার উপরে আর কোন দোষ বর্ত্তিল না। তবু খুব মন-মরা হইয়াই রহিলাম কয় দিন। কিন্তু বয়সের সঙ্গে ঐ কথাটা মনে হইলেই মালীর ত্রুটির কথা মনে হইয়া যাইত। কারণ, ঐ পটলগাছগুলি কাটিয়া ফেলাই ছিল মালীর কর্ত্তব্য কাজ, সে ত ঐ পটলের গুণ অবগত ছিল নিশ্চয়ই।

কিছুকাল পরেই আমরা কল্‌তা বাজারের কুঠী ছাড়িয়া আসিলাম বাঙ্গালা বাজারের একখানা নূতন বাড়ীতে, বাড়ীখানা তখনও পুরাপুরি শেষ হয় নাই। ভাগ্যক্রমে এ বাসায়ও খুব ভাল দুটি কুলের গাছ ছিল। এ বাসায়ও ছাত্র ও লোকজনের অপ্রতুল ছিল না। আমরা ছোটর দল অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই কুলগাছতলায় যাইয়া হাজির হইতাম, কিন্তু ইহার অতি পূর্ব্বেই কাঙ্গাইলা ভাই কুলগাছতলা হইতে ভাল ভাল কুল কুড়াইয়া লইয়া নিজের দখলে রাখিয়া দিত কিন্তু পরে সেগুলিকে সবাইকে ভাগ করিয়া দিত ও নিজে খাইত। একদিনের একটি ঘটনা মনে হইতেছে, সব ছোট ও ছাত্রের দল দেখিতে পাইল, গাছে অতি অস্বাভাবিক রকমের একটি বড় কুল ঝুলিতেছে; কিন্তু ঐ কুলটি এমন স্থানে ছিল যে কেহ সহজে তাকে পাড়িয়া লইতে পারে না, অথচ ঐ কুলটির প্রতি সকলের মস্ত-বড় লোভ হইয়া গেল। এদিকে স্কুল কলেজের ও অফিস-আলাদের সময় হইয়া গেল, সকলেই খাওয়ার জায়গায় যাইয়া বসিয়া গেলেও মনে মনে ভাবিতে লাগিল, স্কুল হইতে যত শীঘ্র বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ কুলটির মালিক হইবে। এই আনন্দের যুগের মধ্যে একটিমাত্র মানুষ নীরব রহিলেন, কোন উৎসাহে যোগ দিলেন না যে মানুষটি হইলেন বাড়ীর জামাইবাবু অর্থাৎ আমার "সেনজী" (ভগ্নীপতি)। তাহা ছাড়া সকলেই একটু উৎসুক চিত্তে ভাবিতেছিলেন এই অস্বাভাবিক বড় কুলটির কে মালিক হইবে। এদিকে যথাসময়ে যে যার কাজে চলিয়া গেল, চাপ্‌রাশি প্যাদা প্রভৃতি যখন বাসায় অনুপস্থিত তখন কাঙ্গাইলা ভাই তার শকুনের শ্যেন দৃষ্টি লইয়া কুলটিকে দেখিতেছিল। যেই না সকলের চলিয়া যাওয়া তখনই সেই কুলগাছতলায় কাঙ্গাইলা ভাই যাইয়া হাজির! মনে নাই কেন জানি আমার সেদিন স্কুলে যাওয়া হয় নাই। বোধ হয় জ্বর-জ্বর ভাব ছিল গায়ে। আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল ছাখ চুপ করিয়া এই জায়গায় দাঁড়াইয়া থাক্, কুলটা পাড়িয়া আমি তোকেই দিব, এই বলিয়া একটি নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিল। আমার তখন মহা আনন্দ, কুলগাছটা খুব বড় ও গায়ে খুব কাঁটা ছিল, সুতরাং ঐ কুলগুলিকে গাছে উঠিয়া পাড়িয়া লইবার সুযোগ ছিল না মোটেই। হাতের জোরে ঢিল ছুঁড়িয়া যে যার প্রয়োজন মত পাড়িয়া লইয়া খাইত। কিন্তু বহু চেষ্টায় ঐ অস্বাভাবিক কুলটিকে কেহই পাড়িয়া লইতে সমর্থ হইতেছিল না, কিন্তু সকলেই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া

রাখিয়াছিল যে, স্কুল হইতে যত শীঘ্র আসিয়াই ঐ বড় কুলটিকে পাড়িয়া লইবেই লইবে। এদিকে কাঙ্গাইলা ভাই সকলের জল্পনা কল্পনাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ঢিল ছুঁড়িয়া সেই বড় কুলটিকে পাড়িয়া লইতে অতি উৎসাহী হইয়া উঠিল এবং প্রাণপণ ঢিল ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই ঢিল তার লক্ষ্য স্থলে যাইয়া পৌছিতেছিল না। আমাকে নিরাপদ স্থানে দাঁড় করাইয়া প্রাণপণে কাঙ্গাইলা ভাই ঢিল ছুঁড়িতেছিল কুলটাকে লক্ষ্য করিয়া, আমি এদিকে অতি উৎসাহে কুলগাছের নীচে যাইয়া হাজির। কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে গাছের নীচে যাইতে দেখিতে পায় নাই। তার শুধু লক্ষ্য ছিল "বড় কুলটি"। অকস্মাৎ একটি মস্ত বড় ঢিল আসিয়া আমার মাথার উপর পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই বড় কুলটি গাছ হইতে তলায় পড়িয়া গেল; কাঙ্গাইলা ভাই তাড়াতাড়ি কুলটি আমার হাতে দিতে আসিয়াই দেখে সর্ব্বনাশ! আমার মাথা ফাটিয়া ফিন্‌কী দিয়া রক্তের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কাপড়-জামা সব রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে, তখন একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া কাঙ্গাইলা ভাই কাপড় চাপা দিয়া জোরে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিল কিন্তু রক্তের স্রোত কিছুতেই বন্ধ হইল না, তখন নিরুপায় হইয়া কূয়ার কাদা-মাটী সাম্‌নে পাইয়া তাহা দিয়া আমার ক্ষত স্থানটাকে ভরিয়া দিল এবং তাহাতেই রক্ত পড়াটা বন্ধ হইয়া গেল। এখন দারুণ ভয় উপস্থিত হইল, কাঙ্গাইলা ভাইকে সবাই বকাবকি ত করিবেই কত না জানি মারধর করে, এই হইল আমার মস্ত ভাবনা। এত রক্তপাত, ব্যথা বেদনা, কিন্তু আমি কোনরূপ চিৎকার দূরের কথা 'টু' শব্দটি পর্য্যন্ত করিলাম না, অসুস্থ শরীর বলিয়া স্কুলে যাই নাই তা আবার কুলতলায় যাইয়া এই অবস্থা! তাহা আবার কাঙ্গাইলা ভাইর ছোঁড়া ঢিল আসিয়া আমার মাথায় পড়া—সবগুলিই যেন মস্ত বড় অপরাধ-স্বরূপ হইয়া আমাকে বাক্ রোধ করিয়া দিল। কিন্তু এত বড় বিপদ, মাথায় এক ঝুড়ি কাদা-মাটী এত সব ত আর গোপন করা চলে না। আস্তে আস্তে কাঙ্গাইলা ভাই আমাকে লইয়া মার কাছে হাজির হইল। মা সব শুনিলেন ও বুঝিলেন ব্যাপারখানা; তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাহা করা তখনকার একান্ত দরকার তাহাই করিতে লাগিলেন ও দাদামহাশয় দিদিমার কাণে যেন এত বড় ঘটনাটা না যায় সেজন্য খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কারণ, তাহা হইলে কাঙ্গাইলা ভাই খুবই তিরস্কৃত হইত সন্দেহ নাই। একমাত্র দাদামহাশয় দিদিমা ছাড়া ক্রমে সকলেই এই ঘটনাটা জানিয়া গেল। আমি বেহুঁসের মত বিছানায় শুইয়া রহিলাম, কিন্তু সেই কুলটি নাকি তখনও আমার হতেই ছিল।

৪

রাত্রিতে প্রবল বেগে জ্বর আসিল, সে জ্বরে ৩।৪ দিন ভুগিয়া ভাল হইয়া গেলাম ও পরে শুনিলাম, কাঙ্গাইলা ভাইকে সবাই মন্দ বলিয়াছিল, কেন আমাকে গাছের নীচে যাইতে দিয়াছিল। কিন্তু সে দোষ ত আমারই সম্পূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।

এই নূতন বাসায় কুলগাছ ছাড়াও অনেক রকম ফুল ও ফলের গাছ ছিল। এই বাসায় ঢুকিতেই একটি খুব উচ্চ বড় গেইটের ভিতর দিয়া সরু এক ছোট গলি পার হইতে হইত। ইডেনের গাড়ী বড় রাস্তায় ঐ বড় গেইটের সামনেই আসিয়া দাঁড়াইয়া যাইত—আমাদেয় বাসা হইতে মাত্র কয়েক পা ব্যবধানে; আমাদের তাহাতে কোন অসুবিধাই হইত না। আমাদের বাংলার শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুতা মনোরমা মজুমদার (ভবিষ্যত জীবনে ডাঃ নীলরতন সরকারের শ্বশ্রূমাতা ও তটিনী গুপ্তার মাতামহী) খুব শান্তপ্রকৃতি ও স্নেহশীলা ছিলেন, তিনি আমাদের খুব স্নেহ করিতেন। তাঁর এক মেয়ে উর্ম্মিলা আমার সঙ্গে একই ক্লাশে পড়িত; ক্রমে সে আমার পরম বন্ধু হইয়া গেল। গেণ্ডেরিয়ার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক মেয়ে চারুও আমার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল (ভবিষ্যত জীবনে চারুর সুবিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল)। চারু ও উর্ম্মিলা উভয়েই আমাপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিল, সবাই আমাকে খুব ভালবাসিত। বহু যুগ যুগান্তর পরে এক বার উর্ম্মিলার সঙ্গে কলিকাতায় দেখা হইয়াছিল, পত্রের আদান-প্রদান বহুকাল চলিয়াছিল। চারুর সঙ্গে স্কুল ছাড়ার পরে আর দেখা-শুনা হয় নাই। এক বার বহুকাল পরে কলিকাতায় মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। সে সময় চারু আমার কথা নাকি খুব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিল, অর্থাৎ সেই স্কুল-জীবনের বন্ধুত্বকে তখনও মনে রাখিয়াছিল।

স্কুলে পড়া-শুনা ভালই চালাইয়া যাইতেছিলাম, ক্লাশে প্রত্যেক বিষয়েই প্রথম বা দ্বিতীয় থাকিতাম এবং বৎসরান্তে ১ম প্রাইজ লইয়া বাড়ী ফিরিতাম। উর্ম্মিলা ও আমি একটু সহজ সরল অর্থাৎ যাকে বলে হাবা-গোবা। চারু ছিল খুব সার্প মেয়ে। কিন্তু পড়া-শুনায়, খেলা-ধূলায় ও গায়ের জোরে আমি ছিলাম ক্লাশের প্রথম ছাত্রী। ইডেনের গাড়ী সূত্রাপুরে লোহার পুলের এপাড়ে দাঁড়াইত, ঝি নামিয়া যাইয়া গেণ্ডেরিয়ার বাড়ী হইতে চারুকে নিয়া আসিত। তখনকার গেণ্ডেরিয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান গেণ্ডেরিয়ার তুলনা করা অসম্ভব। তখন গেণ্ডারী বনে নানা জীব-জন্তুতে গ্রামখানা ভয়াবহ বলিলেও কোন অত্যুক্তি হয় না। গেণ্ডারী বনের মধ্য দিয়া অতি সরু একটি পায়ে হাঁটার পথ ছিল, সেই পথ বহিয়া ঝি যাইয়া চারুকে লইয়া গাড়ীতে আসিত। আমি কিন্তু শত নিষেধ সত্ত্বেও ঝির সঙ্গ ধরিয়া চারুর বাড়ীতে উপস্থিত! চারুকে লইয়া গাড়ীতে ফিরিতাম। ইক্ষুপাতার তীক্ষ্ণ ধারে অনেক সময় হাত-পা ছরিয়া যাইত এবং রক্ত বাহির হইত; কিন্তু আমার তবু যাওয়ার উৎসাহ কমিত না। উর্ম্মিলাও মাঝে মাঝে যাইত, কিন্তু কাপড়-জামা

ও গায়ের অবস্থা শোচনীয় হয় বলিয়া তার মা তাকে বারণ করিতেন, অবশ্য আমাকেও তিনি বারণ করিতেন। কিন্তু আমি ছিলাম অতি উৎসাহী, তাঁহার নিষেধ আমি মানিতাম না। আমার কেন জানি ইক্ষু-বন দলিত করিয়া সরু ঐ পথটি বহিয়া যাওয়ার অতি উৎসাহ ছিল।

একদিনের একটি ঘটনা আজও বেশ স্মরণে জাগিয়া রহিয়াছে। চারুর বাবা শ্রীযুক্ত নবকান্ত বাবু তাঁর ঘরের বারেণ্ডায় একখানা চৌকীর উপর এক ধারে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছেন, ঘরখানা ছিল হোগ্‌লা পাতার বেড়া ও চাল ছিল 'মাইলা' নামক একরূপ বন তাহা দিয়া ছাওয়া। ঘরের বারেণ্ডায় উঠিতে গেলে মাথা খুব নীচু করিয়া তবে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে পারা যায়। তখনকার দিনে ঘরের রূপ এরূপই ছিল সাধারণ লোকদের। ভিত মাটির, তাহাও খুব নীচু নীচু। এক দিন চারুর বড় দাদা সীতাকান্ত হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই ঘরের দাপনা-ওয়ালা দরজা খানাকে এক নিদারুণ পদাঘাত করিল। উদ্দেশ্য ছিল ঘরে প্রবেশ করিবে, দরজা খানা প্রবল বেগে আপত্তি জানাইয়া সতীকান্তের কপালে সজোরে আঘাত করিয়া স্থির হইয়া রহিল। ব্যথা পাইয়া সীতাকান্ত রাগিয়া আরো দুর্দ্দান্ত জোরে সেই রুদ্ধ ঝাঁপের দরজা খানাকে পদাঘাত করা মাত্রেই পূর্ব্বের অভিনয়। অর্থাৎ ঝাঁপের দরজা খানা অতি বেগে আসিয়াই সীতাকান্তের কপালে দারুণ আঘাত করিল। এবার কিন্তু সীতাকান্তের ক্রোধটা সীমার বাহিরেই চলিয়া গিয়াছিল; সে তৎক্ষণাৎ দুর্দ্দান্ত এক লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপের দরজা খানা স্থানচ্যুত হইয়া মোটা একটি বাঁশের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িল সীতাকান্তের মাথার উপরে—ইহাতে সীতাকান্তের মাথার কিয়দংশ কাটিয়া যাইয়া খুব রক্ত পড়িতে লাগিল।

এত সব ঘটনার মধ্যে নবকান্ত বাবু নীরবে দ্রষ্টারূপে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পরে অতি ধীর স্থির কণ্ঠে পুত্রকে বলিলেন, "ত্যাখ, যে যেমন ব্যবহার করে, সে সেইরূপ ব্যবহারই প্রতিদানে পায়। তুই দরজাখানাকে ধীরে-সুস্থে খুলিয়া ঘরে ঢুকিলে আজ তোর এই দুর্দ্দশা ভুগিতে হইত না এবং ঘরের দরজাখানাও নষ্ট হইত না।" এই ঘটনাটি ঘটিয়া গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। যত দূর মনে পড়ে সীতাকান্তের বরস তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। চারু একটু বিমনা হইয়া গেল, অন্য লোকে তার দাদার স্বভাবখানার পরিচয় পাইয়া গেল এই বলিয়া। এদিকে ঝি ত' আর ঐ ব্যাপারের জন্য বেশী বিলম্ব করিতে পারিবে না, চারু তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে চলিয়া আসিল ও গাড়ীতে ক্ষুণ্ণ মনে বসিয়া রহিল। শুনিয়াছি সীতানাথের ঐরূপ অকাণ্ড-কুকাণ্ড করার খুবই অভ্যাস ছিল এবং ছেলের মধ্যে তার সুনাম ছিল না। পরবর্ত্তী জীবন তার কিরূপ শোভনীয় হইয়াছিল সে খবর আমরা জানি নাই; তবে নবকান্ত বাবুর অন্য ছেলে ঐরূপ ঝোপের ঘরের বদলে অতি সুন্দর ফল ও ফুলের বাগানসহ সুরম্য দালান-কোঠাওয়ালা বাড়ী করিয়া-

ছিল। উত্তর জীবনে নবকান্ত বাবু সে সব দেখিয়া গিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না।

আর একটি কথা খুব মনে পড়ে, যেখানে আমাদের ইডেনের গাড়ীখানা লোহার পোলের নীচে দাঁড়াইয়া থাকিত—তার এশাপে-ওপাশে নিঃস্ব অবাঙ্গালী মুসলমানদের বস্তি ছিল; সুত্রাপুরের থানাটি একটু দূরে হয়ত ক্ষীণ ভাবেই ছিল, বর্ত্তমানের অনুরূপ কিছুই ছিল না। সে আজ ৬৫।৭০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। গাড়ী-খানা লোহার পোলের নীচে দাঁড়াইতেই প্রতি দিন এক বৃদ্ধাকে তার ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া খুব ছোট ছোট চিংড়ি মাছ কুটিতে দেখিতে পাইতাম। তখন-কার দিনে এক আধ পয়সায় ঐ মাছ নাকি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত বলিয়া সকলেই বলাবলি করিত। বৃদ্ধা বেচারী প্রায় প্রতিদিনই আমাদের দিকে সস্নেহে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিত "আমি মাছ পকাই তোমরা খাউঙ্গে" ইত্যাদি, আমরা ত ছোটর দল হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া যাইতাম। কিন্তু বৃদ্ধার হয়ত মনে হইত তার এই প্রতি দিনের নিমন্ত্রণটা একদিনও রক্ষা করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যে একেবারেই অসম্ভব ছিল তাহা বৃদ্ধার মনের মধ্যে একেবারেই স্থান পাইত না, তাই বৃদ্ধা সকাতরে প্রতিদিনই তার একান্ত প্রাণের নিমন্ত্রণের নিবেদনটি জানাইয়া যাইতেই থাকিত। মনোরমা শিক্ষায়িত্রীর বাসা ছিল আমাদের বাসার অতি নিকটে, মাঝে মাঝে বই হাতে করিয়া যথা সময়ে আমি তাঁদের বাসায় চলিয়া যাইতাম। উর্ম্মিলা ও শিক্ষয়িত্রীর সহিত ওখান হইতেই ইডেনের গাড়ীতে স্কুলে চলিয়া যাইতাম। এক দিন দেখিতে পাইলাম একটি যুবক খাইতে বসিয়াছে, বিমলা দিদি অর্থাৎ উর্ম্মিলার মেজদিদি পরিবেশন করিতেছে ও নানারূপ গল্প-গুজব হাসি-তামাসা করিতেছে। শিক্ষয়িত্রীর আর ত বিলম্ব করা চলে না। তাড়াতাড়ি বিমলা দিদিকে যাহা যাহা বলার ভাল ভাবে উপদেশ দিয়া হাত-মুখ ধুইয়া গাড়ীর দিকে চলিলেন। উর্ম্মিলার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা বোন নির্ম্মলা দিদি যেন লজ্জায় জড়সর হইয়া এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করিতেছে দেখিতে পাইলাম। যুবকের খাওয়ার সামনে চিংড়ি মাছ ও আপু দিয়ে এক বাটি ঝোল ও এক বাটি ডাইল পরিবেশন করা হইয়াছে, আরো কিছু ছিল কি না তাহার খবরের আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই উর্ম্মিলাকে ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেই উর্ম্মিলা বলিল, ঐ ছেলেটির নাম নীলরতন সরকার, সম্প্রতি ডাক্তারী পরীক্ষায় খুব কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে এবং ঐ ছেলেটির সঙ্গে নির্ম্মলা দিদির বিবাহ হইবে, নিশ্চয় হইয়াছে। মেয়ে দেখিতে ও অন্যান্য কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে নীলরতন সরকার নিজেই আসিয়াছেন। নির্ম্মলা দিদির বয়স তখন ১৬।১৭ হইতে পারে, দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলা যায়। যেমন রং তেমন গড়ন ও মুখখানা ছবির মত সুন্দর ছিল। ঈষৎ কোঁকড়ান একরাশ কালো চুল, এ সমস্ত মিলাইয়া নির্ম্মলা দিদি একটি

পদ্মিনী নামের যোগ্যতা বহন করিয়া চলিয়াছিল। ঐ নীলরতন সরকারই তাঁর ভবিষ্যত জীবনে ডাঃ নীলরতন সরকার নামে আখ্যাত হইয়া কত শত শত লোককে নিরাময়ের দিকে পৌছাইয়া দিয়াছেন।

ইডেন স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বরিশালের সঙ্গীদের অভাব যেন ঘুচিয়া গেল এবং নূতন এক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া খুব আনন্দের মধ্য দিয়াই আমাদের দিনগুলি যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় দাদামহাশয়ের মাসিক ভাড়া করা (মফঃস্বলে যাওয়ার) গ্রীনবোটে চড়িয়া আমরা ছোটরা বুড়ী-গঙ্গার সানাতে আনন্দে ঘুড়িয়া বেড়াইতাম ও এর পরে প্যাদা বা চাপরাশিদের সঙ্গে আমরা যথা সময়ে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। এখন আর সেই একা একা জাহাজে ভ্রমণের অনুযোগ শুনিতে হইত না, কারণ আমরা সব ছোটর দলেরা সবাই মিলিয়াই বোটে চড়িয়া বেড়াইতাম। বরিশালে ছিল বহু পাড়ার দল লইয়া বন্ধুত্ব আর ঢাকায় গণ্ডীবদ্ধ বাড়ী ও শুধু বাড়ীর লোকের সঙ্গেই যত কিছু দহরম-মহরম হৈ-হল্লা চলিত। ঠাকুর-খুড়ার মফঃস্বলে যাওয়ার গ্রীনবোট খানাও সাজান-গুছান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। দাদামহাশয়ের বোট খানা খুব বড় ছিল, কিন্তু অনাবশ্যক আসবাব পত্র বেশী ছিল না। কিন্তু ঠাকুর খুড়ার বোটখানা খুব বেশী বেশী আসবাব পত্রে সাজান থাকিত। আমরা সময় সময় অদল-বদল করিয়াও ঠাকুর-খুড়ার বোটে চড়িয়া বেড়াইতাম।

এক দিন হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, দিদিমা আমাকে ও ছোট কাকাকে লইয়া গ্রামের বাড়ীতে (সোনারং) নূতন দালান উঠিতেছে তাহা দেখিতে যাইবেন। আমাদের ত মহা আনন্দ, মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে নৌকাখানা আসিয়া বাড়ীর ঘাটে পৌছামাত্র বাড়ীতে মস্তবড় হৈ-চৈ লাগিয়া গেল। নৌকা হইতে বাড়ীতে পৌছামাত্র দৃশ্য দেখিয়া আমার ত চক্ষু স্থির হইয়া গেল! কি যে এক অভিনব পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সেই যে অতি বড় ঘরখানা বহু কোঠা ও বারেণ্ডা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এই ঘরেই ত দিদি ও কাঙ্গাইলা ভাইর বিবাহ, মহা আনন্দ সবই যেন চক্ষের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। খুব বড় দালান উঠিতেছে সুতরাং ঘর-দুয়ারের বহুবিধ অদল-বদল হইয়া গিয়াছে, আমাদের ছোটদের ত এসব কিছুই জানা ছিল না,—ঐ সব পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনটা যেন একেবারেই মুসরিয়া গেল। ৩৬ খানা ঘরের মণ্ডিত বাড়ীর এইকি শ্রী হইল! দালান উঠিতেছে—লম্বা লম্বা বাঁশ গাড়া হইয়াছে, তার উপরে ফাচাং বাঁধিয়া অসংখ্য রাজ-মজুর ইট-শুরকী লইয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে রস পাইলাম না কিছুই আমি। আরো একটা অদ্ভুত দেখিলাম—খুব একটা লম্বা বাঁশ পুতিয়াছে ও তার মাথায় এক খানা ভাঙ্গা ঝুড়ি, একখানা ছেঁড়া জুতা ও একটি ভাঙ্গা পিছা সগৌরবে ঝুলিতেছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে আর কিছুই কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না—কেবল দেখিয়া চলিলাম মাত্র।

একদিন সকাল বেলা হঠাৎ ঘুমের মধ্যে দিদিমার কান্নার শব্দ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া দিদিমার কাছে ছুটিয়া গেলাম, যাইয়া দেখি তিনি বাবার নাম ধরিয়া নানারূপ বিলাপ করিয়া কান্দিতেছেন। এবার বাড়ীতে আসিবার পথে লোক-জনকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন প্রকারেও কেহ 'শ্যামপুর' নাম উচ্চারণ না করে, সে বিষয়ে নৌকার লোকজনরাও খুব সতর্ক ছিল তবে কেন দিদিমা এভাবে আকুলি ব্যাকুলি হইয়া কান্নাকাটি করিতেছেন, তাহা আমি কিছুই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পরে বুঝিতে পারিলাম, এই যে এত বড় দালান বাড়ী হইতেছে, এখন দিদিমার সেই সুযোগ্য পুত্র কোথায় রহিল, এই গভীর শোক মাতৃহৃদয়ের চির জীবনের সাথী ও এই শোক-দুঃখ বিরামবিহীন। ৫।৭ দিন পরেই দিদিমা আমাকে ও ছোট কাকাকে লইয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাসায় আসিয়া চুপি চুপি মাকে বলিলাম—মা বাড়ীখানা খুবই খারাপ হইয়া গেল! এত বড় ঘর ও কত কত ঘর-দুয়ার সবই ত নষ্ট হইয়া গেল। মা পরে ধীরে সুস্থে আমাকে একে একে সব বুঝাইতে লাগিলেন এবং সেই ভাঙ্গা ঝুড়ির, ছেঁড়া জুতা, ভাঙ্গা ঝাঁটার ব্যাখ্যাও ভাল করিয়া বলিয়া দিলেন। বলিলেন, উহা রাজ-মজুরদের একটা বিশ্বাস এই যে, ঐরূপ একটা পোতা থাকিলে তাহারা কাজ করিবার সময় উঁচু হইতে পড়িয়া যাইবে না, দালান শেষ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা নামাইয়া ফেলিবে। দালান দেখিয়া তোমার এখন ভাল লাগে না, কিন্তু সম্পূর্ণ হইয়া গেলে দেখিবে কত সুন্দর ও কত ভাল লাগিবে। মাতৃবাক্য শিরো-ধার্য্য, মনের সকল গ্লানি যেন ধুইয়া-মুছিয়া গেল।

ইহার পরে এক বৎসর বাদে দালানের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় দাদামহাশয় কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়া গৃহে-প্রবেশের দিন ধার্য্য করিয়া বাসার সকলকে লইয়া বাড়ীতে যাত্রা করিলেন ও ছেলে-মেয়ে আত্মীয়স্বজন সকলকেই উপস্থিত থাকিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। বাড়ীতে উঠিয়াই দেখি এ কি! এই যে সেই বুড়ি গঙ্গার পাড়ে—"নর্থ ব্রুক্ হল"! বলিয়া কতই আনন্দে তার আসে-পাশে ঘুরিয়া বাগানের মালী হইতে কত গোলাপ ফুলের, পাতাবাহারের তোড়া সংগ্রহ করিয়া বাসায় ফিরিতাম। এই যে সে রকম রংরূপ ধরিয়া আমাদের বাড়ীখানা সাজিয়া রহিয়াছে, তখন ভাবিলাম মা'ত সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। এখন বাড়ীখানা কত সুন্দর দেখাইতেছে, এখন আর সেই বড় ঘরখানার দুঃখ আমার রইল না। ক্রমে দেখিতে দেখিতে সকল আত্মীয়-স্বজনগণ আসিয়া বাড়ীখানাকে একটি আনন্দের দোলমঞ্চ করিয়া দোলাইয়া দিল। দূর-দূরান্তের বহু আত্মীয়স্বজন আসিয়া এই শুভানুষ্ঠানে যোগ দিতে ভুলিল না।

যথা সময়ে গৃহদেবতার যজ্ঞানুষ্ঠান পর্ব্ব শেষ করিয়া পুরোহিত প্রথমত কর্ত্তা ও

গৃহিণীর কপালে যজ্ঞের ফোঁটা পরাইয়া দিলেন, ও ঐ ফোঁটা সবাইর কপালে দিতে সুরু করিয়া দিলেন। সথা সময়ে ফোঁটা দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করিয়া পুরোহিত দিদিমার মাথায় একটি যাত্রাঘট স্থাপিত করিয়া দাদামহাশয়ের হাতে একখানা বড় রামদাও দিয়া সকলকে সহ এই দালানের চতুর্দ্দিকে সাতবার ঘুরিতে আদেশ করিলেন। আমরা ছোটর দল ত কেবলই ছুটিয়া চলিলাম। দাদামহাশয়ের চারদিকেই ছিল প্রখর দৃষ্টি, তিনি খুব জোরে হাঁক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কে কোথায় সকলেই যজ্ঞের শান্তি জল, আশীর্ব্বাদী ফুল লও", সকলেই হাত পাতিয়া শান্তি জল লইয়া মাথায় মুখে দিতে লাগিল। সে এক মস্ত ব্যাপার আজও মনের মধ্যে যেন গভীর ভাবে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। এখন আসিল দালানের চতুর্দ্দিকে সাতবার ঘুরিয়া পরে গৃহে প্রবেশ করা। সর্ব্বপ্রথমে 'রামদা' হাতে দাদামহাশয় দাঁড়াইলেন, পরে দিদিমার মাথায় পল্লবযুক্ত মঙ্গল-ঘট, পর পর পূর্ণকুম্ভ বরণ-ডালা সহ ছেলেরা, পুত্র-বধূরা ও তাঁহার অতি প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয় (তাঁহার মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যার পুত্রদ্বয় ইন্দ্রভূষণ ও রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত) সহকারে সারিবদ্ধ ভাবে বাদ্য বাজনার সহিত যেন একটি মিছিল চলিতেছিল। দাদামহাশয় কিন্তু পিছন দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন কাঙ্গাইলা ভাই, সূর্য্যকাকা, ঠাকুরকাকা প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে কিনা। তাঁহার যে এই সকলই চাই, এদের ছাড়া যে তাঁহার শান্তি নাই ও থাকিতে পারে না, ইহা ছিল তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা। এখানে তাঁহার জাত্যভিমান বা উঁচু-নীচের কোন প্রশ্নই মনের মধ্যে ঠাঁই পাইতেছিল না। সবাই সমান, সকলকেই তিনি সমান ভাবে লইয়া শান্তিতে থাকিতে চান, কাহাকেও বাদ দিয়া বা দূরে সরাইয়া নহে! উহাদের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল এবং উহাদের অমঙ্গলে নিজের অমঙ্গল বলিয়াই তাঁহার মনের মধ্যে গাঁথা ছিল, সুতরাং সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠানেই উহাদের কাছে টানিয়া লইতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিতেন না। যথাসময়ে সাতবার দালান প্রদক্ষিণ করার পরে সবাই গৃহে প্রবেশ করিল, ও মহসমারোহে বহু বহু লোকজন ও গরীব দুঃখীদের খুব ঘটা করিয়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

৫

কয়েক দিন পরেই দাদা মহাশয়ের ছুটি ফুরাইয়া আসিল, সকলেই যে যাঁহার কর্মস্থলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। আমরাও যথাসময়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ঢাকাতে সকালের দিকে ৪ জন মাষ্টার আসিত সকল ছাত্রদের পড়াইতে। প্রায় ৪ জন করিয়া এক এক জন মাষ্টারের কাছে পড়িতে বসিত। ছোট দিদি (সুমতি), ছোট কাকী, আমি ও সুনীতি, আমরা এক মাষ্টারের

কাছেই সকাল ও সন্ধ্যায় পড়িতাম। পড়াশুনা বেশ ভাল ভাবেই চালাইয়া যাইতাম, ইহাতে বাসার মাষ্টার, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও মাষ্টারগণ আমাকে খুব স্নেহ করিয়া পড়াশুনার সাহায্য করিয়া দিতেন। সার কে. জি. গুপ্তের পিতা শ্রীযুত কালীনারায়ণ রায় আমাদের ছোটর দল লইয়া খেলিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত (ডাক নাম পানি বাবু) তিনি আমার ঠাকুর খুড়ার (শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সেন) সমবয়সী ও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহারা উভয়েই ঠিক নিজ সহোদরের ন্যায় ব্যবহার ও আদান-প্রদান করিতেন, সেই সূত্রেই আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে অতি সুন্দর একটি সহজ-সরল অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিগড় গড়িয়া উঠিয়া যত দিন ঠাকুর-খুড়া ও পানি কাকা জীবিত ছিলেন কখনও তাহা শিথিল হয় নাই। সার কে. জি. গুপ্তের কন্যা হেমকুসুম আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড ছিল কিছু দিন। ঢাকাতে কালীনারায়ণ বাবুর নিজের মস্ত বড় বাড়ী ছিল। বহু দিন সে বাড়ীতে আমরা ছোটর দল যাইয়া খেলা-ধূলা করিতাম। কালীনারায়ণ বাবু আমাদের লইয়া বেশ খেলায় মত্ত হইয়া যাইতেন।

কালীনারায়ণ বাবু অতি সৎ ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। মস্তবড় জমীদার হইলেও তিনি অতি সহজ-সরল ভাবে জীবন যাপন করিতেন। বিলাসিতার ধার ধারিতেন না। কালীনারায়ণ বাবুর দৌহিত্র অতুলপ্রসাদ সেন ঢাকাতেই পড়াশুনা করিতেন এবং তার এক খুড়তুত ভাই সত্যপ্রসাদ সেনও কালীনারায়ণ বাবুর বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। তাহারা মাঝে-মাঝে আমাদের ছোট দলের মধ্যে খেলায় হামলা দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কালীনারায়ণ বাবু সেটাকে কিছুতেই বরদাস্ত করিতেন না, কারণ আমরা সকলেই ছোট ছোট মানুষ আর উহারা ১৪।১৫ বৎসরের ছেলে। উহাদের সঙ্গে আমরা কিছুতেই পারিয়া উঠিব না।

এদিকে সন্ধ্যার পরক্ষণেই সবাইকে হাতমুখ ধুইয়া প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইত এবং প্রার্থনাতে পড়াইবার শিক্ষক আসিত, যে যার পড়িবার ঘরে চলিয়া যাইত। এই ভাবে কত ছুটিতে আমরা বহু বন্ধু মিলিয়া কালীনারায়ণ বাবুর বাড়ীখানাকে আনন্দ-মুখরিত করিয়া তুলিতাম। পানি কাকা ছিলেন অতি সহজ সরল ফূর্ত্তিবাজ লোক; কত শত কথার মধ্য দিয়া, এবং নানারূপ হরবোলা ডাকের মধ্য দিয়া নানারূপ বিচিত্র শব্দ করিয়া আমাদের ছোটদের একেবারে মাতাইয়া তুলিতেন। তিনি অতি উচ্চদরের চিত্রকর ছিলেন। সীতার বনবাস, প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক ইত্যাদি করিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া নাটক অভিনয়ের জন্য একটি ষ্টেজ তৈয়ার করিলেন এবং নিজ হাতেই নাকি বহু 'সিনারী' অতি নিপুণতার সহিত চিত্র করিয়া ফেলিলেন। সকলেই ঐ সকল চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, শতকণ্ঠে অজস্র প্রশংসা

করিতে লাগিল। সীতার বনবাস নাটকে বাল্মীকি তপোবনের চিত্রটি যেন আজও আমার বক্ষে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কি অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত সেই বাল্মীকির তপোবন! তারপর লক্ষ্মণ যখন সত্য ঘটনা সীতার নিকট উদ্ঘাটন করিয়া অর্থাৎ এই তপোবন শুধু তাকে দেখাইতে আনে নাই জন্মের মত সীতাকে এখানে রাখিয়া যাইতে আসিয়াছে; সে চিত্র যে কি দুঃখজনক, হৃদয়-বিদারক ব্যাপার তাহা মনে হইলে এখনও যেন সত্য সত্যই কান্না আসিয়া যায়। এই চিত্রটি দেখিয়া বহু স্ত্রী পুরুষরাই কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। আমাদের ছোটর দলের ত কথাই নাই; প্রহ্লাদ চরিত্রে প্রহ্লাদের অপরিসীম অটল ঈশ্বরভক্তি এবং তার পিতৃ কর্ত্তৃক অপরিসীম লাঞ্ছনা ও মৃত্যু ঘটাইবার জন্য কত মর্ম্মান্তিক চেষ্টা! কিন্তু তবু প্রহ্লাদের অটল অচল ঈশ্বরে ভক্তি! শৈশব মনে এই ঘটনাটি চক্ষে দেখিলে মনে একটি বিশুদ্ধ ভাবের উদয় না হইয়াই পারে না। ষ্টেজের মধ্যে জীবন্ত অতিকায় হাতী আসিল, মাহুতটি হাতীর ঘাড়ের উপর। প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া দিয়া নিষ্পেষিত করিবার পিতার আদেশ! ছোট ছিলাম, মনটা যেন একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। হাতীটিও জীবন্ত সে কথারও ভুল নাই। কিছুতেই এই অলীক থিয়েটারটিকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া যেন লইতে পারিতেছিলাম না। পানি কাকার সৌজন্যে জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম থিয়েটারের নাম শুনিলাম ও থিয়েটার দেখিলাম। শুধু আমি কেন, অনেক স্ত্রী-পুরুষই এই প্রথম নাট্যাভিনয় দেখিলেন।

পানি কাকা ছিলেন সাদাসিধে সদানন্দ পুরুষ, বিলাসিতা বলিয়া তাঁহার কোন বালাই ছিল না। সদানন্দ পিতার সদানন্দ পুত্রই ছিলেন তিনি। ব্রাহ্ম সমাজের লোক বলিয়া আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিভিন্নতা দেখিতে পাইতাম না। সেই দিনের ঢাকার হুলী খেলা ও হুলীর রঙ মাখান অপূর্ব্ব বেশ। রঙ্গে রঙ্গে বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত নাক মুখ মাথা পানি কাকাকে চেনা যাইত না। হুলীর দিনে রাস্তা দিয়া হৈ-চৈ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন ঠাকুর খুড়াও ঠান্‌খুড়ীর উদ্দেশ্যে, তাহা করাই ছিল বিশেষ করিয়া পানি কাকার লক্ষ্যস্থল। পানি কাকার দুই পকেট ভরা আবীর কুম্‌কুম্ দুই বিশাল বগলে গোলা রঙ্গের দুটি বোতল, বোতলের মুখ ছিল নারিকেল শলায় বন্ধ করা তাহাতে ছিট্‌কাইয়া ছিট্‌কাইয়া রঙ্গ দিতে খুব সুবিধা হইত। তাহাতেও তাহার তৃপ্তি ছিল না—হাতে করিয়া লইয়া আসিতেন মস্ত বড় গোলা রঙ এক ঘটি। ঠাকুর খুড়াও সোরগোল শুনিয়াই অফিস-রুমে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে ডাক হাঁক চলিতে লাগিল, দাদামহাশয় উচ্চস্বরে উমেশ! উমেশ! বলিয়া বাহিরে আসিবার জন্য ডাক দিতে লাগিলেন! কিন্তু পানি কাকাও এক মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিলেন না—তাড়াতাড়ি হাতের ঘটি ও বগলের বোতল দু'টি ঠাকুর-খুড়ার অফিস-রুমের দুয়ারে

নামাইয়া রাখিয়াই বিশাল হাতে গায়ের জোরে ঘরের দরজাখানাকে ধাক্কা দিতেই দুয়ারের খিলখানা দুই টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং ঘরে ঢুকিয়াই ঠাকুর-খুড়াকে হাতে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন। আমরা ছোটর দল ত মহোল্লাসে মত্ত হইয়া গেলাম।

পানি কাকার চতুর্থ বোনের বিবাহের কথাটিও বেশ মনে পড়িতেছে। বিমলা পিসিমার বিবাহ বিক্রমপুরে তেলীরবাগ গ্রামের স্বনামধন্য দুর্গামোহন দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন দাশগুপ্তের সহিত স্থির হইয়া গেল। যথাসময়ে মহাসমারোহে ব্রাহ্মমতে বিমলা পিসিমার বিবাহ হইবে। বিবাহের দিন খুব সুসজ্জিত এক ল্যাণ্ডো গাড়ীতে করিয়া বর এবং বরযাত্রীরা যথাসময়ে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইল। বিবাহ-সভায় উভয় পক্ষেরই বহু লোক জন উপস্থিত হইল। যথারীতি গান-বাজনা ও সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি বেশ চলিতেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের পুরোহিত যথাসময়ে তার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এদিকে প্যাণ্ট কোট পরা বর ত আসিয়া বিবাহ-সভায় দাঁড়াইয়া গেলেন, সভার লোক জন সবাই সতৃষ্ণ নয়নে সদ্য বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার জামাইকে দেখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সেদিনে বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার ছেলে গণ্ডায় ২ মিলিত না, দু'একটি মাত্র পাওয়া যাইত। হঠাৎ দেখা গেল কালীনারায়ণ বাবু তাঁহার ড্রইং রুমে ঢুকিয়াই ক্ষণকাল পরেই একখানা মূল্যবান গরদের ধুতি ও একটি গরদের কোট লইয়া সভার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও হাত বাড়াইয়া ঐ সবগুলি ভাবী জামাতার দিকে আগাইয়া ধরিলেন, এদিকে এ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই যেন একটু আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। দুর্গামোহন দাশও পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। সত্যরঞ্জন কিন্তু স্মিত হাস্যে তার ভাবী শ্বশুরের হাত হইতে একটি একটি করিয়া সভার মধ্যেই পরিধান করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে ইহা কোনরূপেই অসভ্যতার পর্য্যায়ে পড়িত না অর্থাৎ কাপড় বদলাইতে কক্ষান্তরে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। সত্যরঞ্জন ছিল অতিশয় বলিষ্ঠ অর্থাৎ খুব মোটাসোটা, কোটটি গায়ে দিতেই দেখা গেল কোটের নীচের দিকের কয়েকটা বোতাম বন্ধ করা যাইতেছিল না, ইহাতে সভার অনেকেই মুখ টিপিয়া ২ হাসিতেছিল। ইহাও আমার খুব মনে আছে। ভাবী জামাই যে এই ভাবে খুসী হইয়া তাঁর দেওয়া বর-বেশটি গ্রহণ করিল ইহাতে সভাস্থ সকলে ও কালীনারায়ণ বাবু খুবই খুসী হইলেন, তখনকার দিনের ছেলেরা বিলাত গেলেই একটি 'চীজ' হইয়া দেশে ফিরিত, কিন্তু সত্যরঞ্জন খুব খাঁটি ভাবেই সকল বিপদ-মুক্ত হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিলেন। কালীনারায়ণ বাবু ব্রাহ্ম হইলেও তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁর ছেলে-মেয়েদের বৈদ্যবংশেই বিবাহের আদান-প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় তখনও জাত্যভিমানকে নিঃসংশয়ে উড়াইয়া দিবার মত শক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

আর একটি কথাও খুব মনে পড়ে, দিদিমা এত গোঁড়া হিন্দুয়ানী ভাবাপন্ন হইয়াও কালীনারায়ণ বাবুর স্ত্রী যখনই আমাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিতেন তখনই দেখিতাম দিদিমা ও পানি কাকার মা এক পাথরে বসিয়াই খাওয়া-দাওয়া করিতেন। নিরামিষ খাইতেন দু'জনেই, কারণ—দিদিমার বিধবা পুত্রবধূ ও পানি কাকার মার ছিল বিধবা কন্যা। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে এক পাত্রে বসিয়া খাওয়ার প্রচলন ছিল মেয়েদের মধ্যে। যত দিন দাদা মহাশয় দিদিমা জীবিত ছিলেন তত দিন পর্য্যন্ত দেশের বাড়ীর আমের আচার, মোরব্বা, আমচুর ও ক্ষীরের আমসত্ত্ব সকল ছেলেদের জন্য পার্শেল করিয়া পাঠাইয়া দিতেন, তখনই দেখিতাম পানি কাকার পার্শেলটির ওজন সকলের চেয়ে বেশী করিয়া দেওয়া হইত। পর যে এমন করিয়া আপন হইয়া যাইতে পারে তাহা এই সর্ব্বপ্রথম জানিলাম ও বুঝিলাম।

আমাদের এই বাংলা বাজারের বাসার সম্মুখে একটু অপরিসর জমি ছিল, সেই চত্তরটুকুতে বিকাল বেলা একটি আনন্দের মজলিস্ বসিয়া যাইত। ইজিচেয়ার ও চেয়ারে ঐ স্থানটুকু সাজাইয়া রাখা হইত প্রত্যহ। দাদামহাশয় অফিস হইতে ফেরার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঐ চত্বরখানাতে আসিয়া বসিতেন ও ক্রমে ক্রমে ২।১ জন করিয়া লোকজনের আবির্ভাব হইতে থকিত। তন্মধ্যে দেখিতাম আমাদের সামনের রাস্তার উপরে বড় গেইটের উপরের একটি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেন সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন। ইঁহারা প্রায় প্রতিদিনই উপস্থিত থাকিতেন। কোন কোন দিন রামসুন্দর বসাক (বাল্য-শিক্ষা রচয়িতা) আসিতেন, কোন কোন দিন ঢাকার সুগায়ক চন্দ্রনাথ রায় (আমার মার কাকা) এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ভগবান সেতারীর আবির্ভাবও হইত। যেদিন চন্দ্রনাথ রায়ের সুমধুর কণ্ঠে চারি দিক ভরিয়া উঠিত সেদিন ছোটর দল সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত; বিশেষ করিয়া আমার পিস্‌তুত ভাই ছোট দাদা রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত খুবই মাতিয়া যাইতেন এবং ঐ গানের পদ, সুর, তাল, মানকে আয়ত্তে আনিতে খুব চেষ্টা করিতে থাকিতেন। ছোট দাদার গানের উপর বেশ একটু অধিকার ছিল এবং বেশ গান করিবার ক্ষমতাও ছিল। এদিকে ভগবান সেতারীর বাজনায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যাইত চারি ধারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চত্বরখানা অপরিসর ছিল, তাই অন্যান্য লোকজনরা দালানের সিঁড়ির উপরেই দাঁড়াইয়া কেহ বা বসিয়া গান ও সেতার বাজনা শুনিত। আমি কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সেতার বাজনার মূলগত মাধুর্য্যটি উপভোগ করিবার মত জ্ঞানলাভ করি নাই অর্থাৎ টুং-টাং ও ঝন্‌ঝনারের বাহারকে বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু চন্দ্রনাথ রায়ের গানে বিমুগ্ধ হইয়া যাইতাম। চন্দ্রনাথ রায়ের গান সমাপ্তির পরেও যেন কিছুক্ষণ তার গলার সুমধুর স্বরের রেশটুকু চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া থাকিত। দাদামহাশয় ছিলেন আনন্দপ্রিয়, তাঁহার নামের

সঙ্গে মনের খুবই সাদৃশ্য ছিল। আমোদ উৎসবের সময় তিনি অবসর করিয়া আমাদের সকলকে গাড়ী করিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। ঢাকার সুবিখ্যাত বনবিহার, এক্রামপুর ইত্যাদি স্থানের ঝুলন, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমীর মিছিলের ত কথাই ছিল না। তাহা ছাড়া ঢাকার গণি মিঞা নবাবের মহরমের নিমন্ত্রণেও আমাদের ছোটদের লইয়া হুস্‌নী দালানে যাইতেও তাঁহার দ্বিধা ছিল না।

মহরমের সুন্দর তাজিয়া দেখিয়া আমরা খুব আনন্দ পাইতাম। সেখানে মাঠের মধ্যে সেদিন গরীব-দুঃখীদের খিচুড়ী খাওয়ান হইত। হাজার হাজার লোক সেদিন পেট ভরিয়া খাইয়া যাইত, হুস্‌নী দালানের কাছে মাঠের মধ্যে বসিয়া। মার কাছে মহরমের ঘটনাটি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, সেই নির্ম্মম ঘটনার দিনটিকে সেদিন মনে পড়িয়া যাইত। এখন হিন্দু মুসলমানে বিবাদমান ঝগড়া-ঝাটি খুনা-খুনির কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই ও জানিতেছি, তখন কিন্তু সে সবের বিন্দুমাত্রও কেহ শুনিতে বা জানিতে পারে নাই। কিন্তু তখন ঐ মুসলমানের মধ্যে দু'টি ভাগ ছিল শিয়া ও সুন্নী, তাদের মধ্যে খুব বিবাদ বিসম্বাদ চলিত তাহা ছোট কালেও আমরা বেশ শুনিতে পাইতাম। নবাব গণি মিঞার বাড়ী হইতে তার বাগানের রকমারী বহু ফল ঝুড়ি ভরিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিত তাহা খুব মনে পড়ে। আর মনে পড়ে রমনার মাঠে নবাবের চিড়িয়াখানা। যখন সবাই মিলিয়া দেখিতে যাইতাম, কত জীব-জন্তুর সমাবেশ; কত রকম পাখী, বানর, বাঘ, সিংহ। বিশেষ করিয়া সেই চিড়িয়াখানার মাঠ জুড়িয়া যখন বিরাট উটপাখীগুলি দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তখন খুবই আনন্দ পাইতাম। তার পরে বাঁধান বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে দেখিতাম কত লাল, সাদা, কালো রং-বেরংয়ের মাছের খেলা, আমরা সেই চৌবাচ্চার জলে 'খই' ছিটাইয়া দিতাম, তৎক্ষণাৎই দেখিতাম মাছগুলি জলের মধ্যে থাকিয়াই যেন আমাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িত, আমরাও ঐ তামাসা দেখার জন্য বেশী বেশী 'খই' ছিটাইয়া দিতাম। বাঁদরদেরও প্রচুর কলা দিতাম ও উহাদের নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া খুব আনন্দ পাইতাম। গণি মিঞার বড় ছেলের আবার একটি ভিন্ন বাগান ছিল, তাহা ঐ চিড়িয়াখানার কাছাকাছিই ছিল, সে বাগানে কত ফুল ও ফলের গাছ তার যেন আর অন্ত ছিল না। সে বাগানে 'পান্থ-পাদপ' গাছ ছিল, একটু খোঁচা দিলেই পরিষ্কার জল বাহির হইত। একটি কৃত্রিম পাহাড়ও ছিল, আমরা সে পাহাড়ে দৌড়াইয়া ছুটিয়া যাইতাম, কে কাহার আগে যাইব এই ছিল মনের ভাব। কালের স্রোতে আজ কিন্তু সবই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও আর সেই চিড়িয়াখানা বা ফুলের ও ফলের বাগানের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না—শুধু আছে, মাঠ! মাঠ! মাঠ! ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখাও ছিল একটি অতি বড় রকমের আনন্দের আস্বাদন। জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই দলে দলে বাবুরাও ছোট ছেলে-মেয়েরা হাতীর পিঠে চড়িয়া রাস্তার

উপরে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইত। সে সব হাতী প্রায়ই ভাড়া-করা হাতী। মাঝে ২ বড়লোকদের নিজের নিজের হাতীও রাস্তায় বাহির হইত। দাদামহাশয় কিন্তু সে সময় হাতী ভাড়া করিয়া ছোটদের আনন্দ দিতেও কসুর করিতেন না। যতক্ষণ জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির না হয় ততক্ষণই ঐসব হাতী রাস্তায় চলিতে পারিত, মিছিল বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই রাস্তা-ঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। সে সময় হাতী, গাড়ী, ঘোড়া কিছুই রাস্তায় চলাচল করিতে পারিত না।

ক্রমে জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হইতে থাকিত। সে মিছিলের কত যে রকমারী রূপ ছিল তাহার যথোচিত রূপে বর্ণনা করার মত ক্ষমতা আমার নাই। মিছিলে পূর্ব্বগামী শোভাযাত্রা ছিল শত শত হাতীর মন্থর গমনে চলিয়া যাওয়া, তাদের গায়ের মূল্যবান এক একখানা সোনার জরি শাল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, প্রতি হাতীর শালের চার কোণ ধরিয়া চলিত চারটি লোক! হাতীর কপালে সোনা-রূপা জহরতের জৌলসের যেন অন্ত ছিল না। কোন কোন অতিকায় হাতীর সুদীর্ঘ দুই দাঁতের উপরে একখানা সোনার ছোট্ট চৌকী রাখিয়া তদুপরি ছোট্ট একটি ছেলেকে বসাইয়া দিয়া শোভাযাত্রার শোভাটিকে আরো যেন চমৎকৃত করিয়া দিত। আমাদের ছোটদের কিন্তু ঐ ছোট ছেলেটির জন্য খুবই ভাবনা হইত। এই সবই হাতী ও ছেলের শিক্ষার গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন আর অতশত বুদ্ধি-বিবেচনা আমাদের ছিল কই? এইরূপে শত ২ হাতী চলার পর চলিতে থাকিত রকমারী জরির পোষাকে আবৃত ঘোড়ার শোভাযাত্রা—তাহাও শত শত। কপালে সোনা, রূপা, জরির কারুকার্য্যময় মুকুট ও সীঁথি। তারপরে অনেক অনেক খাট অর্থাৎ চৌকা ধরনের এক একটি খাটের মত তদুপরি এক একটি ফুলের বাগান ইত্যাদি যথা পদ্মবনে হস্তীর দলন, গাছের উপর উল্লুকের দোল খাওয়া কত কত অপরূপ দৃশ্যই না চলিতে থাকিত।

তার পরে আসিত বড় চৌকী তাহা ছিল অতিকায় ও খুব উঁচু উঁচু চৌকীতে কত যে চিত্র ও অভিনয় চলিত। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দ্রৌপদীর মস্তকহীন পুত্রদের দেহ কোলে বিলাপ, নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান, রাবণের সীতা হরণ, জটায়ুপক্ষী নিধন, ইত্যাদি। আবার গ্রীস দেশের কৃত্রিম ঘোড়া হইতে সৈন্য আবির্ভাব ও যুদ্ধের অভিনয় চলিত। এদিকে আবার চলিত সমস্ত বৎসরের উভয় পক্ষের অর্থাৎ মিছিল বাহির হইত একদিন নবাবপুর-আলাদের তরফ হইতে এক দিন বাহির হইত ইশলামপুর-আলাদের তরফ হইতে। প্রথম যে দলের মিছিল বাহির হইত সে দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের মিছিল বেশী ভাল হইত ইহার আবার ভাগ-বাঁটরা থাকিত। এক বৎসর একদল আগে একদল পিছে এই ভাবেই মিছিলের শোভাযাত্রা চলিত—প্রতি বৎসর, উভয় দলের বাৎসরিক সাংসারিক কেলেঙ্কারী-কেচ্ছাও অভিনয় করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে কসুর করিত না, যেমন শাশুড়ী বৌর চুল ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে;

আবার বৌ তার বৃদ্ধা শাশুরীর গালে ঠোঙ্গনা দিতেছে, মায়েরা ছেলে-মেয়েদের ঠেঙ্গাইতেছে ইত্যাদি রকমারি অভিনয়। সেদিনের জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিবার জন্য কত গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোকজনের সমাগম হইত। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতেও লোকজন আসিয়া আত্মীয়স্বজনের বাড়ী উঠিয়া তাহাকে আনন্দ-মুখরিত করিয়া তুলিত। তা ছাড়া, বুড়ীগঙ্গায় ছোট-বড় বিপুল সংখ্যায় নৌকা সারিবদ্ধ ভাবে নঙ্গর গাড়িয়া থাকিত ও যথাসময়ে মিছিল দেখিতে নৌকা হইতে বাহির হইয়া মিছিল দেখিয়া পুনরায় নৌকায় ফিরিত। বলা বাহুল্য, ঐসব আরোহীরা দৈনিক হিসাবে ভাড়া করিয়া লইত। কখন কখন নির্দ্দিষ্ট দিনে মিছিল বাহির হইতে পারিত না নানা কারণে, যেমন প্রবল বারিপাত ইত্যাদিতে মিছিল বাহির হওয়া সম্ভব হইত না; ইহাতে দূরাগত বিশেষ করিয়া যাহারা নৌকা ভাড়া করিয়া মিছিল দেখিতে আসিত তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ হইত, কিন্তু তারা ঐসব তুচ্ছ করিয়াও বহু অর্থ ব্যয়ে জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখার আনন্দ উপভোগ করিতে ছাড়িত না। তখন মানুষের মনে যেন আনন্দ উপভোগের প্রবৃত্তিটা বেশী ছিল, এখন সেই আনন্দই নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া আনন্দের ভাবধারায় বদল হইয়া গিয়াছে। এখন যারা ঐ সব কাহিনী শুনিবে তাহারা তখনকার দিনের ঐসব আনন্দের ব্যাপারকে নিতান্তই অজ্ঞজনসুলভ ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

৬

এদিকে আর এক ব্যাপার দাঁড়াইল। সেনজী (ভগিনীপতি) ব্রাহ্ম-সমাজ-ঘেঁষা হইয়া পড়িলেন, প্রতি রবিবারেই ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেন, তাহা ছাড়া অন্য দিনও ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে কসুর করিতেন না। আমিও তাঁহার সঙ্গ লইয়া প্রায়ই ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতাম। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্কুলের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং চন্দ্রনাথ রায়ের সুমধুর গান শোনা, তাহা ছাড়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশাবলীও বেশ মনোযোগের সহিত শুনিতাম। এদিকে একদিন সেনজী ঠাকুর-চাকরদের বলিয়া দিলেন যে, তিনি আর আমিষ খাইবেন না। ক্রমে একথা মার কানে না নিলেই উপায় নাই বলিয়া কাঙ্গাইলা ভাইও ঠাকুর মার কাছে যাইয়া বলিল, "জামাই বাবু মাছ খায় না ও খাইবে না।" মা সে কথা নিঃশব্দে কয়েকদিন হজম করিলেন, কিন্তু বেশী দিন কথাটা অজ্ঞাত রহিল না—দিদিমার কানে ঐ কথা পৌছাইল। দিদিমা মার উপর মহা রাগান্বিতা হইয়া খুব তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও বিষম কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিলেন। দাদামহাশয় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া দিদিমার রাগ যেন আরো বাড়িয়া গেল, দিদিমার মনে হইতে লাগিল, দাদামহাশয় ও মার সহায়তা পাইয়াই

সেনজী এত বড় গুরুতর কাজে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে। তিনি সেনজীর খাওয়ার কাছে বসিয়া ঠাকুরকে বলিয়া এক-বাটি মাছ আনাইয়া মাছ সহ ভাত সেনজীর মুখে গুঁজিয়া দিতে অশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু করিতে না পারিয়া কান্দিতে কান্দিতে উপরে আসিয়া শয্যা লইলেন, ও বাবার নাম ধরিয়া কান্না-কাটি সুরু করিয়া দিলেন। একেই বিধবা পুত্রবধূর নিরামিষ খাওয়া ইত্যাদির জ্বালায় তিনি জ্বলিতেছিলেন তাহার উপর আবার এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল। প্রমদাকে হয়ত আর মাছ খাইতে দিবে না, এই দুশ্চিন্তায় দিদিমা আরো যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। যখন দেখিলেন, সেনজীকে আর মাছ খাওয়ান যাইবে না তখন দিদির মাছ খাওয়াটা যেন অটুট থাকে সে বিষয়ে দিদিমা বদ্ধপরিকর হইয়া মহিষ-মর্দ্দিনী রূপ ধারণ করিলেন। ঠাকুর-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া দাদামহাশয়, মা ও ছেলের দলের উপরে হামলা চালাইয়া মনের দারুণ ক্ষোভ মিটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তার পর একদিন সেনজীর হাতে ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, "দেখ তুমি ত' আমার কথা রাখিলে না—কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমার প্রমদাকে মাছ খাইতে কিছুতেই বারণ করিতে পারিবে না।"

সেনজী তখন হাসিয়া বলিলেন "সে ভয় নাই—আপনার নাতনীর মাছ খাওয়ার কোনই বাধা ঘটিবে না," একথা শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়া ঠাকুর-চাকরদের বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন, যাহাতে সেনজীর খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা না হয় এবং মাকে বলিয়া দিলেন দুধ ও ঘির বরাদ্দ যেন বেশী করিয়া দেওয়া হয়। সেনজী বহুকাল পর্য্যন্ত নিরামিষ খাওয়া চালাইয়াছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে তাঁহার চক্ষুর অসুখ দেখা দিলে বিশিষ্ট ডাক্তারগণ ব্যবস্থা দিলেন, প্রতিদিন একটি করিয়া টাটকা কই মাছের মাথা খাওয়ার। আর উপায় কি? চক্ষুর কাছে সব মনের ইচ্ছাকেই বলি দিয়া সেনজী পুনরায় মাছ খাইতে আরম্ভ করিলেন, দিদিমা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ঢাকার বাসায় হঠাৎ একদিন দাদামহাশয়ের কি এক খেয়াল চাপিয়া গেল, সন্ধ্যা-সম্মিলনে সেই ছোট চত্তরখানাতেই আমাদের স্কিপিং করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, সে স্কিপিং-এ মাত্র তিনজন প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া গেলাম, ছোট দাদা (রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত) ছোট কাকা (ধনেশচন্দ্র সেন) এবং আমি। সর্ব্ব প্রথমেই বয়সে বড় হিসাবে ডাক পড়িল ছোট দাদার, ছোট দাদা ত খুব গর্ব্বিত ভাবে যাইয়া আসরে দেখা দিলেন ও স্কিপিং-এর দড়িখানা হাতে লইয়া কয়েকবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্কিপিং করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ও খুব গায়ের জোরে হাই জাম্পের মত খুব উঁচুতে পদদ্বয় তুলিয়া মাত্র কয়েক বার দড়িখানা ঘুরাইতেই পা আট্‌কাইয়া পড়িয়া গেলেন। তার পর বয়স হিসাবে ছোট কাকা খেলার আসরে আসিলেন ও নিয়ম মাফিক স্কিপিংএর দড়ি ঘুরাইয়া ২৫ বার পর্য্যন্ত স্কিপিং করিয়া দড়ি আট্‌কাইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমার পালা আসিতেই সবাই

অতি উৎসুক চিত্তে আমার দিকে চাহিতে এবং মনে করিতে লাগিল, এই মেয়ে আর কতটুকুই বা স্কিপিং করিতে পারিবে! এতগুলি লোক সমাগমে বিশেষ করিয়া ছোট দাদা, ছোট কাকার অসমর্থতায় আমার বুকের মধ্যে কেমন একটু নড়া-চড়া দিয়া উঠিল, কিন্তু ভয় পাইলাম না। এই স্কিপিংএর এক শত বার দড়ি ঘুরান ছিল নির্দ্দিষ্ট। ছোট দাদা ত ১০।১২ লাফেই কুপোকাৎ, ছোট কাকা ২৫ বারে, এবার আমি কি করি, ইহাই হইল সকলের দ্রষ্টব্য। আমি ত নিয়মমাফিক্ স্কিপিংএর দড়িখানা হাতে লইয়াই পা দু'খানা মাটি হইতে অল্প অল্প উঠাইয়া দ্রুত বেগে স্কিপিং করিয়া যাইতে লাগিলাম, সকলেই সংখ্যা গণনায় মনোনিবেশ করিল, আমার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না, আমি সহজ ভাবেই স্কিপিংএর দড়ি ঘুরাইয়া যথারীতি স্কিপিং করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমি যেন কিসের উন্মাদনায় সবই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই ভাবে যখন একশ' হইয়া আরো পঁচিশের কোঠায় আসিয়া পৌছিলাম তখন চারিদিক হইতে থাম্ থাম্ ধ্বনি শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল, আমি ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম এবং সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। একটা হাসির রব বহিয়া চলিল। অবশ্য আমার এই সাফল্যে ছোট দাদা, ছোট কাকা, কেহই অসুখী ছিলেন না। মূল কথা, আমি স্কুলে স্কিপিং করিতে করিতে রীতিমত পাকা খেলোয়াড় হইয়া গিয়াছিলাম এবং স্কুলেও স্কিপিং-এর প্রতিযোগিতায় অনেকেই আমাকে আঁটিয়া উঠিত না। ছোট দাদা ও ছোট কাকা ১০।৫টা লাফ-ঝাঁপ দিয়াই ভাবিয়াছিলেন তাঁরা বেশ স্কিপিং-এ ওস্তাদ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্কিপিং করার আদত নিয়মই জানিতেন না।

ছোটবেলার কথার যেন অন্ত নাই, তার মধ্যে মনে পড়ে ছোট দাদা ও বড় দাদার মারামারি করিবার কথাও। কখন কখন সামান্য একটু কথার তর্কে বাগ্-বিতণ্ডায় দু'ভাইর মধ্যে খুব লড়াই লাগিয়া যাইত,—অপর ছেলের দলেরা ও অফিসের কোন কোন বাবুরা এই লড়াইয়ে খুব যেন আনন্দ উপভোগ করিত, কোথায় দু'ভাইকে ছাড়াইয়া শান্ত করিবে, তার বদলে সকলে যেন এক মজা পাইয়া যাইত। আমার কিন্তু অত্যন্ত ভয় ও কান্না পাইত। কখন কখন এই মারা-মারির সময় ছোট দাদা, বড় দাদার বুকের উপর চাপিয়া বসিতেন আবার পরক্ষণেই দেখিতাম বড় দাদা ছোট দাদাকে নীচে ফেলিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। এই ভাবে দু'ভাইর মল্লযুদ্ধ চলিত এবং দর্শকরা ইহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া বাহবা দিয়া চলিত, আমি সে সময় ছুটিয়া যাইয়া মার কাছে সব বলা মাত্রই মা উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই দু'ভাই সরিয়া পড়িত। মা ছোট দাদাকে টানিয়া উপরে লইয়া যাইয়া গায়ের ধুলা, বালি, ঘাম মুছাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে থাকিতেন। বৎসরে ঐরূপ ঘটনা দু'চার বার ঘটিয়া যাইত, তাহা বেশ মনে পড়ে। দু'ভাইর মধ্যে বয়সের ব্যবধান এবং বয়সও কম ছিল। তাই সবাই তামাসা দেখিত।

মনে পড়ে ইডেন স্কুলের অতিকায় সাদা ধপধপে একটি ভেড়ার কথা। ভেড়াটি ছিল যেমন বলবান তেমন বুদ্ধিমান। স্কুলে যখন টিফিনের ঘণ্টা পড়িত সে তখন দৌড়াইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া যাইত, সেখানে মেয়েরা রুটি বিস্কুট ফল ইত্যাদি কিনিবার জন্য ভীড় করিত, কিন্তু আশ্চর্য্য ছিল রুটিওয়ালী, ফলওয়ালীর ঝুড়ির কাছে সে কিছুতেই ভিড়িত না। যেই মেয়েদের কেনা আরম্ভ হইত অমনই সে প্রত্যেক মেয়ের নিকট হইতে একটু একটু অংশ গ্রহণ করিতে থাকিত, অর্থাৎ যে যে মেয়ে খাবার কিনিত তার একটু কিছু অংশ ঐ অতিকায় ভেড়াটিকে না দিলে সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ক্রেতাকে আক্রমণ করিতে যাইত, সুতরাং ভয়ে ভয়ে সবাই একটু একটু অংশ ভেড়াটিকে দিত। একদিন কিন্তু একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। বহু লোকের কেনা-কাটার মধ্যে একটি মেয়ে তার খাবারের অংশ না দিয়াই এক ফাঁকে চলিয়া যাইতেছিল, কতক দূর চলিয়া যাওয়ার পরই দেখা গেল, ভেড়াটি অতি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহা দেখিয়া সকলেরই সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। দেখা গেল সেই মেয়েটিকে অর্থাৎ যে খাবারের অংশ ভেড়াকে না দিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, তাকে গুঁতা দিয়া মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উঠিতে গেলেই পুনরায় গুঁতা দিয়া ফেলিয়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া আমরা মেয়ের দল ছুটিয়া গেলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করিতে আমরা যাইয়াই সর্ব্বপ্রথমেই ঐ মেয়েটির হাতের খাবার হইতে একটু অংশ লইয়া ভেড়াটাকে দেওয়া মাত্রই সে আবার উর্দ্ধশ্বাসে তার গন্তব্য স্থান রুটিওয়ালীর ঝুড়ির কাছে অর্থাৎ কেনা-কাটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া গেল, সবাই এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। আরো আশ্চর্য্য এই যে, মেয়েটিকে ফেলিয়া দিয়া কিন্তু তার খাবারটাকে গ্রহণ করিল না, তাকে তার প্রাপ্য অংশ দেয় এই তার মনোভাবখানা। কেমন করিয়া যে একটি পশু তার প্রাপ্য অংশ আদায় করিতে এক বিন্দু ভুল করিত না তাহাই দেখিবার। বড় হইয়া লোকমুখে শুনিয়াছিলাম ভেড়া, খাসী বা পাঁঠার অতিরিক্ত চর্ব্বি শরীরে জন্মিলে তারা বেশী দিন জীবিত থাকে না। জানি না ঐ বলিষ্ঠ ভেড়াটি কত কাল জীবিত ছিল!

ইডেনে পড়িবার সময় আর একটি বন্ধুর কথাও লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। নতুবা ইডেন স্কুলের লীলাখেলার একটা অংশ বাদ পড়িয়া যায়। সে ছিল ইডেন স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস, মিসেস ট্রান্সবেরীর ছোট কন্যা লীনা, বয়সে আমাদের অপেক্ষা বেশ বড় ছিল, বোধ হয় ১৩।১৪ হইবে। উহারা স্কুলবাড়ীর উপর তলায় থাকিত, নিচে স্কুল বসিত, বাড়ীখানা খুবই বড় ছিল। সময় সময় উপর তলা হইতে লীনার আবির্ভাব হইত, এবং আমাদের ক্লাশের উপর দিয়া তার মায়ের কাছে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে দু'-একটি কথার আদান-প্রদান চলিত। সে বাংলা কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিল, এই ভাবে কিছুদিন চলার পরে ক্রমে যখন ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল তখন বুঝিতে পারিলাম লীনা আমাদের মত শান্ত-শিষ্ট

গো-বেচারী নয়, বেশ দুষ্টু বুদ্ধি তার মাথায় খেলে, সে কখন কখনও অলক্ষিতে মাথার উপর সজোরে টোক্কা মারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। আবার পিছন হইতে আমার কাপড়ের আঁচলখানা মাথায় ঘোমটার মত করিয়া ফেলিয়া দিয়াই দেছুট্ ও একটু দূরে দাঁড়াইয়া খুব হী-হী করিয়া হাসিতে থাকিত। তাছাড়া টিফিনের সময় আসিয়া আমাদের খাবারের অংশ চাহিয়া লইত, আমরা সবাই খুব খুসী হইয়া তাকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইয়া দিতে কসুর করিতাম না। ক্রমে তার দুষ্ট বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করিল। আমি ও ঊর্মিলা ছিলাম সহজ সরল বুদ্ধির মানুষ, চারুও বেশ দুষ্টুমীতে আমাদের অপেক্ষা প্রখর ছিল, লীনা ও চারুতে মিলিয়া বেশ এক খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঢাকাতে তখন এক কি দু' পয়সায় মস্ত-বড় এক একখানা গেণ্ডেরী অর্থাৎ ইক্ষু পাওয়া যাইত। আমরা ঐ ইক্ষু ২।৩ জনে মিলিয়া মিশিয়া কিনিয়া লইয়া যাইতাম ; কেন না অতবড় একখানা ইক্ষু একজনে খাওয়া অসম্ভব ছিল। ইক্ষুওয়ালা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই উহা আমাদের টুকরা টুকরা করিয়া দিত এবং খাওয়ার সুবিধার জন্য মাঝখান দিয়া ফাঁড়িয়া দু'ভাগ করিয়া দিত, তাতে খাওয়ার পক্ষে খুব সুবিধা হইত। চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া যাইতাম সবাই এবং যে-যার ইচ্ছামত ইক্ষুখণ্ড লইয়া খাইতে থাকিতাম। ইহাতে কিন্তু একটু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া পড়িল অর্থাৎ ইক্ষুর আগার দিককার খণ্ডগুলি জমিয়া যাইত এবং সেগুলি পরে কেহই খাইতে চাহিত না। লীনা আর চারুতে মিলিয়া বেশ একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিল অর্থাৎ ইক্ষু লইবার সময় তার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে এবং হাতড়াইয়া আখখানা ধরিতে যাইতে প্রথমেই যেখানা হাতের স্পর্শে আসিবে সেখানাই তাকে খাইতে হইবে, বেশ কথা! "সাদা মনে কাদা নাই"—উহাদের কথামতই কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল, আমাদের আখ তুলিবার সময় চোখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল, উহাদের বেলায়ও আমরা উহাদের চোখ বন্ধ করিয়া দিতে লাগিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য, দেখা গেল প্রতিবারেই লীনা ও চারুর হাতে ভাল ভাল আখের খণ্ড উঠিতে লাগিল আর ঊর্মিলা ও আমার হাতে যত সব আগার দিকের আখ উঠিতে লাগিল, এইরূপ বার বার আমি ও ঊর্মিলা ঠকিয়া যাইতেছিলাম, লীনা ও চারু ত উল্লাসে হী-হী করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকিত। আমরা কিন্তু পরে উহাদের এই অসাধু দুষ্টুমীকে ধরিয়া ফেলিলাম। আমরা চোখ বন্ধ অবস্থায় যখনই ইক্ষুখণ্ড লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতাম তখন লীনা আর চারুতে পরামর্শ করিয়া আমাদের আখের খণ্ড তুলিবার সময় অতি আস্তে আস্তে খারাপ আখ-খণ্ডগুলি আমাদের হাতের সামনে আগাইয়া দিত, আমরা সে দুষ্টুমী বুঝিতে না পারিয়াই প্রতিবারেই ঐরূপ ঠকিয়া যাইতেছিলাম। পরে যখন উহাদের দুষ্টুমীপনা বুঝিতে পারিলাম তখন আমরা বেশ সাবধান হইয়া গেলাম, কিন্তু উহাদের ঠকাইবার মত প্রবৃত্তি আমাদের হইত না।

স্কুলে যাইয়া 'টক্' (মানিকের ভাষায় খাট্টা) খাওয়ায় যেন ছিল এক মহা আনন্দের ব্যাপার ! চাপরাশি-প্যাদারা সকালে বাজার করিয়া আনিয়া ভাঁড়ার ঘরে রাখা মাত্রই সে ঘরে ঢুকিয়া কচি-কচি আমের থোপা হইতে আম লইয়া 'দায়ে' খোসা ছাড়াইতে বসিয়া যাইতাম ও উহাতে বেশ নুণ-লঙ্কা মাখিয়া কাগজে মুড়িয়া জামার মধ্যে ভরিয়া সকলের অজ্ঞাতে স্কুলে লইয়া যাইতাম ও বন্ধুদের লইয়া কত মহানন্দেই না সেই আমের টুকরাগুলির সদ্ব্যবহার করিতাম। আমের দিন না হইলে একদলা তেঁতুল নুণ-লঙ্কায় জারিত করিয়া গোপনে লইয়া যাইতেও ছাড়িতাম না। বর্ত্তমানে "মানিক বাবাজীর" বনজঙ্গল খুঁজিয়া 'খাট্টা'র অনুসন্ধান ইহাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই। আমরা 'খাট্টা'র ভক্ত হইয়াছিলাম ৮।৯ বৎসর বয়সে আর মানিক খাট্টার ভক্ত মাত্র ১॥ বৎসর হইতেই !

এই বাংলা বাজারের বাসায় থাকাকালীন কলিকাতা হইতে ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ড বেলী ও তাঁর পত্নী ঢাকা সফরে আসিয়াছিলেন। এবারও তাঁহার সঙ্গের কেরাণীবৃন্দের খাওয়ার ভার লইলেন দাদামহাশয় নিজেই ; এখানে বলিয়া রাখি যে, দিদিমা এবার আর ঐ খাওয়া-দাওয়ার বিষয় নিয়ে 'টু' শব্দটিও করিলেন না। বেশ ভাল ভাবেই আনন্দ উৎসাহের মধ্যেই ঐ নিমন্ত্রণ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। কি যেন বাধা-বিঘ্নে ইডেন স্কুলের বাৎসরিক প্রাইজ দুই বৎসর বন্ধ ছিল। এবার লাট-দম্পতীর আগমন-উপলক্ষ্যে তাদের দ্বারাই প্রাইজগুলি বিতরণ করা ঠিক হইয়া গেল। প্রত্যেক মেয়ের অভিভাবককে সে উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করা হইল স্কুলে। যথাসময়ে ছাত্রী ও অভিভাবকগণ উপস্থিত হইলে, প্রাইজ বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। যাহারা প্রাইজ পাইবে, তাহারা ত' মহা আনন্দিত, বিশেষ করিয়া আমাদের মত ছোট দলের। ক্রমে উপরের ক্লাশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাইজ বিতরণ কার্য্য চলিতে লাগিল। প্রত্যেক ক্লাশেই যোগ্যতা-অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারজনকেই প্রাইজ দেওয়া হইতেছিল। আমি সে বার পঞ্চম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে ১ম হইয়া প্রমোশন পাইয়াছি। তখন এণ্টান্স পরীক্ষার প্রচলন ছিল, অর্থাৎ আমরা তখন আর ৪ বৎসর পড়ার পরেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার মত যোগ্যতা লাভ করিতাম এবং এখনকার দিনের ছেলে-মেয়েদের মতই এণ্ট্রান্স পাশ করিতে পারিতাম, ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। অর্থাৎ ১৪ বৎসর বয়সেই আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিতে পারিতাম। ক্লাশে আমিই সকলের ছোট ছিলাম। যাক্ "ধান ভানিতে শিবের গীত" গাহিয়া চলিলেও ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে একটু নিরাশার কালো মেঘ। যথাসময়ে প্রাইজ বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। আমি মহা আনন্দে ২ বৎসরের অনেকগুলি প্রাইজ লইয়া ঘরে ফিরিলাম। সেই প্রাইজের নানা দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে ছোটদের প্রথম মাসিক পত্রিকা 'সখা' (প্রমদাচরণ সেন)

পাইয়া খুবই উৎফুল্ল হইয়া গিয়াছিলাম। দাদামহাশয় মহাখুসী হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "তুই আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিস।" প্রাইজগুলি ছিল লেখাপড়া, খেলা, উপস্থিত থাকা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য, ভাগ্যক্রমে এই সব কয়টাই আমি পাইয়া গেলাম। বাড়ীর সকলেই খুসী হইল এবং বলিতে লাগিল, এমন দৌড়-ঝাঁপ দেওয়া মেয়েটা ত প্রাইজগুলি সবই লইয়া আসিল!

এইরূপ মহা আনন্দের মধ্যে চলার পরেই একদিন দাদামহাশয় একখানা খামে-ভরা চিঠি দিয়া আমাকে বলিলেন, ক্লাশের শিক্ষয়িত্রীব কাছে যেন এখানা দিই, আর কোন কথাই বলিলেন না, বোধ হয় কথাটা বলিতে তাঁহারও একটু বাধ-বাধ লাগিতেছিল। লেফাপায় চিঠিখানা বন্ধ করা ছিল। তবে মনে পড়ে মা একদিন বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই দাদামহাশয়কে ঢাকা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে এবং তখন আমাদের সবাইকে গ্রামের বাড়ীতে যাইতে হইবে। কিন্তু ঐ কথাটার গুরুত্ব তখন যেন মোটেই মনের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে নাই; সে দিন দাদামহাশয়ের চিঠিখানা হাতে লইতেই যেন কেন মনটা দমিয়া গেল। মনের ভয়টাকে চাপা দিয়া চিঠিখানা যথাসময়ে শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া দিলাম। শিক্ষয়িত্রী চিঠিখানা পড়িয়া যেন একটু বিষণ্ণ মনে দেরাজে রাখিয়া দিলেন। তখন ক্লাশ চলিতেছে, সে সময় অন্য বিষয়ের অবতারণা করা সমীচীন বোধ করিলেন না। আমি যেন একটু আশ্বস্ত বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু স্কুল ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিখানার মর্ম্ম সবাইকে জানাইয়া দিলেন আমার শিক্ষয়িত্রী উর্ম্মিলার মা। মা ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন প্রায় তাহাই ঠিক এবং ইহাতে আরো একটু লিখা ছিল যে স্কুল হইতে আমার নামটি যেন তুলিয়া দেওয়া হয়, বাস! সবই বুঝিলাম, সকলেও বুঝিয়া গেল আমার ইডেন স্কুলে পড়া 'খতম' হইয়া গেল! মনটা যেন গুমুরিয়া উঠিল, চারি দিকে স্কুলের বন্ধু-বান্ধবীরা ও স্কুলের মাষ্টার-পণ্ডিত সবাই যেন দুঃখিত। আমি স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, সবাই যেন জড় হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মহিম বক্সী পণ্ডিত মহাশয় বাংলাবাজারে আমাদের বাসার অতি নিকটে থাকিতেন। তখন আমি মাঝে মাঝে তাঁহাদের বাসায় যাইতাম, কিন্তু যখনই যাইতাম দেখিতাম তিনি অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় মেয়ে কমলা এবং পুত্র সত্যকে তিরস্কার করিতেছেন। স্কুলেও সবাই তাঁহার ধার দিয়াও সহজে কেহ কেহ ঘেঁষিত না, কিন্তু আশ্চর্য্য ছিল, আমি যখনই ব্যাকরণখানা হাতে লইয়া ষত্ব-ণত্বের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার পাশে যাইয়া দাঁড়াইতাম, তিনি সস্নেহে আমাকে সুন্দর ভাবে আমার সকল অমীমাংসিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে কোন দিনও একটু কার্পণ্য করেন নাই। আজ আমি স্কুল হইতে চলিয়া যাইতেছি জানিয়া অতি স্নেহের সহিত আমার হাতখানা তাঁহার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া কিন্তু মেয়ের দল এবং মাষ্টার প্রভৃতি কেন জানি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

এদিকে ইডেনের সাদা ধপধপে অতি বলবান্ অশ্বযুক্ত গাড়ীখানা আসিয়া স্কুলের গেটে দাঁড়াইয়া গেল। কারণ স্কুল ছুটি হইয়া গিয়াছে। একবার স্কুল-বাড়ীখানার দিকে চাহিলাম, খেলাধূলার মাঠখানাকে যেন চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম, মস্ত বড় মাঠ, তার এক কোণে ফুলের বাগান, কত শত শত ফুলে সজ্জিত ফুলের বাগানখানা; একটু দূরেই মস্ত বড় একটি নোণা ফলের গাছে সংলগ্ন সাধের দোলনাখানা। যে দোলনায় প্রতিদিন শিক্ষয়িত্রীর জ্ঞাত, অজ্ঞাতসারে আসিয়া দোল খাইয়া যাইতাম, সবই যেন দেখিতে দেখিতে চোখের নিকট হইতে দূর-দূরান্তে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। একেবারেই যেন শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই আমার শিক্ষয়িত্রী দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন; সকলেরই চক্ষু জলে ভারাক্রান্ত, একটু দূরে দেখিলাম লীনাও দাঁড়াইয়া রুমালে চোখ মুছিতেছে। এদিকে এক আশ্চর্য্য, সেই ভেড়াটা আসিয়া উপস্থিত! সে ভাবিল এত লোকজন যখন উপস্থিত তখন নিশ্চয়ই খুব বড় একটা কেনা-বেচা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এত বিষাদের মধ্যেও ভেড়াটির কথা মনে হইয়া একটু হাসিও পাইয়া গেল!

যথাসময়ে সকলের শুভাশীর্ব্বাদ ও সমবয়সীদের ভালবাসার বাক্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়া সবাই আমাকে ইডেনের গাড়ীতে জন্মের মত তুলিয়া দিল। মনে পড়ে গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া খুব কান্দিয়াছিলাম, যতক্ষণ স্কুলবাড়ীখানা দেখা গেল অনিমেষে চাহিয়া রহিলাম। যথাসময়ে গাড়ীখানা প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম ও যতক্ষণ দেখা গেল ঘোড়া ও গাড়ীখানার দিকে অনিমেষে চাহিয়া রহিলাম। ঘোড়া তো আর আমার মনের ব্যথা কিছুই বুঝিল না, কেবল পরদিন পথচলার সময় যদি প্রতিদিনের অভ্যাস বশে তাদের পাগুলি একবার এদিকে চালিত হইয়া যায়! তখন বুঝিবে পরদিন তাদের ঘাড় হইতে কিছু ভারের লাঘব হইয়া গিয়াছে! ধীরে মন্থর গতিতে বাড়ীতে ঢুকিয়াই শয্যাশায়ী হইলাম, বালিশে মাথা রাখিয়া খুব কান্দিতে লাগিলাম, মা আসিয়া তাড়াতাড়ি আমার পাশে বসিয়া অনেক সান্ত্বনার কথায় আমার দুঃখটাকে লাঘব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই আমাদের গ্রামের বাড়ীতে আসিতে হইল।

৭

সেই অতি শৈশবের বরিশালের লীলাখেলার আবেষ্টন হইতে যে ভাবে বিদায় লইয়া ঢাকা নগরীতে আসিয়াছিলাম, আবার ঠিক সে ভাবেই পুনরায় ঢাকা হইতে বিদায় লইয়া মধুময় স্কুল-জীবন জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। ক্রমে ক্রমে দেশের নানা আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া

মনটা অনেক সুস্থ হইতে লাগিল। মাতাঠাকুরাণী বাড়ীতে আসিয়াই অনেক ভাল ভাল বই আনিয়া দিতে লাগিলেন। রাজস্থান, ডোরথীর জীবন-চরিত, সাধুদের নানা কাহিনী যুক্ত গল্পের বই ইত্যাদি। কিন্তু ইংরেজীটার দিকে বাদ পড়িয়া যাইতে লাগিল। বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক সবই বেশ ভাল ভাবে মাতাঠাকুরাণী পড়াইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ইংরেজী পড়াইবার মত জ্ঞান তাঁহার ছিল না, সুতরাং তখন ইংরেজীটা মুখ্য না হইয়া গৌণ হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে একটা নূতন উপসর্গ দেখা যাইতে লাগিল। আমার দু'টি খুড়তুত বোন্ ও আমার বিবাহ যাহাতে একই সঙ্গে একই দিবসে সম্পন্ন হইয়া যায়, সে জন্য খুব চেষ্টা চলিতে লাগিল। খুড়তুত বড় বোন্‌টির বয়স ১১॥ এগার বৎসর, আমার বয়স ১০ ও খুড়াতুত ছোট বোনটির বয়স ৯ বৎসর মাত্র, ইহাতেই নাকি আমার দিদিমার চক্ষের নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছিল মেয়েরা বড় হইয়াছে বলিয়া! কোন বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ হইলে ছোট দিদিকে নেওয়া হইত না, অত বড় অবিবাহিতা মেয়েকে ঘরের বাহির অর্থাৎ অন্যের বাড়ীতে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হইত না! ছোট দিদি দেখিতে খুব সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল এক গ্রামে, স্কুল-ইন্সপেক্টারের প্রথম পুত্রের সহিত। খুব মনে পড়ে মেয়ে দেখিয়া তাঁহার খুবই পছন্দ হইয়া গেল, আমাদের এক ছোট দাদামহাশয় কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মেয়ের নানা গুণ বর্ণনাতে একেবারে মাতিয়া গেলেন ও যত পারিলেন বাড়াইয়া অনেক কিছুই বলিতে লাগিলেন, "এ মেয়ে মাংস, চপ্ কাট্‌লেট ইত্যাদি সবই রান্না করিতে পারে ও সেলাইতে কর্পেট ও রেশমের বহু রকমারী কারুকার্য্য করিতে পারে" ইত্যাদি। ছোট দিদি কিন্তু রান্নার 'র'ও জানিত না, সেলাই সম্বন্ধেও তদ্রূপই। এদিকে ছেলের পিতা মিষ্টি মিষ্টি হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি অতি গরীব মানুষ মা, যদি আমার ঘরে যাইয়া আমাকে একটু 'সুক্তার' ঝোল ও পাতলা মুসুরীর ডাইল ও দু'টি ডাইলের বড়া রান্না করিয়া দেয় তবেই আমার পরম সার্থক জীবন মনে করিব। আর সূচীকর্ম্ম? আমার ছেঁড়া কাপড় দিয়া যাচ্ছি ২।১ খানা কাঁথা সেলাই করিয়া দিতে পারে তবে ত কথাই নাই।" ছেলের পিতার কথা শুনিয়া দাদা কিছু হতভম্ব হইয়া গেলেন কিন্তু দাদামহাশয় হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অমি আপনার সঙ্গে একমত।" বেশ হাসাহাসির মধ্য দিয়া সেইদিনই ছোট দিদির শুভবিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া রহিল। এদিকে কিন্তু ভাবী বরের সম্বন্ধে সবাই বলিত 'বাবু' কেহ কেহ বলিত সাহেব, সে সময় পাত্র B A পড়িত ও হিন্দু হোষ্টেলে থাকিত এবং কেহ নাকি তাঁকে নাম ধরিয়া ডাকিলে তিনি বিরক্ত হইতেন, শোনা যায় তাঁকে সবাই "মিষ্টার সেন" বলিয়া হোষ্টেলে ডাকিত। পিতাপুত্রের আদর্শের ব্যবধান এইখানে কত!

এ সময় এক দিন গ্রামের বাড়ীতে বিকালবেলা ছোট দাদামহাশয় আমাকে

বলিলেন, "চল্ আমরা তোর পিসিমার বাড়ীতে বেড়াইতে যাই।" পিসিমার বাড়ী অতি নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক মাইলের মধ্যে, পিসিমা ত আমাদের পরম স্নেহশীল, তাঁহার বাড়ীতে যাইব আমাদের মহা আনন্দ, ছোটর দল আমরা নাচিয়া উঠিলাম। আমরা কে কে গিয়াছিলাম তাহা ঠিক স্মরণ নাই, তবে আমার এক খুড়তুত ভাই এক জন গিয়াছিল সেকথা খুবই মনে পড়িতেছে। ধীরে আস্তে অথচ অতি উৎসাহে বাড়ী হইতে রওনা হইয়া পিসিমার বাড়ীর গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম, দাদা যেন পূর্ব্বগামী পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটু শ্লথ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তিনটি যুবক দাদার ঐ লক্ষ্য স্থান হইতেই আগাইয়া আসিতেছে। এদিকে দাদা চলার গতিটা ক্রমেই কমাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার কারণ কিছুই বুঝিলাম না, আমি বার বার পিসিমার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিয়াই চলিলাম, ইত্যবসরে সেই মানুষ তিনটি আসিয়া দাদার সঙ্গ লইলেন। তন্মধ্যে একটিকে খুবই চিনিয়া ফেলিলাম, গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমাদের কাকা হন, বিশেষ করিয়া ঢাকার বাংলাবাজারের বাসায় পড়ুয়া ছেলের দলের এক জন তিনি। ঢাকা ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়াছি, অনেক দিন সেই কাকাকে দেখি নাই, তাই তাঁকে দেখিয়া খুবই খুসী হইলাম ও নানারূপ কথা-বার্ত্তা বলিতে লাগিলাম। তিনিও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের এই কথা বলাবলির মধ্যে ঐ অপর দু'টি মানুষের অবস্থান হেতু যেন কেমন একটা বাধ-বাধ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া রহিল, তেমন যেন সহজ-সরল ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেছিলাম না।

এদিকে দাদা ত আধা ইংরেজী আধা বাংলায় অনেক কথাবার্ত্তা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন ঐ লোক দু'টির সঙ্গে। এদিকে সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন, আমরা ত পিসিমার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ঐ লোকেরাও বুঝি পিসিমার বাড়ীর দিকেই কোথাও যাইবে, কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে, একটি ঘনপল্লবযুক্ত আমগাছের তলায় যাইয়া বেশ একটু থানা গাড়িয়া বসিয়া গল্প-গুজব চালাইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে কি হইল কেনই বা হইল জানি না, আমার খুড়তুত ভাইটি আমাকে বলিয়া বসিল, "ছোড়দি (অর্থাৎ ছোট দিদি) তোর না বিয়া?" এই কথা বলিতেই সবাই যেন একটু একটু হাসিতে লাগিল। আমি 'চুপ' বলিয়া এক ধমক্ দিয়াই আমবাগানের মধ্যে দূরে সরিয়া যাইয়া বসিয়া পড়িলাম ও মনে মনে দাদার মুণ্ডুপাত করিতে লাগিলাম; পিসিমার বাড়ীতে না লইয়া যাওয়ার দরুণ। কি আর করিব গাছের তলায় বসিয়া রহিলাম ও হঠাৎ আমার অতি শৈশবের কথাটা মনে জাগিয়া উঠিল। এমনি ভাবে ৫ বৎসর বয়সে দিদিকে বলিয়াছিলাম, "দিদি! দিদি! তোর না কি বিয়া," এখন আমার এই দশ বৎসর বয়সের ভাইটিকে ধমক্ দিয়াই আমার

সেই পুরান কথাটা মনে হইতেই, উহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া উহার মনের অবসাদ দূর করিতে ব্যস্ত হইয়া গেলাম। ভাইটির তখন বয়স পাঁচ বৎসর ছিল। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, মানুষ তিনটি যথাসময়ে চলিয়া যাইতেই দাদা বলিয়া উঠিলেন, "আজ আর পিসিমার বাড়ী যাওয়া হইবে না বেলা একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে।"

রাগে দুঃখে বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম, বাড়ীতে পৌছিতেই দেখিতে পাইলাম সব মেয়ের দল ছাদে উঠিয়া কি যেন দেখিবার জন্য উঁকিঝুঁকি দিতেছে। ক্রমে সবই প্রকাশ পাইল। গ্রামের ছেলেটি গোপনে তার এক আত্মীয়-বাড়ীতে আসিয়া বন্ধুগণ সহ আমাকে দেখিয়া গেলেন! ব্যস, আমি ত লজ্জায় মরিয়া গেলাম ও ঐ নির্লজ্জ লোকটির উপর বিষম রাগিয়া রহিলাম।

যাক্, এই সব উপদ্রবের মধ্যেও কিন্তু আমাদের খেলাধূলার উৎসবের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। সব ছোট মেয়ের দল সকাল ৮টার সময় রাশি রাশি পান লইয়া সাজিতে বসিয়া যাইতাম। বড়দের মধ্যে মা ও খুড়ীমাদের মধ্যে যে কেহ আসিয়া চুণের মধ্যে শ্বেতচন্দন ও সামান্য একটু চিনি মিশাইয়া দিয়া যাইতেন, তাহা গুলিয়া এবং নানারূপ মসল্লা, সুপারী ইত্যাদির পরিমাণ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমরা তাহাদের কথা মত বহু রাশি রাশি পান সাজিয়া রাখিতাম, দিবা-রাত্রির জন্য ঠাকুর খুড়া বাড়ী থাকিলে তাঁহার জন্য দু'বেলা দুই শত পানের খিলি বরাদ্দ ছিল, তার পরে আরো ২।৩ শত পানের খিলি বরাদ্দ ছিল; এবং আরো ২।৩ শত পানের খিলি ভাঁড়ার ঘরে মার হাতে পৌছাইয়া দিয়া তবে আমরা পান সাজিবার কর্ম্ম হইতে অবসর লইতাম। প্রায় প্রত্যহ আমরা ৪।৫ শত পানের খিলি তৈয়ার করিতে বাধ্য থাকিতাম, ইহা কিন্তু একটুও অতিরঞ্জিত বা বাহুল্য কথা নয়, ইহা অতি সত্য কথা। এই পান সাজার কাজ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সারা দিনের ছুটি।

সকালে পান সাজা সমাপ্তির সঙ্গেই মাথায় একটু তেল দেই বা না দেই কাপড়খানা হাতে লইয়া দল বাঁধিয়া এ-পাড়া সে-পাড়ার মেয়ে ও ছোট ছোট ছেলে সকলে মিলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতাম পুকুরের জলে। তখন পর্য্যন্ত বাড়ীতে ঘাটলাওয়ালা পুকুরের জন্ম হয় নাই, তাহার জন্ম বহু পরে। বাড়ীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টা পুকুর ছিল, যেদিন যেটায় ইচ্ছা হইত সেইটায় ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। পাড়ার মেয়েরাও সময় বুঝিয়া আসিয়া হাজির হইয়া যাইত—আর মজার অন্ত কি! এইরূপ ঝাঁপাঝাঁপির কোন ধরাবাঁধা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না, কারণ স্কুলের তাড়া বা কাজের তাড়া ত আর ঘাড়ের উপরে ভার ছিল না, মহানন্দে জলের মধ্যে কত রকমের ঝাঁপাঝাঁপিই করিতে থাকিতাম। এদিকে বেলা ত মধ্যাহ্ন প্রায় যায়-যায়, খাওয়ার সময় চলিয়া যাইতেছে, মায়ের দল ত সরোষে লগুড়হস্তে পুকুরঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন, তখন সকলের চৈতন্য

হইত যে কত ঘন্টা ব্যাপিয়া আমাদের এই জলকেলি চলিয়াছে ; তখন ভয়ে ভয়ে সকলে জল হইতে উঠিয়া পড়িতাম। কিন্তু মায়ের দল তখন তাঁদের জলকন্যাদের অপরূপ রূপ দেখিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন তাহার দিশা পাইতেন না। পুকুরে অল্পপরিসর জল, তাতে সবুজ শেওলায় আচ্ছাদিত, সুতরাং সাদা ধপধবে কাপড়-খানা শেওলা ও কর্দ্দমে এক একখানা অপরূপ শাড়ীর রূপ হইয়া যাইত। গায়ের রোঁয়ার সঙ্গে মিহি শেওলা ও কর্দ্দম সংযুক্ত হইয়া গায়ের লোমগুলি ঠিক বনমানুষের রূপ ধারণ করিত। চক্ষু হইত জবাফুল রঙ্গে রঞ্জিত। মাথার এক রাশ চুল কাদা ও শেওলায় জট পাকাইয়া ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিত। এ-হেন রূপবতী কন্যাদের প্রতি মায়ের দলেরা রোষে ছুটিয়া আসিয়াও বেশী কাছে ঘেঁষিতে পারিতেন না। কারণ, আমরা তখন ভয়ে ভয়ে একটু বেশী দৌড়-ঝাঁপ দিয়া যাইতে থাকিলেই তাহাদের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকিত। আমরাও সে কথাটার বেশ আঁচ পাইতাম। তাই ভয়ে ভয়ে ও বেশ দ্রুতবেগেই তাঁহাদের চক্ষুর অন্তরালে অপর পুকুরটির দিকে ছুটিয়া যাইয়া যতদূর সম্ভব অপরূপ রূপখানার পরিবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিতাম। তাড়াতাড়ি কাদা-মাটি-শেওলা যতদূর পারি পরিষ্কার করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িতাম। ঠাকুর কাকা ভাত পরিবেশন করিতে আসিয়াই আমার চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আমার ত আর কারণ বুঝিতে বাকী নাই, আমি তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া মাথা গুঁজিয়া অপরাধীর মত অল্প দু'টি ভাত খাইয়া উঠিয়া যাইতাম। খাওয়ার সময় অতীত, আবার এত জলে ডুবিয়া থাকা ও তৎসঙ্গে জলও প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং পেটে ক্ষুধাটা যেন একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। খাওয়ার পরই বিছানায় শুইয়া পড়িতাম।

এদিকে আমাদের স্নেহশীলা ঠানদিদি (আমার দাদামহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী) পরের দিনের জন্য আমাদের চুল ও দেহের পরিষ্কার সাধনের চেষ্টায় কত কত জিনিসের সন্ধানে লাগিয়া যাইতেন, মাথা ঘসিবার জন্য আতপ-চাউলের 'কুঁড়া', জবাফুলের পাতা, কলাইর ডাইল ভিজান বাটা ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়া চলিতে থাকিত রূপসীদের অঙ্গরাগ। মায়ের দলেরা কিন্তু ইহাতে তাদের পিসি-শ্বশ্রূমাতার উপর খুবই খুসী হইয়া যাইতেন। কেন না, এই রূপবতী কন্যাদের ঝালাই করিয়া লইতে অনেক সময়ের দরকার ও কার্য্যটি বড়ই বিরক্তিজনক ব্যাপার মনে করিত সন্দেহ নাই। মাতাঠাকুরাণী কিন্তু গ্রামে আসিবার পরে আমার মনস্তুষ্টির জন্য অনেক কিছুই যথাসাধ্য যোগাড় করিয়া যাইতেছিলেন, মস্তবড় গাছের ডালে মস্ত একটি দোলনা ঝুলাইয়া দিলেন, 'স্কিপিং'এর মজবুত পাকা দড়ীর অভাব ছিল না। এখন যাকে 'পিকনিক্' বলে তখন আমরা বলিতাম বনভোজন, বা বনভাত অথবা চড়ুইভাতি, ২।৪ পাড়ার মেয়ের দল মিলিয়া বনভোজন উৎসব চলিত।

বলা বাহুল্য, এই সবের পিছনে ছিল মাতাঠাকুরাণীর অদম্য উৎসাহ। মোটের উপর ঢাকা হইতে বাড়ীতে আসিয়া যাহাতে আমাদের আনন্দের বিশেষ কোনও ঘাট্‌তি না পড়ে সে বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বনভোজনের খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার গরীব ছোট ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের ছোটদের দিয়া মাতাঠাকুরাণী সকল উদ্‌বৃত্ত জিনিসগুলি যথাযথ ভাবে বিলিবাট করাইয়া দিতেন; তাহাতেও আমাদের আনন্দ উৎসাহের অন্ত থাকিত না। এই ভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দময় হইয়া কাটিতেছিল।

ঐদিকে কিন্তু বিবাহ রূপ উপসর্গের ব্যস্ততারও অভাব ছিল না। ঠাকুর খুড়া দীর্ঘ দিনের ছুটি লইয়া বাড়ীতে আসিলেন, সেই সঙ্গে মহা আনন্দের খুড়াত ভাইটিকেও দীর্ঘকালের জন্য পাইয়া গেলাম, ভাইটি ঠাকুর খুড়ার বড় ছেলে, আমার ৪ বৎসরের ছোট ছিল, তাকে আমরা বড় বেশী কাছে রাখিতে পারিতাম না, কারণ ঠাকুর খুড়ার কর্ম্মস্থলেই মার কাছে সে থাকিত, এবার তাকে পাইয়া আমাদের আনন্দের মধ্যে যেন মহোৎসব লাগিয়া গেল। ভাইটি ছিল প্রিয়দর্শন, শান্ত, শিষ্ট ও বুদ্ধিমান্। এই অল্প বয়সেই যেন তার স্বভাবের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইত, আরো ভাল লাগিত আমরা বড় হওয়ার পরে দাদামহাশয়ের সঙ্গে ভাত খাওয়ার সময় আসন গাড়িয়া যখন আমাদের খাওয়ার আসনে সে স্থলাভিষিক্ত হইয়া শান্ত ভাবে ধীরে-সুস্থে দাদামহাশয়ের হাত হইতে ছোট ছোট ভাতের গ্রাসগুলি আনন্দের সহিত মুখে তুলিয়া লইয়া খাইতে থাকিত, চাহিয়া চাহিয়া যেন ঐ খাওয়ার মধ্যেই কত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইতাম! ভাইটি ছিল একটু দুর্ব্বল ভাবাপন্ন, বেশী দৌড়-ঝাঁপের ধার সে ধারিত না।

ঠাকুর খুড়া ছুটিতে বাড়ি আসিলেন। নানারূপ দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে আমাদের জন্য বড় বড় চীনামাটির পুতুল আনিয়া সবাইকে একটি-দুইটি করিয়া বিলিবাট করিয়া দিলেন। আমাদের আনন্দও একেবারে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপিতে প্রমোশন পাইয়া গেল, ছুটিয়া যাইয়া ঠাইন দিদিকে ধরিলাম, কুমারবাড়ী হইতে হাঁড়িকুড়ি, থালা, বাটি, ঘটী, শিল, নোড়া অর্থাৎ সংসারে যাহা যাহা প্রয়োজন সব আমাদের আনিয়া দেও; ঠাইন দিদিও অবিলম্বে চাকর ও ঝুড়ী লইয়া ছুটিলেন সেই দূরে কুমার-বাড়ীতে। গুণিয়া বাছিয়া সকলের জন্য সমান ভাগ যেন দেয়— এই ভাবে সব জিনিসপত্র আনিয়া থই-থই করিয়া দিলেন। আমরাও ঠাইন দিদির উপর মহাখুশী হইয়া তাহার পিঠের উপর দলাই-মলাই আরম্ভ করিয়া দিলাম, তিনি ত এই মহোৎসবের হোতা হইয়া আহা! উহু! ছাড়! ছাড়! ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে হাসিয়া কুটি-কুটি হইতে থাকিতেন। ঠাইন দিদি বৃদ্ধা হইলেও অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। সদাপ্রফুল্ল ছিল তাঁর চিত্ত-খানা। আজও মনে পড়ে তাঁর অন্তহীন স্নেহমমতার সহজ সরল হৃদয়খানার কথা!

সমাপ্ত

'ডায়েরী' ও লেখিকার পরিচয়

এক্ষণের গত শারদীয় সংখ্যায় (১৩৮৮) কৈলাসবাসিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' পুনর্মুদ্রণ করা হয় এবং সেটি পাঠকসমাজে খুব আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। যে-পত্রিকা থেকে সেটি পুনর্মুদ্রণ করা হয় সেই মাসিক বসুমতী-র পৃষ্ঠাতেই কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয়েছিল অপর একটি রচনা—মনোদা দেবী রচিত 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী'। কৈলাসবাসিনী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের, আর মনোদা দেবী পূর্ববঙ্গের গৃহস্থ-বধূ। আমরা মনোদা দেবীর সেই রচনাটিও এক্ষণের পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রণ ক'রে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

মনোদা দেবীর রচনাটি সাহিত্যিক মুজতবা আলীর সাহায্যে ও তাঁরই মুখবন্ধসহ মোট সাতটি সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩৬১ থেকে ভাদ্র ১৩৬২) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের ঠিক আগের মাসে (মাঘ ১৩৬১) ঐ পত্রিকার 'অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ' বিভাগে সৈয়দ মুজতবা আলীর যে মুখবন্ধটি বিজ্ঞপ্তির আকারে প্রকাশিত হয়, সেটির কিছু অংশে উদ্ধৃত হল :

"আমাদের দিদিমণি গঙ্গাস্বরূপা মনোদা দেবীর জন্মদিনে তাঁর অন্যতম নাতি সাধন সেন তাঁকে একখানা ডায়েরি উপহার দেয়। সাধনকে উদ্দেশ ক'রে দিদিমণি তাঁর বিগত দিনের কয়েকটি ছবি সে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন।

'সাধনকে উদ্দেশ করে' বলাতে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে গেল। যদিও লেখার সময় দিদিমণি সাধনকে, আমাকে কিম্বা তাঁর অন্যান্য নাতি-নাতনি, এমন কি সাধনের পুত্র মানিককে সামনে রেখে আপন কাহিনী বলে গিয়েছেন, তবু আমার মনে হয়, আসলে দিদিমণি যা বলেছেন, তা বহু বহু বাঙালী সাহিত্যামোদীকে প্রচুর আনন্দ দেবে।···

যে যুগের কাহিনী দিদিমণি লিখেছেন, তার অনেক জিনিসই আজ সাধারণ বাঙালীর অজানা। আমার তাই বাসনা হয়েছিল, দিদিমণির পাণ্ডুলিপিতে ফুট-নোট সহযোগে সে সব জিনিসের কিছুটা পরিচয় দিই। কিছুটা দিয়েও ছিলুম। কিন্তু দেখি, আশী বছরের [৭৫ বছর—স. এ.] সুপক্ক বাঙলা গদ্য লেখার মাঝে মাঝে আজকের দিনের বাঙলা গদ্যে লেখা ফুট-নোট বারে বারে তাল কেটে রসভঙ্গ করে। উপস্থিত তাই সেটা বর্জন করেছি—পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় এ বিষয়ে গুণিজনের মতামত নিয়ে আপন কর্তব্য নির্ণয় করব।

কিছুকাল পূর্বে এই 'বসুমতী'তেই একটি পশ্চিম বাঙলার মেয়ের জীবন-স্মৃতি বেরয় [এক্ষণ, শারদীয় (১৩৮৮) সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত কৈলাসবাসিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' দ্রষ্টব্য। স. এ.]। সে লেখাতে বিস্তর ব্যাকরণ-শৈলী-বানান ভুলত্রুটি ছিল, কিন্তু আহা, কী বলার ধরন, কী সুন্দর

আপন-মনে গুন্ গুন্ করে গান গাওয়ার মতন রসসৃষ্টি! সুরসিক বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শোনালে পর তাঁরাও বললেন, 'একেই বলে ইতিহাস, একেই বলে সাহিত্য, একেই বলে রসসৃষ্টি। ব্যাকরণের নিয়ম, বানানের শাসন এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর।'

দিদিমণির লেখাতেও পাঠক ভুল দেখতে পাবেন। 'ড়' এবং 'র'—দিদিমণি এবং আমার মত বাঙালের কাছে একই ধ্বনি। পশ্চিম-বাঙলার পাঠক অপরাধ নেবেন না।

অত-শত বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, দিদিমণির লেখা মণিময় লেখা।..."

এই ডায়েরির লেখিকা মনোদা দেবী (মনোদা দাশগুপ্তা) ১২৮৫ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার সোনারঙ্গ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে তিনি কলকাতায় ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স যখন প্রায় ৭৫ বছর (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) তখন তিনি এই ডায়েরি নিতান্ত পারিবারিক স্মৃতিকথা হিসাবে লেখেন। কিন্তু এটি প্রকাশিত হতে পারে এমন কোনো ধারণা বা উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। সৈয়দ মুজতবা আলী প্রায় জোর করেই এটি ১৩৬১ সনে মাসিক বসুমতী-তে প্রকাশের জন্য পাঠান।

লেখিকারা দুই বোন—প্রমদা ও মনোদা। এঁদের কোনো ভাই ছিল না। প্রমদা বড় বোন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আনুমানিক ১২৯২ সনে (ইং ১৮৮৫) মহারাজ রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বংশধর বীরেশ্বর সেনের সাথে। এই বিবাহের স্মৃতি দিয়েই এই ডায়েরির শুরু।

লেখিকার পিতা কৈলাসচন্দ্র সেন ডাক্তার ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে ঢাকাতে মারা যান। তাঁর মাতা নবশশী দেবী দীর্ঘায়ু হন। তিনি [নবশশী দেবী] একজন বিদুষী, সমাজসেবিকা ও ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। তিনি 'পূর্ণানন্দ তরঙ্গিণী' নামে একটি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ও তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন।

বর্তমান ডায়েরির লেখিকার [মনোদা দেবীর] বিবাহ হয় দশবৎসর বয়সে (১২৯৫ সন) বিক্রমপুর পরগনার বিদ্‌গ্রাম নিবাসী বগলামোহন দাশগুপ্তর সঙ্গে (মৃত্যু ১৯৩০ খ্রী)। বগলামোহন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. এবং বি. এল. পাশ ক'রে ওকালতি করেন। তাঁদের চার সন্তান। প্রথম আশালতা সেন—সুলেখিকা, সমাজসেবিকা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন এম. এল. এ. (পূর্ব পাকিস্তান)। তিনি বর্তমানে তাঁর একমাত্র সন্তান বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন একজিকিউটিভ ডিরেকটার ডক্টর সমররঞ্জন সেনের (সাধনের) কাছে দিল্লিতে আছেন। এই 'সাধনে'র প্রদত্ত ডায়েরিতে তাঁরই অনুরোধে মনোদা দেবী স্মৃতিকথা লেখেন। 'সাধনে'র স্ত্রী অনিতা ও দুই পুত্র মানিক (ড. অভিজিৎ

সেন, বর্তমানে অক্সফোর্ডে) ও মুকুল (ড. প্রণব সেন, বর্তমানে দিল্লিতে)। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর মুখবন্ধে এই 'সাধন' ও 'মানিকে'র কথাই উল্লেখ করেছেন। আলীসাহেব 'সাধনে'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ও লেখিকার স্নেহভাজন ছিলেন।

লেখিকার দ্বিতীয় সন্তান সুধাংশুমোহন দাশগুপ্ত ঢাকাতে এবং তৃতীয় সন্তান জ্ঞানদামোহন দাশগুপ্ত বিদেশে (এডিনবরায়) অল্পবয়সে মারা যান। লেখিকার চতুর্থ সন্তান ড. শৈলেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত বর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপনা করছেন। লেখিকা তাঁর শেষ জীবনে (১৯৫৭-৬৪) এই শৈলেন্দ্রমোহন ও তাঁর স্ত্রী কমলার কাছেই থাকতেন এবং তাঁদের কলকাতার ৯৭ নং রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের বাসভবনে ৮৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। বর্তমানে শৈলেন্দ্রমোহনের বয়স ৭৫ এবং আশালতা দেবীর বয়স ৮৯।

উপরোক্ত তথ্যগুলি আমরা শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দাশগুপ্তর কাছ থেকে জানতে পেরেছি। তিনি দিল্লিতে তাঁর দিদি শ্রীমতী আশালতা সেন ও ভাগিনেয় শ্রীসমররঞ্জন সেনের সহায়তায় একটি পত্রে তথ্যগুলি আমাদের জানিয়েছেন। শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের সঙ্গে আমাদের পত্রালাপের নানা পর্যায়ে আরো অতিরিক্ত কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।

স্বনামধন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র সেন (বংশগত উপাধি 'বিশারদ') মনোদা দেবীর পিতামহ ছিলেন, যাঁর কথা ডায়েরিতে আছে। স্বামী বগলামোহন দাশগুপ্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। আইনজীবী হিসাবে খ্যাত থাকলেও তিনি সুসাহিত্যিক ছিলেন। 'নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে নারীচরিত্র' নামে প্রবন্ধ লিখে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন। মনোদা দেবী এককালে বাংলাদেশের খ্যাতিনাম্নী গান্ধীবাদী কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুযায়ী তিনি সারাজীবন হরিজনদের উন্নয়ন ও চরকার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল সোনারঙ্গ ও ঢাকার গেণ্ডেরিয়া। ১৯৪৮ সালে তিনি দিল্লীতে পুত্র শৈলেন্দ্রমোহনের তৎকালীন কর্মস্থলে চলে আসেন। তাঁর মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকা ও স্টেট্‌সম্যান-এ শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সমস্ত তথ্য মিলিয়ে আমরা দেখছি ;

১. স্মৃতিকথাটি লেখা হয়েছিল লেখিকার ৭৫ বছর বয়সে, ১৩৬০ সালে (ইং ১৯৫৩) দিল্লিতে। তখন 'সাধনে'র পুত্র 'মানিকে'র (অভিজিৎ সেন) বয়স বড় জোর ৩ বছর। লেখার ১ বছর পরেই রচনাটি মাসিক বসুমতীতে প্রেরিত হয়। মুদ্রিত হওয়ার পর মনোদা দেবী প্রায় ৮ বছর জীবিতা ছিলেন।

২. স্মৃতিকথায় বর্ণিত হয়েছে লেখিকার দিদি প্রমদা দেবীর বিবাহ (১৩৯২

সাল, ইং ১৮৮৫) থেকে নিজের বিবাহের (১২৯৫ সাল, ইং ১৮৮৮) উদ্যোগপর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ লেখিকার ৭ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত (১৮৮৫-৮৮ খ্রী) সময়ের কাহিনী।

যদিও জনৈকা গৃহবধূর 'ডায়েরী', কিন্তু আসলে এটি গৃহবধূর 'শৈশব স্মৃতি' – পরিণত বয়সে পেছন ফিরে নিজের শৈশব জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন লেখিকা। স্বভাবতই বয়সের হিসাব এতে মাঝে মধ্যেই এলোমেলো হয়ে গেছে। নাতি-পুতিদের জন্য তিনি ছোটবেলার যেসব চিত্র তুলে ধরেছেন, সেগুলি আজকের সাধারণ পাঠকের কাছেও আকর্ষণীয় মনে হবে। লেখিকার রচনার গুণ তার জন্য অনেকখানি দায়ী।

পুনর্মুদ্রণের সময় আমরা মূল পাঠটি যথাসাধ্য অবিকৃত রেখেছি, কেবল প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশের সাতটি কিস্তিকে আমরা সাতটি পরিচ্ছেদরূপে দেখিয়েছি এবং বর্তমান সংখ্যায় একত্রে সবটাই প্রকাশ করেছি।

মনোদা দেবীর পারিবারিক পরিচয় সংগ্রহের প্রাথমিক প্রয়াসে শ্রীদিলীপ গুপ্ত ও শ্রীস্বপন দাশগুপ্তের সহায়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ওই রচনাটিকে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। —স. এ.

—

॥ স্বীকৃতি ॥

মুদ্রণে সহায়তা : জয়দুর্গা প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ ও বিজ্ঞাপন : সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬

বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স, ৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৯

এক্ষণ ।। শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৯

অন্যান্য বছরের মতোই নানা বিস্ময়ে ভরা এই বার্ষিক সংখ্যাটি মহালয়ার (১৬ অক্টোবর ১৯৮২) মধ্যেই প্রকাশিত হবে। দাম ১২ টাকা।

পত্রিকার এজেন্টদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন ৩১ অগাস্টের মধ্যে তাঁদের চাহিদার পরিমাণ আমাদের জানান।

কলকাতার বাইরের এজেন্টদের ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠানো হবে—যথারীতি ২৫% কমিশন। ডাক-খরচ পত্রিকার।

কলকাতা ও শহরতলির এজেন্টরা আমাদের অফিস বা মূল এজেন্টের (সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯) কাছ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করবেন।

ব্যক্তিগত সংগ্রহকারীরা ভি. পি.-ডাকে পত্রিকা নিতে পারেন, ডাক-খরচ তাঁদের বহন করতে হবে। তাঁরা নাম-ঠিকানা জানিয়ে এক্ষুনি আমাদের চিঠি দিন। অথবা মনি-অর্ডারে ১৫ টাকা অগ্রিম পাঠালে শারদীয় সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি-ডাকে পাঠানো যাবে।

সব ক্ষেত্রেই বিলম্বিত অর্ডারে পত্রিকা সংরক্ষণ অনিশ্চিত।

এক্ষণ

১৯৬৫ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : কলকাতা

২. প্রকাশের কালানুক্রম : দ্বিমাসিক

৩. মুদ্রাকরের নাম : প্রবীর ঘোষ

জাতীয়তা : ভারতীয়

ঠিকানা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৪. প্রকাশকের নাম : প্রবীর ঘোষ

জাতীয়তা : ভারতীয়

ঠিকানা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৫. সম্পাদকের নাম : নির্মাল্য আচার্য

জাতীয়তা : ভারতীয়

ঠিকানা : এক্ষণ
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৬. স্বত্বাধিকারী : নির্মাল্য আচার্য / ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

আমি, প্রবীর ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ১-৩-৮২ (স্বাঃ) প্রবীর ঘোষ

শ্রীপ্রবীর ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

An EKSHAN Supplement

A screenplay by Satyajit Ray
based on a story by Premchand

SADGATI

(DELIVERANCE)

A 50-minute film made for Doordarshan

Principal Characters

DUKHI CHAMAR (Om Puri)

JHURIA, *Dukhi's wife* (Smita Patil)

GHASIRAM (Mohan Agashe)

LAKSHMI, *Ghasiram's wife* (Gita Siddharth)

THE GOND (Bhaialal Hedao)

DHANIA, *Dukhi's daughter* (Richa Mishra)

MORNING IN A CHAMAR SETTLEMENT.
DUKHI THE CHAMAR'S SHACK.

The camera holds on the tiled roof of the shack. A goatskin lies spread on it. The three main Titles appear over the shot. At the end of Titles the camera pulls back and Jhuria enters the shot with a pitcher of water on her head. She puts down the pitcher, looks around, and calls out.

JHURIA: Dhania! Dhania!

Dhania is seen to be playing with two other children and a small goat on the road in front of the shack. She looks up at her mother.

JHURIA: Do you know where your father is?

DHANIA: He's gone to cut grass.

JHURIA: Cut grass? Now?

Jhuria, puzzled, goes off to look for her husband. A green patch on the edge of the settlement. Dukhi is indeed cutting grass. Jhuria stands looking over the fence.

JHURIA: So you've forgotten, have you?

Dukhi doesn't pay any attention to his wife.

JHURIA: Aren't you supposed to go to the brahmin's this morning?

Dukhi now turns round.

DUKHI: What do you think this grass is for? I have to take him an offering, don't I?

JHURIA: That grass is for the brahmin?

DUKHI: So? You go mind your own business. See about what he's going to sit on when he comes.

JHURIA: Will he sit on a cot?

DUKHI: Not on ours, surely.

JHURIA: Can't we borrow one from the village headman's wife?

DUKHI: You must be mad. You think the people in the headman's house will give us a cot? They won't even let a coal out of their house to light your fire with—and they'll give you a cot?

JHURIA: Then what shall we do?

DUKHI: Ask Dhania to break off some mohwa leaves. Make a mat with them.

JHURIA: All right.

DUKHI: And we have to give the brahmin some provisions to take home.

JHURIA: Then we shall need a plate, too.

DUKHI: Make a plate with mohwa leaves. Mohwa is holy, you know.

Dukhi has finished cutting grass and gets up with the bundle. Dukhi suddenly has a fainting fit, drops the bundle, and holds on to his wife for support. Jhuria is concerned.

JHURIA: What happened?

Dukhi takes a few seconds to recover.

DUKHI: I'm all right now.

He goes off towards his shack, Jhuria following.

DUKHI: Take the Gond's daughter to the village merchant and bring back all the things we need: a pound of flour, a half of rice, a quarter of gram, an eighth of ghee, salt and turmeric.

JHURIA: All right.

DUKHI: Will you remember?

JHURIA: Yes.

DUKHI: Repeat what I said.

JHURIA: A pound of rice . . .

Dukhi stops and turns reprovingly towards his wife.

DUKHI: A pound of *flour*!

Jhuria repeats meekly.

JHURIA: A pound of flour.

DUKHI: A half of rice. Repeat.

JHURIA: A half of rice.

DUKHI: A quarter of gram.

JHURIA: A quarter of gram.

DUKHI: An eighth of ghee.

JHURIA: An eighth of ghee.

DUKHI: Salt and turmeric.

JHURIA: Salt and turmeric.

DUKHI: And don't forget to put four annas at the edge of the leaf. And don't touch anything.

They have reached the shack. Dukhi puts down the bundle from his head. Jhuria suddenly has a thought.

JHURIA: Don't go today. Go tomorrow. You've only just recovered from fever . . .

DUKHI: I should have gone much earlier. It's the fever which has delayed me. Don't worry. I'll be all right.

Dukhi goes into the shack. Dhania comes in carrying the young goat.

DUKHI: Dhania!

Dhania turns.

DUKHI: Come here.

Dhania comes and stands facing her father. Dukhi gives her an affectionate pat on the head.

DUKHI: D'you know who's coming today?

Dhania nods.

DUKHI: Who?

DHANIA: Panditji.

DUKHI: And d'you know why he's coming?

Dhania is too shy to answer.

DUKHI: Very well. Now go and fetch a lot of mohwa leaves. You'll have to make a mat and plate with them. Go.

Dhania sets off, but is called back by Dukhi.

DUKHI: You mustn't wander off. The brahmin may want to see you.

Dukhi turns to go. Dukhi takes up the bundle of grass and prepares to leave. Jhuria has just brought out a plate with some food in it and a glass of water.

JHURIA: Won't you eat something before you go?

DUKHI: I may miss him if I delay.

Dukhi has already come out of the shack. He is now surrounded by a herd of cows on its way to the pasture.

JHURIA: What if you have another dizzy spell on the way?

DUKHI (*raising his voice above the cowbells*): See that everything is done before I come.

PANDIT GHASIRAM THE BRAHMIN'S HOUSE.

Ghasiram, freshly bathed, sits before a mirror carefully drawing sandalwood lines on his forehead with the help of a straw. Then with sindoor he draws a red circle in the middle of the white lines. Then more sandalwood marks on his chest and arms.

Dukhi on his way to the brahmin's house crosses a field and is about to step on the main road when he has to stop to let some brahmins pass. Then he continues.

GHASIRAM'S HOUSE.

Ghasiram performs his puja, ringing a bell and waving a lamp in a circular motion before the deity. A dog starts barking as Duhki arrives at Ghasiram's house. He stops in front of the house. The ringing of the bell can be heard. Dukhi now makes his way to the back of the house. The back door is open. Dukhi enters. The sound of the bell is louder now. Dukhi comes to the door of the courtyard, puts down the bundle of grass, sits on his haunches and waits for the puja to be over.

Dhania tears off leaves from a mohwa tree.

THE BRAHMIN'S HOUSE.

The ringing stops. Dukhi stiffens. The brahmin may come out any moment now. Ghasiram comes into the courtyard, walks across.

DUKHI: Maharaj!

Ghasiram stops and turns. Dukhi prostrates himself on the verandah of the courtyard. Ghasiram's wife, Lakshmi, also reacts from the inner verandah. She has been grinding spices.

GHASI: Who is it?

DUKHI: Dukhi, Maharaj. I have come to see you.

GHASI: That I can see, but what for?

DUKHI: I am arranging my daughter's betrothal. If your worship could come and help fix an auspicious date.

GHASI: Now?

DUKHI: Yes, Maharaj. I have arranged everything for you.

Ghasiram's ten-year-old son Moti has just come out with his school-books and stops on the verandah to find out what's going on. Ghasiram shouts at him.

GHASI: What are you stopping for? Get going or you'll be late for school again.

Moti meekly steps down from the verandah and ambles off. Ghasiram turns to Dukhi again.

GHASI: You think I'm free to go anytime anybody wants me to go anywhere?

DUKHI: No, Maharaj, I know you are a busy man. But without you I can't arrange my daughter's betrothal.

GHASI: Well, you have to wait.

DUKHI: I will wait, Maharaj.

GHASI: Why don't you sweep the front of the house while you're waiting? There's the broom over there. I'll come when I'm free.

DUKHI: I'll do that, Maharaj. Please tell me where I should put this bundle of grass.

GHASI: Put it down in front of the cow in the cowshed.

DUKHI: Very good, Maharaj.

Ghasiram goes back into the house.

Dukhi takes the bundle of grass into the cowshed and does as told. Then he comes back to the front of the house, picks up the broom and starts to sweep.

THE GROCER'S SHOP.

The old grocer hands a small girl some provisions and turns to Jhuria and the Gond's daughter.

GROCER: Yes?

The Gond's daughter turns to Jhuria.

GOND'S DAUGHTER: Well, tell him.

JHURIA: A pound of flour, a half of rice, a quarter of gram, an eighth of ghee, salt and turmeric.

GROCER: H'm. A pound of rice.

Jhuria giggles.

JHURIA: No, No! A pound of flour.

GHASIRAM'S HOUSE.

Dukhi finishes sweeping the front of the house and calls out.

DUKHI: Maharaj!

Ghasiram has been drinking bhang out of a lota, sitting on a charpoy.

GHASI: What is it?

DUKHI: I have finished sweeping, Maharaj.

GHASI: Listen now. In the storeroom across the street in front, there's a pile of hay. Take it out and put it in the cowshed, will you?

DUKHI: Very good, Maharaj.

Dukhi turns to go, but Ghasiram calls out again.

GHASI: Listen, Dukhi.

Dukhi stops and turns.

DUKHI: Yes, Maharaj.

GHASI: After you have done with the hay, I want you to split wood. You'll find a log outside by the banyan tree. I want it chopped up in small bits. Do you understand?

DUKHI: Yes, Maharaj.

Dukhi makes his way to the storeroom. There is an immense pile of hay. An empty sack lies alongside. Dukhi fills the sack and hoists it on his shoulder. Then he crosses the wide street, goes in through the back door, dumps the hay, and starts back again.

DUKHI'S SHACK.

Dhania has brought the mohwa leaves and calls out to her mother.

DHANIA: I've brought the mohwa leaves, Mother.

Jhuria answers from within.

JHURIA: Put them down on the verandah.

DHANIA: Can I make the plate?

JHURIA: All right, but do it properly. See that there are no holes, or the grain will trickle through.

Dhania gets down happily to making a plate with the leaves.

Dukhi dumps the second pile of hay in the fodder bin and starts back.

GHASIRAM'S HOUSE.

A verandah on the street side. Ghasiram is seated with two other brahmins. One of them, Lokenath, a young, sheepish-looking character, has had a bereavement, and Ghasiram is consoling him by quoting from the *Gita*.

GHASI: As the *Gita* says—just like one gets out of one's tattered clothes and gets into new ones, so one's soul leaves one's decayed body and enters into a fresh one. Your wife may have died, but her soul lives.

LOKE: That is indeed a consoling thought, Panditji.

GHASI: So why fret? And you can marry again. You're young. There is nothing in the Shastras to prevent you from taking the marriage vow again.

Dukhi comes and waits, squatting on the street, facing Ghasiram, who continues with his discourse to the afflicted brahmin.

GHASI: Look at me. My present wife is my third wife. The first one died within six months of marriage. After a year I married again. Seven years later, my second wife died. Snakebite. A krait. Bit her on the ankle. Died in two hours.

The two brahmins make sympathetic noises.

Dukhi still waits to draw Ghasiram's attention.

GHASI: Four years later I married again. Your dear ones may pass away, but life does not stop. Life goes on.

Ghasiram notices Dukhi.

GHASI: Have you chopped the wood?

DUKHI: I don't know where the axe is, Maharaj.

GHASI: Look in the storeroom. It must be there.

DUKHI: Very good, Maharaj.

Dukhi goes to look for the axe.

Ghasiram turns to Lokenath again.

GHASI: It is our sacred duty to marry and procreate. You have no son by your first wife. It is your duty to marry again and keep alive your lineage.

THE LOG OF WOOD BY THE BANYAN TREE.

Dukhi's shadow falls on it. He has come with the axe. It is a massive trunk, and Dukhi regards it dauntingly. He walks around it, looking for the best position from which to attack it.

He finds one and gets ready.

Gripping the axe, he raises it over his head and brings it down on the log. The blade glances off. He brings it down again. Again the blade glances off. The third time the blade hits the log but doesn't make a mark.

Dukhi now examines the edge of the blade and looks around for something to use as a hone. He spots a stone slab lying nearby.

Dukhi now scoops some water from a puddle, wets the stone with it and starts rubbing the blade of the axe against it. He examines the blade again. It seems to have acquired a shine. Dukhi walks over to the log and attacks it with fresh vigour.

A Gond passing by slows down to have a look. Dukhi is raining blows, but not to much effect.

The Gond, a middle-aged man of grave countenance, walks up.

GOND: Do you know how to chop wood?

Dukhi stops and turns towards the adivasi.

DUKHI: I'm used to cutting grass, brother, not to chopping wood.

GOND: Then why wear yourself out for nothing?

DUKHI: Maharaj wants me to. I want him to come to my house to find an auspicious date for my daughter's betrothal.

GOND: So he makes you chop wood?

DUKHI: I could do it if I had something to eat. I had no time to take any food this morning.

GOND: Can't he feed you even if he doesn't pay you money? Ask them for some food.

DUKHI: I am asking a favour, how can I ask for food?

GOND: Then whack away.

The Gond walks away in disgust.

DUKHI: I'm sure I could tackle it better if I at least had a smoke. It's not that I have no strength in my arms.

The Gond stops and turns.

GOND: You don't have tobacco?

Dukhi shakes his head.

GOND: Come with me then.

DUKHI: Where?

GOND: Come with me.

Dukhi decides to go with the Gond.

DUKHI'S SHACK.

Jhuria has nearly finished making the mat. Dhania is working on the plate.

JHURIA: I wonder what's taking them so long. Dhania, why don't you go and stand on the road and look.

Dhania does as told, but the road is empty.

DHANIA: No sign of them yet, Mother.

THE GOND'S SHACK.

Dukhi stands waiting outside. The Gond comes out with pipe and tobacco.

GOND: I can't give you any fire.

DUKHI: I think I can get fire from the Panditayin.

GOND: Carry on, then. I'll drop by later.

Dukhi starts to walk back.

Ghasiram has sat down to his meal. Lakshmi sits by with a fan.

Dukhi's voice is heard.

DUKHI (*off-screen*): Maharaj!

Both Ghasiram and Lakshmi react.

LAKSHMI: Why does that man keep coming?

GHASI: He wants me to come to his house to fix a date for his daughter's marriage.

LAKSHMI: Now, in the middle of the day?

GHASI: I've given him some work to do. Let him finish that first.

LAKSHMI: What work?

GHASI: I've asked him to chop wood.

We are with Dukhi now.

DUKHI: If I could get some light to smoke this pipeful.

Inside, Lakshmi turns to her husband, her eyebrows raised.

LAKSHMI: He's asking for a light now!

GHASI: Give him some light, will you.

Lakshmi flies into a rage.

LAKSHMI: You get so wrapped up in your books and astrological charts that you forget all about caste rules.

Lakshmi has raised her voice, and Dukhi can hear her from outside.

LAKSHMI (*off-screen*): You let a chamar come into a brahmin's house as if he owned it. Tell him to get out or I'll scorch his face with a firebrand.

Dukhi hangs his head in shame.

Inside, Ghasiram continues to implore his wife.

GHASI: Why not just let him have his light? He's doing our work, isn't he? You'd have to pay at least a rupee if you had a labourer do it.

Lakshmi hoists herself up on her feet.

LAKSHMI: All right, but if he ever comes into the house again, I'll give him the coals on his face.

Dukhi stands fidgeting guiltily on the verandah.

Lakshmi comes out holding the coals in a pair of tongs. With her veil drawn over her face, she flings the coals towards Dukhi. One of them hits Dukhi on the shin and he winces.

Lakshmi has gone back into the house. Dukhi raises his voice and apologises while he puts the live coals into the chillum.

DUKHI: Forgive me, Panditayin. It was very wrong of me to come inside your house. If we weren't such fools, why would we get kicked so much?

Inside, Lakshmi reacts to Dukhi's apology. She seems to soften a bit.

Ghasiram continues to eat.

She seems to ponder for a while.

LAKSHMI: Has he had anything to eat, this fellow?

GHASI: I didn't ask him. Maybe he hasn't. He's been here since morning.

LAKSHMI: You can't split wood on an empty stomach.

GHASI: Well, why don't you give him something?

LAKSHMI: What?

GHASI: I don't know. Is there anything left over?

LAKSHMI: There are a couple of chapatis.

GHASI: That's no help. Two chapatis are no food at all for these chamars. They need at least a good two pounds.

Lakshmi gives up.

LAKSHMI: Then let him go hungry. I'm not going to kill myself cooking in weather like this.

Dukhi has sat down on the log to smoke. He takes a few long pulls, puts down the pipe, picks up the axe and straightens up.

Ghasiram washes his mouth.

The sound of chopping wood begins again.

Ghasiram goes and lies down on the charpoy with a fan in his hand.

Dukhi has attacked the log with renewed energy. His body glistens with sweat. Some marks have appeared on the wood—the result of a dozen vigorous whacks. Dukhi stops and looks at the marks. They seem to give him hope that he will be able to tackle it.

After half-a-dozen more whacks Dukhi has to stop again. It is obvious that many more will be needed before the wood yields. Dukhi seems to be possessed by a great stubbornness. He starts again, muttering under his breath.

DUKHI: I'll see you split even if I have to give my life for it, you son-of-a-bitch!

GHASIRAM'S BEDROOM.

Ghasiram is asleep on his cot. A gentle snore issues from his nostrils. The sound of chopping wood is heard off-screen.

After a few more vigorous whacks, Dukhi suddenly loses his patience. Muttering an oath, he flings the axe away.

The axe flies towards the road, and a brahmin passerby has to duck to avoid having his head chopped off. He stares aghast at Dukhi.

Dukhi runs up and retrieves the axe. He is profusely apologetic.

DUKHI: Please don't mind, sir. It slipped out of my hand. It'll never happen again.

Still speechless and with a look of abject terror, the brahmin steps back. He meets up with another brahmin on his way to the well.

BRAHMIN 2: What's the matter, Bhagwandas?

BRAHMIN 1: That chamar there. He threw an axe at me.

BRAHMIN 2: What!

BRAHMIN 1: He—threw—an—axe—at me!

BRAHMIN 2: But why?

BRAHMIN 1: He must have gone berserk. Don't go this way. Turn back.

Dukhi, back near the log of wood, has heard this exchange. He suddenly feels forlorn. He drops the axe and flops down at the foot of the ancient tree.

He glances at the log.

It looks as indomitable as ever.

He turns his eyes away.

He seems suddenly overcome with a great weariness.

His lips tremble. His eyes fill with tears.

He gives way to a fit of sobbing.

DUKHI'S SHACK IN THE CHAMAR SETTLEMENT.

Jhuria has fallen asleep on the verandah. The provisions for the brahmin lie neatly arranged on the leaf plate beside her.

Dhania plays hopscotch before the shack, gets tired, goes to the road to see if her father is returning.

Seeing no sign of Dukhi, she goes back to her play.

GHASIRAM'S HOUSE.

Ghasiram stirs, opens his eyes, glances at the clock. It is 2:33 p.m.

There is silence all around but for a lone dove which calls incessantly from somewhere.

Ghasiram leaves his bed. His wife is asleep too.

Ghasiram goes out to see what the chamar is doing.

Dukhi has fallen asleep leaning against the trunk of the banyan tree.

Ghasiram looks at the log. No splitting has been done yet.

GHASI: Hey there, you good-for-nothing!

Dukhi wakes up with a start.

GHASI: So you've come here to have a nap, have you?

Dukhi gets up on his feet, has another dizzy spell, and has to hold on to the tree to avoid toppling over.

GHASI: I see no marks on the log yet.

DUKHI: I had nothing to eat this morning, Maharaj.

GHASI: So what? You'll go home and eat when you've done your work. Now, come on, get going. I want to see you do it.

Dukhi picks up the axe and starts again. The Gond is back and watches from the gate. Dukhi gives a few weak whacks.

GHASI: What's this? Have you no strength in your arms? Hit harder.

Dukhi calls up all his energy and begins to hit harder.

GHASI: That's it. That's the way. Don't stop until you've split it. Yes, that's the way.

Ghasiram gives his instructions and goes away.

Dukhi now whacks away as if possessed by a demonic strength.

Moti, just back from school, stops at the gate to watch Dukhi raining blows on the log.

Dukhi goes on ceaselessly, using the last ounce of energy, whack after whack, his body bathed in sweat, his veins standing out, his eyes starting out of their sockets. A tremendous blow makes a yawning crack in the wood and the next moment—Dukhi falls on his face.

The axe lies embedded in the log.

Dukhi's body remains inert.

Moti walks up close, looks on for a while, then senses something is wrong.

He runs away.

Ghasiram has got back to bed for another nap.

Moti comes charging in.

MOTI: The chamar is dead, Father, the chamar is dead!

GHASI: What?

MOTI: The chamar has fallen on his face by the log of wood.

GHASI: Fallen on his face?

MOTI: And he's not moving.

GHASI: Don't be silly. He must have fallen asleep again.

Ghasiram gives his son a slap and goes out to investigate.

Ghasiram finds Dukhi lying inert beside the log.

GHASI: Arrey—sleeping again? Get up, get up, I say.

Dukhi doesn't move.

Ghasiram has a closer look while keeping his distance.

Dukhi looks what he is—a dead man.

Ghasiram goes white as a sheet. He steps back.

Ghasiram suddenly notices Moti standing by. He snaps out at him.

GHASI: What are you standing there for? Go and play. Go to Tulsi's house. Go on!

There is now no doubt in Ghasiram's mind that Dukhi is dead. Seized with panic, he runs back into the house.

Ghasiram shakes his wife out of her sleep.

GHASI: Listen, a terrible thing has happened.

LAKSHMI: What?

GHASI: Dukhi is dead.

LAKSHMI: Who?

GHASI: Dukhi the chamar.

LAKSHMI: But he was chopping wood.

GHASI: He died on the job.

LAKSHMI: It can't be true.

GHASI: It is. It has happened.

LAKSHMI: Are you sure?

GHASI: Positive. I know a dead man when I see one.

Lakshmi ponders for a moment.

LAKSHMI: Well, there's only one thing to do.

GHASI: What?

LAKSHMI: Send word to the chamar settlement so they can come and take the corpse away.

GHASI: But, you see, I . . . I mean, I . . .

LAKSHMI: What are you mumbling for? He was chopping wood and died. He must have been ill. It doesn't mean you are responsible. Some people die in their sleep. You didn't know he would die.

GHASI: No. Of course not.

LAKSHMI: Well, go then.

The Gond is kneeling by Dukhi. He makes sure that the chamar is dead. He gives a contemptuous glance in the direction of Ghasiram's house.

GOND: Holy man he calls himself! Sadhu—Mahatma!

The Gond gets up and makes off with quick steps.

On the road, an old brahmin stands looking suspiciously at Dukhi's inert body. He turns to the Gond who is crossing the road.

BRAHMIN: What's the matter with him?

GOND: He's dead.

BRAHMIN: Dead? Who?

GOND: Dukhi chamar.

The Gond is gone.

THE CHAMAR SETTLEMENT.

A crowd has gathered to listen to the Gond.

GOND: It happened while he was chopping wood. The brahmin forced him to do it. So he is responsible.

Jhuria comes out of her shack. She senses something is wrong.

GOND: If he comes and asks you to remove the dead body, don't listen to him. Don't go and touch the corpse, or you'll be in trouble with the police. This is a police case, and the brahmin alone is responsible for his death. I know, because I have seen everything with my own eyes.

Jhuria now knows.

JHURIA: Oh God! Oh God!

She falls in a heap on the rain-soaked ground. The cowherd is returning from the field. The cowbells nearly drown her wailings.

JHURIA: I knew something had happened to him—I knew!

Two chamar women who hear Jhuria's lament run up to her and put their arms around her, trying to console her.

WOMEN: Get a hold of yourself, Jhuria, get a hold of yourself!

But Jhuria will not be consoled.

JHURIA: I know, I know it is my husband he is talking about. I know there was something wrong. I know it, I know it. Oh, what'll happen to me now!

We see Dhania standing a few paces away, shocked and whimpering.

The Gond is gone. Now Ghasiram arrives at the chamar settlement. He looks shaken, and he can hear Jhuria wailing, but he musters up enough courage to address the chamars.

GHASI: You see, brothers—Dukhi died a little while ago outside my house.

The chamars don't answer. They keep looking at Ghasiram with mute defiance.

GHASI: I was about to come to his house with him when he

died quite suddenly. Now the point is the body can't lie there indefinitely. So, if you could arrange to . . .

The chamars don't budge. They just keep looking at Ghasiram. Ghasiram loses his nerve and starts pacing back. Jhuria is still wailing. A rumble of thunder is heard.

A crowd has gathered on the road outside Ghasiram's house, and is commenting on the event. 'A most inconvenient thing to happen' . . . 'Blood must have gone to his head' . . . 'He threw an axe at Bhagwandas' . . .

Ghasiram is seen approaching his house. The crowd, all brahmins, walk up to him.

One of them speaks.

BRAHMIN: This is a serious matter, Panditji. We can't use the road to go to the well unless the body is removed. How long can we go without water?

GHASI: I have just been to the chamar settlement and told them. They will be here presently. You go home now and come back an hour later. Go on home.

INTERIOR, GHASIRAM'S HOUSE.

Ghasiram comes in. Lakshmi pulls down a sari from the clothesline and turns to her husband.

Ghasiram goes on, lies down on the charpoy again, his face to the wall.

LAKSHMI: Well, what happened?

GHASI: They won't listen.

LAKSHMI: What do you mean?

GHASI: They won't remove the corpse.

LAKSHMI: Nonsense. They don't expect us to remove it, do they?

GHASI: I don't know what they expect, but they looked at me with real hostility when I told them.

LAKSHMI: So what happens now?

GHASI: I don't know. Don't ask me.

It has started to rain. Lakshmi looks out gloomily.

LAKSHMI: That corpse lying out in the rain—who knows what's going to happen?

Outside, Dukhi's dead body is pelted by rain. Jhuria comes, soaked to the skin. She walks up and throws herself over the body of her husband. Wailing, she shakes the body.

JHURIA: Open your eyes! Oh, why don't you open your eyes! What a curse this is—and our only daughter just about to be married! Why did you have to be so cruel—leaving us when we needed you most!

Jhuria now turns towards Ghasiram's house.

JHURIA: Maharaj!

Lakshmi reacts to the cry. She runs up and bolts the front door.

Jhuria comes running up towards the front door of Ghasiram's house in pouring rain.

JHURIA: Maharaj, you made him chop wood when he had fever only the other day. He had had nothing to eat this morning. He had no strength and you made him work so hard. What harm had he done that you were so cruel?

Jhuria falls on the doorsteps and starts banging on the door, weeping.

Night. It is raining heavily.

Dukhi's body, now lying face up, is lit by flashes of lightning.

GHASIRAM'S BEDROOM.

Lakshmi sits on the bed, while Ghasiram paces up and down.

LAKSHMI: If you'd only not asked him to split wood.

GHASI: Did I know that he'd had nothing to eat? If you had given him some food, he wouldn't have died.

LAKSHMI: But I didn't know you were making him work so hard.

GHASI: A lot of people work hard. They don't all die.

LAKSHMI: What happens if the police gets to know?

GHASI: How can they know? They can't come in the rain.

LAKSHMI: But the body is beginning to stink already. You can't

remove it, and no one's going to do it for you. The chamars refuse to come and the brahmins won't touch it.

GHASI: Will you stop jabbering and let me think?

Ghasiram stops pacing.

GHASI (*to himself*): Let me think . . . let me think . . .

Dawn of the next day.

The rain has stopped, but there are puddles all round, and water drips from the leaves of the trees.

Dukhi's legs.

One stiff leg is lifted with the help of a stout, bent twig and a noose slipped around the ankle. It winds tightly as the rope is pulled.

Ghasiram grips the rope.

Now he has to exert all his strength to haul the corpse towards the field beyond.

The field. It dips at the far end.

We hear a loud puffing and panting, and Ghasiram enters the shot dragging the stiff corpse and nearly collapsing in the process. He slips and stumbles in the slush but carries on with a grim and somewhat comical determination.

He grows smaller as he recedes from the camera, the corpse in tow, finally disappearing down the slope.

Now nearly out of breath, Ghasiram dumps the corpse in a spot where animals' bones lie scattered—an unprepossessing final resting place for Dukhi.

We hear a cock crowing, heralding the beginning of another day.

Now we see Ghasiram, his dhoti still wet from his bath. He mumbles prayers and sprinkles holy water on the spot where Dukhi died.

We see the log with the axe sticking out of it, the holy water cleansing it and the place around of all impurity.

Ghasiram moves out of the shot, still sprinkling and mumbling.

We stay on the LOG OF WOOD and the AXE, while the End Titles appear over it.

THE END

This is a Supplement to EKSHAN, vol. xv, no. 3–4.

Published by N. Acharya on behalf of Ekshan, 73 Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700 009 and printed by P. K. Ghosh at Eastend Printers, 3 Dr Suresh Sarkar Road, Calcutta 700 014

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে সৌন্দর্য আর সুষমার অপূর্ব মণিকাঞ্চনযোগ —বাংলার হস্তশিল্প

বাংলার হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শুধু গৃহসজ্জার উপকরণ নয়, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রেও হস্তশিল্পের নিজস্ব শিল্পসৌকর্য ও রুচিবোধ বিস্ময়কর। দীর্ঘ দিনের সাধনা আর শিল্পবোধের ফলে হস্তশিল্পের প্রতিটি জিনিসই যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি বাহারী। কারুকার্য আর রঙের বৈচিত্র্যে অননুকরণীয়। হস্তশিল্পের যে কোন দোকানে পাবেন নিত্যব্যবহার্য নানান সামগ্রী। জুট ও চামড়ার ব্যাগ, বাঁশ ও বেতের ট্রে, ম্যাট, পর্দা, বিছানার চাদর এবং আরো কত কী: প্রতিটি জিনিসই বর্ণসুষমা আর শিল্পসৌকর্যে অনন্য। প্রয়োজনীয় অথচ শিল্পবোধে ভাস্বর। আজই আসুন হস্তশিল্পের দোকানে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও যে কত সুন্দর ও মনোহর হতে পারে, নিজেই দেখে নিন।

আজই আসুন লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প বিকাশ নিগম পরিচালিত বিপণি 'মঞ্জুষা'তে ও গ্রামাঞ্চলের গ্রামীণ শিল্প বিপণিতে।

বাংলার হস্তশিল্প ঘরে রেখেও তৃপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার